KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : মীর ওসমান
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol & Number : 45/1 45/2 45/3 45/5	Year of Publication : May 1984 Jun 1984 July 1984 Sep 1984
	Condition : Brittle ✓ Good ✓
Editor : রবীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

চতুরঙ্গ

১ম বর্ষ প্রথম সংখ্যা
মে ১৯৮৪

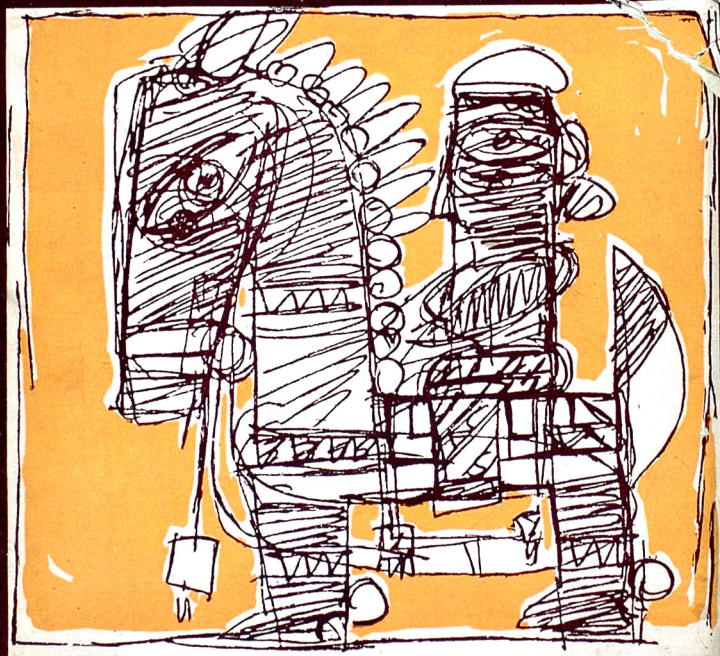

রেখা : যামিনী রায়

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

— শ্রীমা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান প্রতিষ্ঠিত
ত্রৈমাসিক চতুরঙ্গের অনুসৃতি মাসিক

~~প্রথম~~ ৪৫ বর্ষ। ~~প্রথম~~ ১ সংখ্যা
মে ১৯৮৪/বৈশাখ১৩৯০

একটি দিন প্রেমেন্দ্র মিত্র ১

বিবাহ ক্ষিতিমোহন সেন ২

ক্রান্তদর্শী অন্নদাশঙ্কর রায় ৮

বাড় বেড়েছে প্রবাল দাশগুপ্ত ২৮

চিত্তবনে বাঁশি বাজে মাফরুহা চৌধুরী ৩৮

কবিতাগুচ্ছ শামসুর রাহমান ৪৪

শহর সংস্করণ শংকর বসু ৪৭

জাহাজী গল্প অমৃতময় মুখোপাধ্যায় ৫৬

গুরুজীর সঙ্গে চীনে শ্যামাদাস চক্রবর্তী ৬৫

স্কেচ গণেশ পাইন ৭৪

আলোচনা ৭৬
রাজেশ্বর মিত্র, দিব্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, সোমেন ঘোষ, রথীন মিত্র, জর্জ অরওয়েল, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, দাউদ হায়দার, তুহিন চট্টোপাধ্যায়, হোসেনুর রহমান, গৌতম নিয়োগী, অমলেন্দু সেনগুপ্ত, বিমল মুখোপাধ্যায়।

বাংলা সাময়িক পত্র পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র
স্থাপিত ১৯৭৮

প্রচ্ছদচিত্র। যামিনী রায়
(মণি রায়ের সৌজন্যে)

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত

প্রধান সম্পাদক। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

সম্পাদনা-উপদেশক। গৌরকিশোর ঘোষ, গৌরী আইয়ুব, হোসেনুর রহমান

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক নবজীবন প্রেস, ৬৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত

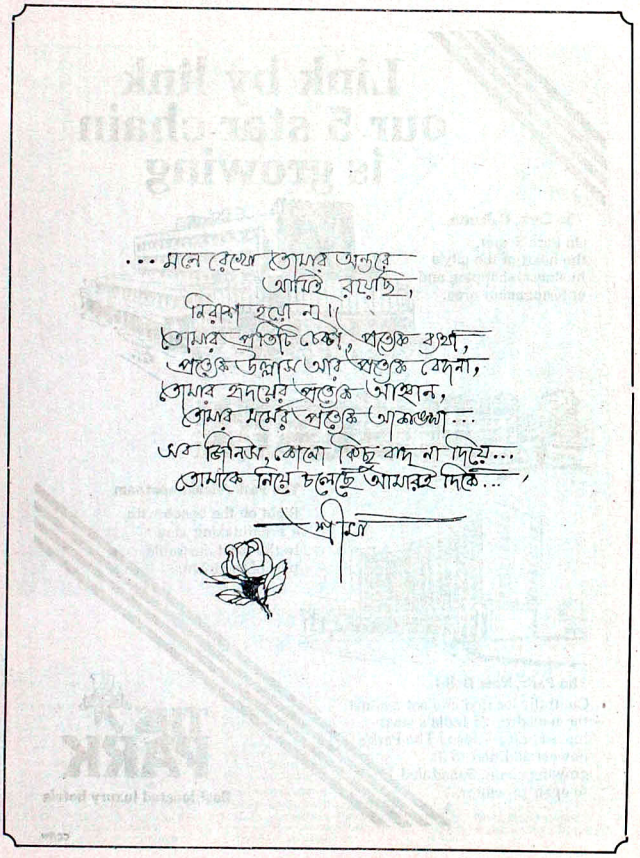

নতুন পদক্ষেপ

চতুরঙ্গ ত্রৈমাসিক ছিল, মাসিক হল।

প্রকাশকালের সময়সীমার এই হেরফের পত্রিকাটির সম্ভ্রমহানি ঘটাবে না তো—এই আশঙ্কা শুভানুধ্যায়ীদের মনে জাগা স্বাভাবিক। আমরাও হলপ করে আগাম প্রতিশ্রুতি দিতে অক্ষম যে ছাপা, কাগজ, বিভিন্ন লেখকের রচনা সদা-সর্বদা উচ্চমানের রোহভূমি থেকে কদাচ নেমে আসবে না। একটি সাময়িকপত্রের সাফল্য, বলাই বাহুল্য, সম্পাদক বা প্রকাশকের একক প্রয়াসের সুফল নয়। পত্রিকাপ্রকাশনের বিপুল কর্মকাণ্ডের প্রায় সবটাই সমবেত চেষ্টার পরিণাম। লেখক, শিল্পী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কুশলীদের এই যৌথ পরিবার যাতে সুশৃংখল ও সমমনস্ক হয় সে দায় বর্তায় অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারের উপর।

বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে রথী-মহারথীদের যেমন সংখ্যাল্পতা ছিল না কিছুকাল আগেও তেমনি ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মণ্য গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে, প্রগতিশীল-রক্ষণশীল বিভাগ, শ্লীলতা-অশ্লীলতা কলহ-কলরবে সাহিত্যের আসর ছিল জমজমাট। এবং এইসব বিরুদ্ধতা, মজার কথা, সব সময়ই কোনো-না-কোনো সাময়িকপত্রকে আশ্রয় করে প্রণালীবদ্ধ হয়েছে। আমরা মনে করি না এই দলাদলি সাহিত্যের কোনো ক্ষতির কারণ হয়েছে। বরং এই বিরুদ্ধতাই শেষপর্যন্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বাদবৈচিত্র্য এনেছে, বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গনে বিশ্বসাহিত্যের প্রবেশপথ অর্গলমুক্ত করেছে। ইদানীং বাঙলা সাহিত্যে যে বিভক্তি সংক্রামক হয়ে উঠেছে সেই শিবিরবিন্যাসের উৎসাহ পুরোটাই রাজনীতিক। আমরা কিন্তু সাহিত্যের নিজস্ব মূল্যমানকে জলাঞ্জলি দিয়ে শিবির-বিন্যাসে বিশ্বাসী নই। এবং লক্ষ করছি যে এই শিবির-বিন্যাসের সুযোগে সাহিত্যের প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন না করেও অনেক অ-সাহিত্যিক বা অ-কবি চোরাচালানে সাহিত্যিক বা কবি বলে চালু হয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে সতর্কতা অবশ্যই অবলম্বনীয়।

আমরা শেষ পর্যন্ত আশাবাদী এইজন্য যে আমাদের লেখকগোষ্ঠী এপার-ওপার দু বাঙলায় বিস্তৃত। আমরা আশাবাদী এইজন্য যে, বাঙলার মনীষীরা যেমন সুন্দরবনের বাঘের মতো সংখ্যালঘু হতে-হতে লুপ্তপ্রায় সেই অবশিষ্ট গুটিকয় মনীষীদের আমরা আশীর্বাদধন্য। আমরা আশাবাদী এইজন্য যে, সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে একদল তরুণ ইতিমধ্যেই মননে ও এষণায় তাঁদের প্রতিশ্রুতির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রেখেছেন—তাঁরা আমাদের সহযোগিতা করতে উৎসুক।

আমাদের বিশ্বাস, যাঁরা এতাবৎ পত্রিকাটিকে সস্নেহে লালন করেছেন, কেউ গ্রাহক হয়ে কেউ-বা বিজ্ঞাপন দিয়ে, তাঁরা কেউই হাত না গুটিয়ে আরও প্রসারিত করবেন।

নীরা রহমান
প্রকাশক

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য
সম্পাদক

১লা মে, ১৯৮৪

একটা দিন

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সাতটা তো মাত্র দিন।
তার সব কটিই ছেড়ে দিতে রাজী,
একটি বাদে।

একটি দিন শুধু আমার জন্যে থাক।
বিফল বাতিল একটি দিন
কোনও কাজেই যা লাগে না,
হিসেবের পাকা খাতায় জমার ঘরে
কিছুই যা পারে না তুলতে,
ফাঁকা দিন, ফাঁকিপড়া একটা দিন
প্রহরগুলো যার নিঃসম্বল শূন্যতায়
এলোমেলো ছড়ায়
দমকা হাওয়ার খেয়ালে।

এই লোকসানের দিনটাই
শুধু আমার জন্যে থাক।
আমি সেটাকে যেমন খুশি ভাসাব
ওড়াব ঘুড়ির মতো
ঘনঘটার আকাশেও
ভেজে ভিজুক, ছেঁড়ে ছিঁড়ুক
সুতো কেটে উধাও হয় তো হোক
—এই বেপরোয়া বাতুলতায়।

সবই তো জানি ছক-বাঁধা—
ছক-বাঁধা আর কলের চাকায় জোড়া
গড়গড়িয়ে গড়িয়ে যেতে
কোথাও যাতে না বাধে
একটা দল-ছাড়া দিনই
শুধু থাক আমার
দেউলে হবার দুঃসাহসে
যা দেওয়ানা।

বিবাহ

ক্ষিতিমোহন সেন

বেদের ভিতরের বড়ো আদর্শ ও বেদের বাহিরের বড়ো আদর্শের মধ্যে একটি যোগসেতু স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি অহিংসাই চাহেন অথচ যদি অহিংসা রক্ষা করিতে গিয়া আদর্শের মৃত্যু ঘটে তবে এমন স্থলে নিজের বা পরের দেহপাত করা তাহার অপেক্ষা অধিক দুর্গতি নহে। আর সেই দেহ যদি আত্মীয়েরই হয় তবেই বা কী? দেহ তো মাত্র এই জন্মের ; আদর্শ ও সত্য আমাদের যে জন্মজন্মের সার ধন।

শ্রীকৃষ্ণ যে যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে নারীর অনেকটা স্বাধীনতা ছিল। তাই তাঁহার ব্যবহারে নারী-সম্বন্ধে যে স্বাধীনতার পরিচয় পাই তাহা কতকটা যদু বৃষ্ণি সাত্বত প্রভৃতিদের মধ্যে প্রচলিত মুক্তভাব। তিনি পালিত আভীরকুলে, সেখানে নারীদের স্বাধীনতা ছিল আরও বেশি। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে এবং আদর্শে নারীদের বিরুদ্ধে তেমন কিছু দেখা যায় না।

অবশ্য তিনি কোনো সন্ন্যাসীর সংঘ স্থাপন করেন নাই। করিলে হয়তো তাঁরও বাণীর মধ্যে ভারতের সন্ন্যাসের পরম্পরাগত ধারায় ঐ মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। নিজের জীবনে তখনকার সমাজ-প্রচলিত নারীদের স্বাধীনতা একটুও ক্ষুণ্ণ না করিয়া তিনি বরং প্রশ্রয়ই দিয়াছেন। তবু পরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ যেসব সন্ন্যাসী ও সাধকদের দল ভারতে গড়িয়া উঠিল তাঁহাদের মধ্যে ক্রমাগতই শোনা গেল 'কামিনী ও কাঞ্চনের' প্রতি বিদ্বেষ। যদিও সকল সময় কার্যত এই বিদ্বেষ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই।

একটা মজার কথা এই যে মায়াবাদী শঙ্কর অদ্বৈতবাদী, আর রামানুজ প্রভৃতি দ্বৈতবাদী। উভয়ের মত একেবারে ভিন্ন কোটির, কিন্তু সন্ন্যাসী বলিয়া উভয়েরই মত নারী সম্বন্ধে ঠিক এক। শঙ্করের অভেদবাদে তো নারী-নরের মধ্যে ভেদ থাকার কোনই কথা নাই, সবই তো মায়া। তবু কেন যে নারীর প্রতি পুরাতন এই বিদ্বেষ তিনিও এড়াইতে পারিলেন না! সেই নারী ও তাহার অধিকৃত কাঞ্চনের উপর এত বিদ্বেষ যে তাঁহার কেন রহিয়াই গেল, তাহা বলা কঠিন।

গুরু রামানন্দ ব্যক্তিগতভাবে নারীদের প্রতি প্রতিকূল ছিলেন না। অনেক শিষ্যকে তিনি সাধনার জন্য স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া যাইতে রীতিমত নিষেধ করেন। তবু তাঁহার সম্প্রদায়েও সেই পুরাতন বুলি—'কামিনী কাঞ্চন'।

কবীর তো একজন অসাধারণ মনীষী। তিনি নিজে সপরিবারে সাধন করিলেন ও অপরকেও সেইরূপ উপদেশ দিলেন। তবু তাঁহার নামেও এমন অনেক বাণী লোকে চালাইতে চান যাহাতে দেখি সেই বিদ্বেষ —'কামিনী কাঞ্চন'।

তুলসীদাস তাঁহার রামচরিত-মানসে অর্থাৎ রামায়ণে নারীদের চরিত্র অতি উচ্চভাবে আঁকিয়াছেন। শূর্পণখা ছাড়া একটিও হীন নারীর চরিত্র সেখানে নাই। তাঁর বাণীর মধ্যে কেন যে নারীর বিরুদ্ধে কিছু বিদ্বেষ দেখা দিল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

বৈষ্ণবেরা তো পুরুষ মানেন একমাত্র ভগবানকে ; তাহা ছাড়া আর সবই তাঁর প্রকৃতি। তবু নারীদের বিচারের সময় হঠাৎ পুরুষ হইয়া এই কথা তাঁহারা ভুলিয়াছেন, উচ্চারণ করিয়াছেন সেই পুরাতন 'কামিনী কাঞ্চন'। সুরদাস প্রভৃতি ভক্তের দল তো সদা এই ভাবরসেই ভরপুর, তবু তাঁহারাও ইহা ছাড়াইতে পারেন নাই। জীব গোস্বামী তো এইজন্য মীরার কাছে লজ্জিত হইয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। শ্রীরাধার ও গোপিকাদের রাগানুগা প্রীতির যাঁহারা উপাসক তাঁহারা কেমন করিয়া এই কথা বলেন তাহা বুঝিয়া উঠা মুশকিল।

আজ পর্যন্ত ভারতে শত শত সাধু সন্ন্যাসী হইয়া গেলেন, তাঁহাদের কত জনের নাম ভারতে ও ভারতের বাহিরে নর ও নারীর দল সমানভাবে ভক্তির সহিত উচ্চারণ করেন, তাঁহারাও সেই কথাটার ঊর্ধ্বে কেন যে উঠিতে পারিলেন না তাহা দুর্বোধ্য।

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য এই, যেসব সাধু নারীদের সম্বন্ধে এই অতি হীন বাণী সবচেয়ে বেশি উচ্চারণ করিয়াছেন, তাঁহাদের চরণেই নারীরা সবচেয়ে বেশি প্রণত। ইহাকে কী মানসিকতা বলিব? যাঁহারা নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া কথা বলিয়াছেন তাঁহারা নারীদের শ্রদ্ধা তেমন করিয়া কি পাইয়াছেন?

মানুষ হিসাবে বুদ্ধদেবের মনের ভাব নারীদের সম্বন্ধে বিরূপ ছিল না। তাঁহার মাতা পত্নী সকলেই ছিলেন চমৎকার নারী। তবু যেই তিনি সন্ন্যাসী-রূপে সংঘ স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তখন নারীর প্রতি অবিশ্বাসের বুলি তাঁহাকেও পাইয়া বসিয়াছে দেখা যায়। যখন বুদ্ধকে ভিক্ষুণী-সংঘ স্থাপন করিতে বলা হইল, তখন তিনি প্রথমে এড়াইতে চাহিলেন। পরে একান্ত বাধ্য হইয়া ভিক্ষুণী-সংঘ স্থাপন করিলেন বটে কিন্তু কহিলেন, ইহাতে আমাদের সংঘের পরমায়ু অর্ধেক কমিয়া গেল।

তারপর, ভিক্ষুণীদের স্থান ভিক্ষুদের অপেক্ষা অনেক নীচে দেওয়া হইল। তাঁহাদের ভিক্ষুণী-সংঘ স্থাপনের অষ্ট-বিধি দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। সর্বত্রই ভিক্ষুদের অপেক্ষা ভিক্ষুণীদের স্থান হীন। তখনকার নিয়মগুলি দেখিলেই মনে হয় তাহাতে ভিক্ষুণীদের প্রতি যেন ঠিক সুবিচার করা হয় নাই। ভিক্ষুণী প্রতিমোক্ষের বিষয়গুলির কথা এখানে না-ই উল্লেখ করিলাম। কারণ তাহার প্রয়োজনের সব ইতিহাস এখন খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। অবশ্য ভিক্ষুণী প্রতিমোক্ষে ও তাহার টীকায় সে-সবগুলির ইতিহাস দেওয়া আছে। কিন্তু মনে হয় 'এহো বাহ্য, আগে কহ আর।'

জৈনদের মধ্যেও সাধ্বীদের স্থান আছে কিন্তু সেখানেও ঐ একই কথা।

জৈন ও বৌদ্ধ তো বেদবিরুদ্ধ ধর্মমত। বেদপন্থী স্মৃতি ও পুরাণেও সেই প্রাচীন নারীবিদ্বেষের দাহ ধরা পড়ে। তাঁহারাই মাতৃভাবে নারীকে স্বর্গের অপেক্ষাও বড়ো স্থান দিয়াছেন, আর প্রণয়িনী হিসাবে এতদূর হীন করিয়া দেখিয়াছেন। প্রাচীন বৈদিক আর্যভাব ও আর্যেতর সেই বিদ্বেষের ইতিহাস—এ উভয় বিরুদ্ধ বস্তুর একটি অপূর্ব খিচুড়ি দেখা যায় এইসব স্থলে। তাই নারী সম্বন্ধে স্মৃতিপুরাণাদির বাক্য এত পরস্পর-বিরুদ্ধ।

জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি সন্ন্যাস-আশ্রমের দল মনে হয় বৈদিক ধর্মের অপেক্ষা বেদ-পূর্ব আর্য-পূর্ব যোগ-সাধনা বৈরাগ্য সন্ন্যাসের কাছে বেশি ঋণী। দুঃখবাদ, বৈরাগ্য, কর্মবাদ, যোগ, নির্বাণ, মুক্তি প্রভৃতি কথা বৈদিক আর্যদের মধ্যে আসিয়াছে ঐসব স্থান হইতেই। বুদ্ধ যে শাক্যকুলে জন্মেন সেই বংশের ও বজ্জি লিচ্ছবি

প্রভৃতি বংশের আচরণ দেখিয়া মনে হয় তাঁহাদের জীবন বেদোদিত নিয়মে সুদৃঢ়বদ্ধ ছিল না। তাঁহারা অনেক পরিমাণে ছিলেন স্বাধীন। বাইরের সব বড়ো বড়ো ভালো ভালো আদর্শ সহজেই তাঁহাদের স্পর্শ করিত। বৈদিক বিবাহবিধি অনুসারে বুদ্ধদেবের পক্ষে গোপাকে বিবাহ করা কঠিন হইত। ভালো আদর্শের মতো মন্দ আদর্শ আসিবার মতো স্থানও তাঁহাদের মধ্যে ছিল।

আর্যপূর্বদের মধ্যে নারীরাই হইলেন ধনের অধিকারিণী। তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীন, বিধিব স্বারা বদ্ধ নহেন। পুরুষদের সেসব সমাজে গৌণ স্থান। তাঁহাদের মধ্যে একদল পুরুষ তখন স্বেচ্ছাবিহারিণী নারীদের ও তাহাদের ধন-ঐশ্বর্য সম্ভোগ করিয়া ছিল তৃপ্ত। আর একদল লোক ছিলেন যাঁহাদের আত্মা ঐসব ক্ষুদ্র সুখে ভরে না। তাঁহারা যোগে, ধ্যানে, সাধনায় সন্ন্যাসী হইয়া সমাজ হইতে সরিয়া যাইতেন।

আমাদের মধ্যে ধর্মসাধনায় কোথাও সংসার এবং স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার প্রয়োজন দেখা যায় না। উপনিষদে সর্বত্র গৃহস্থ হইয়াই ধর্মাচরণ। ফলে স্ত্রীদের প্রতি কোথাও তাঁহাদের বিদ্বেষ নাই।

কিন্তু আর্যপূর্ব সভ্যতায় এইসব 'স্বৈরিণী' নারীদের প্রতি ও তাঁহাদের ধনের প্রতি একদল উচ্চ-আদর্শযুক্ত লোকের আসিল একটা বিষম বিদ্বেষ বিতৃষ্ণা, কারণ সামাজিক কোনো উচ্চ আদর্শ স্বারা ঐসব ভোগ-সুখ নিয়ন্ত্রিত ছিল না।

নারীদের সম্বন্ধে যেসব অতি হীন ও তুচ্ছ কথা আমাদের সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রচলিত আছে, খুব সম্ভব তখন হইতেই আসিতেছে। কারণ আর্যসভ্যতার প্রবর্তনের পর নারীর জীবন অন্যদিকে যেমনই ক্ষতিগ্রস্ত হউক, এই দিকে বেশ একটি শুচিতা নারীর মধ্যে আসিয়াছে। সেই আদি প্রাচীন যুগে সকল ধন ও কাঞ্চনের অধিকারিণী 'স্বৈরিণী' কামিনীদের বিরুদ্ধে চিরসঞ্চিত বিদ্বেষ যে একদল বৈরাগ্যবাদী সন্ন্যাসী পোষণ করিয়াছেন আজও তাহার ধারা সকল রকমের সন্ন্যাসী-ধারার মধ্য দিয়া সমানভাবে চলিয়া আসিতেছে। অথচ হিন্দুসমাজের গার্হস্থ্য জীবনে এরূপ কোনো একটা বিদ্বেষ কোথাও থাকিবার হেতু নাই।

বিবাহে আমাদের শঙ্খ ও সিন্দুর সধবার অপরিহার্য লক্ষণ। ইহা ধারণ করিতেই হয়। শঙ্খধারণের কোনো মন্ত্রই নাই। ইহার জন্য কোথাও কোথাও অবৈদিক মন্ত্র, কোথাও কোথাও বা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারেই মন্ত্র পাঠ করা হয়। সিন্দুর তো নাগদেরই বস্তু।' ইহার নাম নাগগর্ভ, নাগসম্ভব ইত্যাদি। নাগদের কাছেই ইহা প্রাপ্ত। বিবাহে সিন্দুর পরানো একটি মুখ্য স্ত্রী-আচার, তাহাতে বৈদিক মন্ত্র মেলে কেমন করিয়া? চমৎকার এক উপায় বাহির হইল। যে মন্ত্রে আছে "সিন্ধুনদের উচ্ছ্বাসের ন্যায় ঘৃতের ধারা যজ্ঞে পতিত হউক।" সেখানে 'সিন্ধোঃ ইব' বা 'সিন্ধোঃ উচ্ছ্বাসে' সন্ধি করিয়া 'সিন্ধোরিব' বা 'সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে' তাহাই শব্দসাম্যে হইল সিন্দুরের মন্ত্র। তাই এখন একটি মন্ত্র—'সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাশঃ' ইত্যাদি। অন্যত্র 'সিন্ধুরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণম' ইত্যাদি। বলা বাহুল্য স্বয়ং মন্ত্রকর্তারাও এখন সিন্দুরের সঙ্গে তাঁহাদের এসব মন্ত্রের যোগ দেখিলে অবাক হইয়া যাইতেন।

আমাদের কল্যাণকর্মে ব্যবহৃত পানের নামও নাগবল্লী। তম্বোলীদের কোথাও কোথাও নাগ বলে। এই মাঙ্গলিকটিও আমাদের নাগদের কাছেই পাওয়া।

শঙ্খটার ব্যবহার তিব্বতে ও ভোটেই বেশি। তাঁহাদের অনেকে আস্ত শঙ্খে ছিদ্র করিয়া হাত প্রবেশ করান। ইহা তাঁহাদের মাঙ্গল্য। তিব্বত তো সাগর হইতে দূরে। শঙ্খ কেন তাঁহাদের মাঙ্গল্য বস্তু? হয়তো এক সময়ে তাঁহারা হিমালয়ের এধারে ভারতে সমুদ্রের অদূরে ছিলেন। ক্রমে আর্যদের চাপে গেলেন সরিয়া। তবু কামরূপ কামাখ্যা নেপাল কাশ্মীর প্রভৃতি উপত্যকায় তাঁহাদের বহু তীর্থ রহিয়া গিয়াছে। কোচ, মেচ প্রভৃতি জাতিতে সেইসব তান্ত্রিকাচার, নীতিবিগর্হিত শৈব-মত যে প্রচলিত ছিল, প্রাচীন কাহিনী দেখিলেও তাহা বুঝা যায়। শিবের কৃচানীপাড়ায় বিহারের বহু কুৎসিত চিত্র বাংলা সাহিত্যে মেলে।

অনার্য পত্নীদের সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তন আসিল আর্যদের সমাজে। বেদের স্থলে আসিল মন্ত্রতন্ত্র, বেদির স্থলে আসিল তান্ত্রিক স্থণ্ডিল, যজ্ঞের স্থানে আসিল চক্র, সোমরসের স্থানে আসিল সুরা, যজ্ঞের স্থানে আসিল ষট্ কর্ম, ওঁকারের স্থানে আসিল 'হুম্'কার, পুরোডাশের স্থলে আসিল মুদ্রা, মাংসের স্থলে কতক পরিমাণে আসিল মৎস্য।

আমাদের ধর্মাচরণের মধ্যে প্রধানই হইল হব্য ও কব্য অর্থাৎ যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধ। হব্যটা আর্যদের প্রায় বিশুদ্ধই আছে। কিন্তু কব্য জিনিসটা অনেকটা হয়তো প্রতিবেশীদের কাছেই পাওয়া। তীর্থাদিতে অস্থি নিক্ষেপ সাঁওতাল-ওরাওঁদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। ওরাওঁরা ইহাকে বলে হাড়বোড়া। অর্থাৎ অস্থি ডুবানো। আমাদের শ্রাদ্ধকার্যেও কন্যা ও স্ত্রীগণের সম্বন্ধেরই প্রাধান্য। রিজলী গেটের সেন্সাস্-রিপোর্টে দেখা যায় উত্তর-ভারতে অনেক দ্রাবিড়-বংশীয় জাতির মধ্যে শ্রাদ্ধের পুরোহিত হয় ভাগিনেয়। শ্রাদ্ধে জামাতা, ভাগিনেয়, দৌহিত্রাদি বিশেষভাবে অর্চনীয়।

তন্ত্রে দেবতা নারী হইলেও নারীদের সেখানে বড় হীন রকমে নানাভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহাতে নারীর গৌরববরক্ষা হয় না। অবশ্য সব তন্ত্র এইরূপ নহে। মহানির্বাণ প্রভৃতির মধ্যে নারীর স্থান খুব উচ্চে। সেখানে মহাদেব বলিতেছেন, 'হে পার্বতী, সকল নারী তোমারই স্বরূপ। জগতে তাহারা প্রত্যেকে প্রচ্ছন্নবিগ্রহ।'

তব স্বরূপ রমণী জগত্যাচ্ছন্নবিগ্রহ।

অনেক তন্ত্রে কুমারীপূজা নারীর পূজা প্রভৃতি থাকিলেও ধর্মাচরণে তাহাদের ব্যবহার যেরূপভাবে চলিয়া আসিতেছে তাহাতে বুঝা যায় যেখানে এইসব তন্ত্রের উৎপত্তি সেখানে নারীর নৈতিক জীবন কতটা অসংযত ছিল।

আর্য-পূর্ব জাতি তো একটি নহে যে ঠিক সকলেরই সভ্যতা একরূপই হইবে। তাহাদের মধ্যেও খুব উচ্চ ও খুব নীচ সবরকম ভাবেরই সভ্যতা আছে। মনে হয় যোগ, কায়াযোগ, মুদ্রা, গুরুবাদ, অবতারবাদ, অহিংসা, জন্মান্তরবাদ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস প্রভৃতি বড়ো বড়ো সম্পত্তি অনেকটা তাহাদের কাছেই পাওয়া। এইখানে তাহার উল্লেখমাত্র করা গেল। অন্যত্র তাহার সম্বন্ধে আলোচনা আমি করিয়াছি। সেগুলি খুব উচ্চ দরের আর্যপূর্ব সভ্যতার সম্পত্তি।

আর্যরাও তাঁহাদের সন্ন্যাসাদি আশ্রম কেমনভাবে গ্রহণ করিবেন তাহা লইয়া দীর্ঘকাল চিন্তা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অথর্ববেদ ব্রাত্যকাণ্ডে ও নানা স্থানে সেইসব আভাস পাওয়া যায়। অনেক আর্যও তখনই ঐভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যজ্ঞাদি ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ক্রমে আর্যরা সন্ন্যাসাদির আদর্শকে কতক পরিমাণে গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করিয়াই ব্রহ্মচর্য ও বানপ্রস্থাদির ব্যবস্থা করিলেন।

সমুদ্র হইতে দূরে, মধ্য-এশিয়া হইতে মধ্য-য়ুরোপ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল প্রাচীন আর্যজাতি। তাঁহারা ছিলেন বলবীর্য ও পুরুষদেবতার উপাসক। ইঁহাদের মধ্যে কি সমাজে কি পরিবারে পুরুষরাই প্রধান, তবে নারীর প্রতি তাঁহাদের ছিল রীতিমত শ্রদ্ধা ও ভদ্রতা।

আর-একটি সভ্যতা আরও পূর্বে অতি প্রাচীন যুগে ছিল ভূমধ্যসাগরের কূল, ক্রীট প্রভৃতি দ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া, মিশর মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি দেশ দিয়া ভারতের সিন্ধুপ্রদেশ পার হইয়া ভারতের মধ্য ও দক্ষিণ ভাগ পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এই সভ্যতারই কীর্তি এখন দেখা যায় মিশরের মাটির নীচে, উর প্রভৃতি ভূগর্ভস্থ নগরে, মোহেনজোদারো হরাপ্পা প্রভৃতি স্তূপের তলে। এই সভ্যতা পুর-মন্দিরসৌধ রচনায় ছিল অতুলনীয়। এই সভ্যতার খুব অল্প অংশই আজ পর্যন্ত মাটির নীচ হইতে বাহির করিয়া দেখা হইয়াছে।

এই সভ্যতার আলোকেই একদিন ভারতে আর্যপূর্ব দ্রাবিড়াদি জাতি ছিল মহাগৌরবময়। আর্যদের স্বারা কোণঠাসা হইয়া আজ এই সভ্যতা পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে সত্য, কিন্তু এক সময়ে যে এই সভ্যতা সিন্ধু নদেরও উত্তর-পশ্চিমে ছিল, তাহার পরিচয় মেলে রাহুই প্রভৃতি জাতির ভাষা দেখিয়া আর মাটির নীচেকার সাক্ষ্যপ্রমাণ তলব করিয়া।

এই সভ্যতার দেবতা ছিলেন নারী, অনেক স্থানে পুরোহিতও হইতেন নারী। শুধু মিশর দেশে নয়, প্রাচীন দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতির মধ্যেও তাহার সন্ধান মেলে। বৈদিক আর্যদের মধ্যে নারীর পৌরোহিত্য ছিল অপরিজ্ঞাত। বেদে দুই-একজন যে নারী-ঋষি পাই তাহা হয়তো কতকটা ভারতীয় দ্রাবিড় প্রভাবের ফলে। আর্যেতর জাতিও যে বৈদিক সভ্যতার মধ্যে স্থান পাইতেছিলেন তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদেই পাই।

তৈত্তিরীয়সংহিতা-মতে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১৮৯নং সূক্তের ঋষি হইলেন সর্পরাজ্ঞী নামে এক নারী-ঋষি। সর্প স্বারাই বুঝা যাইতেছে, ইনি আর্যপূর্ব নাগ-বংশীয়।

এই নাগ-বংশীয়দের অনেকেই তখন ঋষির পদবী

প্রাপ্ত হইয়াছেন। কদ্রুর পুত্র নাগ-বংশীয় অর্বুদ ছিলেন ঋগ্বেদীয় দশম মণ্ডলের ৯৪ সূক্তের রচয়িতা। সায়ন বলেন, "কদ্রুবাঃ পুত্রস্য সর্পস্য অর্বুদস্যায়ম্।" ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৭৬ সূক্তের ঋষি ছিলেন ইরাবতের পুত্র সর্পজাতীয় জরৎকর্ণ। সায়ন বলেন, "ইরাবতঃ পুত্রস্য সর্পজাতের্জরৎকর্ণনাম আর্যম্।"

মহাভারতে সহদেবের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে দেখিতে পাই সেখানে আর্যদের অগ্নি-উপাসনা গৃহীত হইলেও তখনও সেখানে নারীর হাতে কিছু কিছু ধর্মসাধনার অধিকার রহিয়া গিয়াছে। পাণ্ড্যরাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া সহদেব দক্ষিণে কিষ্কিন্ধ্যাতে গেলেন। সেখান হইতে তিনি গেলেন মাহিষ্মতী নগরীতে। সেখানে সহদেব দেখিলেন অগ্নিহোত্রের অগ্নি উদ্ধোধিত হইতেন নীল রাজার কন্যার দ্বারা। সেই কন্যা তাঁহার সুন্দর ওষ্ঠাধরের ফুৎকারেই অগ্নিহোত্রের অগ্নিকে জ্বালাইতেন। ইহা বিধি বা আচার-সঙ্গত নহে। তবু অগ্নি সেখানে বৈধ আচারে প্রজ্বলিত হইতে চাহিতেন না।

ব্যজনৈ ধূয়মানোঽপি তাবৎ প্রজ্বলতে ন সঃ।
যাবৎ চারুপুটৌষ্ঠেন বায়না ন বিধূয়তে॥

মহাভারত, সভাপর্ব।

ঐ কন্যার রূপে মুগ্ধ অগ্নি, কন্যার পিতার কাছে কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন। রাজা প্রথমে রাজী না হইলেও পরে তাঁহাকে হার মানিতে হইল। কারণ পূর্বেই ব্রাহ্মণরূপে অগ্নি তাঁহাকে যথেচ্ছা সম্ভোগ করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে সম্মতি দেওয়া ছাড়া উপায় কী? কাজেই অগ্নি সেখানে পারদারিক এই নাম গ্রহণ করিলেন।

শ্রূয়তে হি গৃহীতোবৈ পুরস্তাৎ পারদারিকঃ।

এখানে টীকাকার নীলকণ্ঠ, "পারদারিক" ব্যাখ্যায় বলিতেছেন, পারদারিকঃ স্বেন অনূঢ়ায়া অপি পরকীয়ত্বাৎ পরদারাসক্তো গৃহীতো বিবশঃ"।

এখনও এই বিধি মালাবারে কোচিনে চলে।

তাই অগ্নি সেখানে নারীদের বর দিলেন যে তাহারা 'স্বৈরিণী' স্বচ্ছন্দচারিণী হইয়া যাহাকে ইচ্ছা সম্ভোগ করিতে পারিবে। কেহ তাহাদের প্রতিবারণ করিতে পারিবে না। নারীরা সেখানে যথেচ্ছ বিহার করিবে।

এবমগ্নির্বরং প্রাদাৎ স্ত্রীনামপ্রতিবারণে।
স্বৈরিণ্যস তত্র নার্য্যোহি যথেষ্টং বিচরন্ত্যত॥

যে-সব আর্য বৈদিক আর্যদের পরে ভারতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও সামাজিক শাসন কতকটা শিথিল ছিল। যদু, তুর্বসু, বৃষ্ণি, সাত্বত প্রভৃতিদের রীতিনীতি দেখিলেই তাহা বুঝা যায়।

শাক্য বৃষ্ণি প্রভৃতিদের মধ্যে তো নারীদের অপরিমিত স্বাধীনতা ছিল। তাহাদের মধ্যে সগোত্রে, এমনকি পিতৃব্যকন্যাকেও বিবাহ করা চলিত। অনেকে মনে করেন, কুরু-পাঞ্চালরা বৈদিক আর্যদের অপেক্ষা পরবর্তী কালে ভারতে আগত। যদি দ্রৌপদীর পঞ্চপতির কথা সত্যই হয় তবে তাহা কি কতক পরিমাণে অনার্য সংস্পর্শের ফল? যেসব আর্যের মধ্যে বিধিবিধান ও আচার একটু শিথিল ছিল, হয়তো অনার্য প্রভাব তাঁহাদেরই বেশি পরিমাণে পাইয়া বসিয়াছে, ইহা অস্বাভাবিক নয়।

আর্যেতর ভারতীয় অনেক প্রাচীন সভ্য জাতির সমাজে তখন নারীরাই প্রধান। তাঁহারাই ধনের অধিকারিণী। উত্তরাধিকার মাতা হইতে কন্যানুগত। আর্যদের সমাজে নারীর আর্থিক স্থিতি ও স্বাধীনতা এত সুবিধাজনক ছিল না। কিন্তু পারিবারিক বিবাহিত জীবনে আর্য-নারীর স্থান ছিল বেশ গৌরবের। স্বামী হইলেন পতি, স্ত্রী হইলেন পত্নী। বেদের মধ্যে দেখি বধূকে আশীর্বাদ করা হয় এই বলিয়া—'শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, দেবর, স্বামীর পরিজনের কাছে তুমি সম্রাজ্ঞী হও।'

পত্নী যজ্ঞে যজমানের সহধর্মিণী। গৃহেও তিনিই গৃহিণী।

মোটকথা, স্বাধীনতা ও আর্থিক দিক দিয়া আর্যেতর মহিলাদের অবস্থা ভালো হইলেও তাঁহাদের পারিবারিক ও নৈতিক জীবন ততটা সুবিধার ছিল না।

'বিবাহ' জিনিসটাই আর্যদের, কারণ কন্যাকে যথার্থই স্বামী-গৃহে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইত। আর্য-পূর্বদের মধ্যে কন্যা অনেক স্থলে স্বামী-গৃহেই যাইতেন না। মহাভারতের ভাষায় তাঁহারা স্বেচ্ছাবিহারিণী, 'স্বৈরিণী'। আর্যদের মধ্যে নারীর স্থান এবং নৈতিক উৎকর্ষের স্থান দেখিয়া ও কতকটা বিজেতাদের পত্নী হইবার জন্য অনেক আর্যেতর মহিলা আর্যদের বিবাহ করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

আর্যরা তখন যুদ্ধ করিতে করিতে আগত। অনেক সময়ে নিজের সমাজে স্ত্রী মেলা হইত কঠিন। তাই অনেকে অনার্য স্ত্রী গ্রহণ করিতেন। অল্পদিন পূর্বেও দেখা যাইত, নম্বুদ্রী ব্রাহ্মণদের মধ্যে বড় ছেলে ছাড়া অন্যান্য ছেলেরা নায়ারকন্যার সঙ্গেই বাস করিতেন। অবশ্য নায়ারকন্যার গর্ভে জাত সন্তান ব্রাহ্মণ বলিয়া গৃহীত হয় না, কারণ নায়ারকন্যারা ব্রাহ্মণদের পরিণীতা পত্নী নহেন। তাঁহাদের পরিণীত পতি থাকে, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহারা বাস না করিয়া ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই বাস করেন। বিবাহিত পত্নী হইলেও এইসব নায়ার-রমণীর পুত্রেরা ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন না।

দেখা যায়, মাতৃগণের মধ্যে অব্রাহ্মণী থাকিলেও সন্ততি ব্রাহ্মণই হন, এবং তাঁহাদের পৌরোহিত্যও বৈধই হয়, কাজেই লাট্যায়ন ও দ্রাহ্যায়নের সময় যে অসবর্ণ বিবাহ রীতিমতই বৈধ ছিল তাহা বুঝা যায়।

কিন্তু তবুও ক্রমে শূদ্র-পত্নীদের সঙ্গে সকল পত্নীদেরই মর্যাদা হীন হইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহাদের স্থান কোনো কোনো স্থলে প্রায় দাসীর মতোই হইয়া আসিল। ইহাতে বুঝা যায়, স্ত্রীদের মধ্যে তখন শূদ্রকন্যার রীতিমত বাহুল্য ঘটিয়াছে। তাঁহাদের ভারেই সকল পত্নীর গৌরব আসিয়াছে নামিয়া।

এখানে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে আর্য-পূর্ব সকল জাতি এক নহে। বহু বহু মানবজাতি তখন ভারতে ছিল। তাহাদের মধ্যেও নারীর স্থান কোথাও খুব উচ্চ, কোথাও সাধারণ, কোথাও বা হয়তো হীনরকমেরও ছিল। মোট কথা, ভারতীয় বৈদিক হিন্দুদের মধ্যে এইসব আচার ব্যবহার লইয়া ফলাফল এই দাঁড়াইল যে নারী হইয়া উঠিলেন দাসী। বেদে তাঁহার অধিকার নাই। শূদ্রবৎ তাঁহার সব ধর্মগত অধিকার।

আরও কয়েক বিষয়ে অনার্যদের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতীয় আর্যেরা আচারে ও সংস্কারে বিশেষ দৃঢ়বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। বিধবাবিবাহ ছিল। কিন্তু বিবাহে চারিদিকের শৈথিল্য দেখিয়া হয়তো তাঁহারা ভীত হইলেন। যে আর্যবিবাহে পূর্বে বরকন্যার সম্মতিই ছিল প্রধান কথা, তাহাতে পিতার সম্মতিই ক্রমে বড়ো হইয়া উঠিতে লাগিল। জাতিভেদও ইহার একটা মুখ্য কারণ। কন্যাদান কথাটা পূর্বে একটা পারিভাষিক শব্দমাত্র ছিল। তাহাতে বরকন্যার বরণে পিতামাতা গুরুজনের সম্মতি বুঝাইত। ক্রমে তাহা দাঁড়াইল রীতিমত দানে। বিধবাবিবাহ পূর্বে ছিল। পরে নানা কারণে তাহা বন্ধ হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রয়োজন বুঝিয়া যখন তাহা পুনরায় প্রবর্তন করিতে গেলেন, তখন প্রশ্ন উঠিল, কন্যা তো দত্তা, কন্যার মালিক বর তো মৃত, এখন দান করিবে কে? বিদ্যাসাগর বৃহস্পতির বচনাদি হইতে দেখাইলেন, এখানে দান কথাটা পারিভাষিক। নহিলে পিতা তাঁর কন্যাত্বমাত্র স্বত্ব দিতে পারেন তবে সে কন্যা গ্রহীতার দত্তক কন্যা হয়, স্ত্রী হয় না। কাজেই এখানে দানের দ্বারা স্বত্বদান বুঝায় না, সম্মতিদানই বুঝায়। কন্যা কাহারও গোরুবাছুরর মতো সম্পত্তি নহে। অনার্য পত্নীদের সঙ্গে সঙ্গে অনার্য আচার-বিচার-ব্যবহার, দেবদেবী, পূজাপদ্ধতি, সবই আর্যদের সমাজকে ঘিরিয়া ফেলিতে লাগিল।

রামায়ণ-মহাভারতে দেখা যায়, সীতা ও দ্রৌপদী প্রভৃতি ক্ষত্রিয় নারীরা রন্ধন করিয়া শত শত মুনিঋষিকে প্রতিনিয়তই খাওয়াইতেছেন। পূর্বে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ শূদ্রাদির পক্ব অন্ন গ্রহণ করিতেন। ব্রাহ্মণের গৃহে শূদ্র পাচক থাকিত।

দক্ষিণ দেশের পণ্ডিত শ্যাম শাস্ত্রীর লেখা 'এভলিউশন অব কাস্‌টস' গ্রন্থে তিনি এই কথাই বলিয়াছেন।

গৌতম-বশিষ্ঠাদি ধর্মসূত্রে বেশ দেখা যায় তখন আহারে আজকার দিনের মতো বাঁধাবাঁধি ছিল না। খুব সম্ভব এইসব ছোঁয়া না-ছোঁয়া, খাওয়া না-খাওয়া, আচারের বাঁধাবাঁধি, বৈদিক আর্যদের মধ্যে প্রাচীনকালে ছিলই না। ইহা এখনও আর্যেতরদের মধ্যেই বেশি।

বৈদিক আর্যদের মধ্যে প্রথমে যজ্ঞে ও ব্রতদীক্ষাকালে একটু বাঁধাবাঁধি আসিল। ক্রমে এখন এমন হইয়াছে যে যাঁহাদের কাছে আর্যরা এই আচারটি পাইলেন তাঁহাদের আর্যরা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। এখনও এইসব আচার আর্যবহুল পঞ্জাব প্রভৃতি দেশ হইতে দ্রাবিড়-প্রধান দক্ষিণেই অনেক বেশি কঠিন।

খুব সম্ভব জাতিভেদও অনেক পরিমাণে এমন করিয়া ধীরে ধীরে বৈদিক হিন্দুদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল।

এতাবৎ অপ্রকাশিত এই নিবন্ধ শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত। প্রয়াত লেখকের আশু প্রকাশ্য 'আমাদের সমাজে নারী' পুস্তকে নিবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত।

ক্রান্তদর্শী

তৃতীয় পর্ব

অন্নদাশঙ্কর রায়

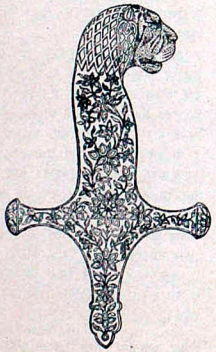

প্যারিসের পতনের খবর শুনে স্বপনদা পুরো চব্বিশ ঘন্টা কেঁদেছিলেন। তখন তাঁকে নিরস্ত করার জন্যে কেউ ছিলেন না। দীপিকাদির সঙ্গে বিয়ে হয় নি। পাঁচ বছর বাদে বার্লিনের পতনের সংবাদ পেয়ে তিনি সেই যে কাঁদতে শুরু করলেন চব্বিশ ঘন্টা পরেও তার বিরাম নেই। বৌদি তো জেরবার।

"তুমি যে একজন প্রচ্ছন্ন নাৎসী তা যদি আমি জানতাম তাহলে তোমায় বিয়ে করতুম না। হিটলার মরেছে, তাতে তোমার কী? কামরূপেতে কাক মরেছে, কাশীধামে হাহাকার!" বৌদি ব্যঙ্গ করেন।

"না, না, আমার এ শোক হিটলারের জন্যে নয়। জার্মান জাতির জন্যে। ওরা পরাজিত, পরাধীন, দ্বিধা-বিভক্ত। বিসমার্কের ঐক্যসাধনা সমাপ্ত করতে এসে হিটলার সেটাকে ধ্বংস করে গেলেন। বুদ্ধিমান হলে তিনি জানতেন কোথায় থামতে হয়। থামা উচিত ছিল মিউনিক চুক্তির পর। চেকোস্লোভাকিয়ার জার্মানভাষী অঞ্চলটা গ্রাস করে দাঁড়ি টানা উচিত ছিল। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়া গ্রাস করা হয়ে গেছে। তা হলে জার্মান জাতির ঐক্যের সাধনার আর কী বাকি থাকতে পারে! তা নয়। মাথায় ঘুরছিল সাতশো বছরের স্বপ্নসাধ। 'ড্রাঙ্ক নাখ অস্টেন।' পুবমুখে অভিযান। পুবদিকে দিগ্বিজয়। টিউটনিক অর্ডারের সন্ন্যাসীরা যা আরম্ভ করেছিলেন তাঁদেরই উত্তরসূরী এক ব্রহ্মচারী তাই শেষ করবেন। হিটলার শুধু বিসমার্কের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে আসেন নি, এসেছিলেন টিউটনিক অর্ডারের অসমাপ্ত কর্ম সমাধা করতে। বলটিক থেকে বলকান পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড টিউটনদের জন্যে চাই। স্লাভদের ভূমি কেড়ে নিতে হবে। স্লাভরা হবে স্লেভ। এই সাতশো বছরে দুই জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বড়ো কম হয় নি। স্লাভরা এবার পশ্চিম মুখে অভিযান চালিয়ে বার্লিনসমেত পূর্ব জার্মানি গ্রাস করেছে। ওদের রাহু-গ্রাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে ইঙ্গ-মার্কিনদেরও রাহু-গ্রাস। ওরা গ্রাস করেছে পশ্চিম জার্মানি। গোটা জার্মানির এবার পূর্ণগ্রাস। এমন একরত্তি জায়গা নেই যেখানে জার্মানরা স্বাধীন ও সার্বভৌম। জার্মান রাষ্ট্রই নেই। জার্মান সরকারই নেই। তবে সন্ধি হবে কার সঙ্গে কার? সন্ধি না হলে শান্তি হবে কী করে? শান্তি বৈঠক বসবে কী করতে? আমি তো চোখে

আঁধার দেখছি, রানু। ছেড়ে দাও গো, কেঁদে বাঁচি।" স্বপনদা কাতর কণ্ঠে বলেন।

"বিসমার্ক পই পই করে বারণ করেছিলেন দুই ফ্রন্টে লড়তে। কাইজার কর্ণপাত করে নি। হিটলারও না। মস্কো, লেনিনগ্রাড, স্টালিনগ্রাড কেড়ে নিতে গেলে বার্লিন, লাইপৎসিগ, ভাইমার হারাতে হয়। জার্মানরা সাতশো বছর ধরে স্লাভদের জন্মালিয়েছে। এবার দুশো বছর ধরে স্লাভদের দ্বারা জন্মালাতন হোক। সন্ধি! কিসের সন্ধি। সন্ধির মর্যাদা কি জার্মানরা মানে? কাইজার বলেছিলেন, স্ক্র্যাপ অব পেপার। হিটলার তো ততটুকুও স্বীকার করে নি। এই তো জার্মান ঐতিহ্য! সন্ধি করলে সন্ধির খেলাপ হবেই! বিজয়ীরা নিজেদের মধ্যে জার্মানি ভাগাভাগি করে নিয়েছে। যতদিন না নিজেদের মধ্যে লড়াই বাধে ততদিন শান্তি অবধারিত।" বৌদি আশ্বাস দেন।

স্বপনদা বিলাপের স্বরে বলেন, "কেন বৃথা স্তোক দিচ্ছ, রানু। বাঘে-গোরুতে দুর্দিনের সময় একঘাটে জল খায় বলে কি সব সময় একঘাটে জল খায়? পরে একদিন বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে গোরুর ঘাড়ে। গোরু যদি মোষ হয়ে থাকে তবে সেও তার শিং দিয়ে বাঘকে জব্দ করে। বাঘে-মহিষে লড়াইয়ের অনেক কাহিনী আমি শুনেছি। সেইরকম একটা লড়াই একদিন বেধে যাবে দুই প্রতিবেশী শিবিরে। যদি না ইতিমধ্যে একটা বাফার স্টেট হয় আর দুই শিবিরের সৈন্যদল জার্মানি পরিত্যাগ করে। বাফার স্টেটই এর সমাধান।"

বৌদি তর্ক করেন। "ওটা যে ভবিষ্যতে বাফার থাকবে এ গ্যারান্টি দেবে কে? একটা পার্টি যাবে, আরেকটা পার্টি আসবে, সে পার্টির বড়ো কর্তা নয়া নাৎসী বিটলার। তিনিও ছদ্মনামে এক সৈন্যদল গড়ে তুলবেন। অন্য নামে অস্ত্র তৈরি করবেন। তুমি কি মনে কর প্রত্যেকবারই রুশ মার্কিন একজোট হবে? বিটলার একদিকেই বেশি করে ঝুঁকবেন। ফ্রান্সের সঙ্গে মাখামাখি করবেন। ব্রিটেনের সঙ্গে কোলাকুলি করবেন। মার্কিনের সঙ্গে গলাগলি করবেন। পরের বার দুই ফ্রন্টে লড়াই নয়। কেবল পূর্বমুখে অভি-যান। রাশিয়া কেন তেমন ঝুঁকি নেবে? আধখানা জার্মানি হাতে রাখাই ওর বিচারে নিরাপত্তার গ্যারান্টি। বলা বাহুল্য সেটা হবে কমিউনিস্টশাসিত অংশ। হয়তো অত বেশি লালচে নয়।"

"তুমি দেখছি ক্রিপ্টো-কমিউনিস্ট। তা নইলে সোভিয়েটের দিকে টেনে বলতে না। স্টালিনের উচিত ছিল নিজের জায়গা ফেরত পেয়ে সেইখানে দাঁড়ি টানা। বড়ো জোর পোল্যান্ড অধিকার করে তাকে বাফার স্টেট করা। কিন্তু ওঁরও মাথায় ঘুরছে বিপ্লবকে জার্মানিতে রফতানি করা। জার্মান কমিউনিস্টদের মদত দেওয়া। তা নইলে বার্লিন পর্যন্ত ধাওয়া করার কী সার্থকতা থাকতে পারে? রাশিয়ানরা ধাওয়া না করলে ইঙ্গ-মার্কিনরাও ধাওয়া করত না। জার্মানির খানিকটে স্বাধীন, সার্বভৌম থেকে যেত।" স্বপনদার ধারণা।

"ওটা তোমার ভুল। দুই শিবিরই একবাক্যে দাবি করেছিল বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ। সেটা মেনে নিলে স্বাধীন সার্বভৌম জার্মানি বলে কিছু থাকে না। তার ধড়টা আস্ত থাকতে পারত, কিন্তু তার হাড়গোড় ভেঙে দেওয়া হত। মিলিটারি আর আধা-মিলিটারি হচ্ছে হাড়গোড়। দুই শিবিরই পরস্পরের সঙ্গে ভাগাভাগি করে দখলদার ফৌজ মোতায়েন করত। জার্মানরা ভাঙবে, তবু মচকাবে না। পরাজিত হবে, তবু বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করবে না। যা হবার তা হয়েছে। এতে শোক করার কী আছে? সুখী হবারই বা কী আছে? আমি কাঁদবও না, হাসবও না। এই নরমেধযজ্ঞ যে শেষ হয়ে এসেছে এই আমার কাছে যথেষ্ট। এখন দেখা যাক জাপান আর কতদিন খাড়া থাকে। ইটালি তো ইতিমধ্যেই কাত হয়েছে। মুসো-লিনি নিপাত।" বৌদি বলেন।

নীচের তলায় একটা শোরগোল শোনা গেল। এল্‌ফ কাকে যেন ঢুকতে দিচ্ছে না, ঘেউ ঘেউ করছে। বাবলী বলছে, "এল্‌ফ লক্ষ্মীটি, ওকে পথ ছেড়ে দে! ও খাবার নিয়ে এসেছে।" বৌদি নেমে গিয়ে দেখেন ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামানো হয়েছে মিষ্টির ভাঁড় আর মাছের ঝাঁকা। বিরাট কাতলা মাছ। বাবলীদের ভেঁড়ির মুটে বয়ে নিয়ে উপরে যেতে চায়, এল্‌ফ তাকে আগলে রাখছে।

"বৌদি, তুমি এল্‌ফকে বুঝিয়ে বলো দোঁখ

পৌমেরানিয়া এখন আমাদের দখলে। কাজেই এল্‌ফ এখন আমাদের কুকুর।" বাবলীর লজিক।

"ব্যাপার কী, বাবলী?" বৌদি আশ্চর্য হন। "এসব কেন?"

"কেন? তুমি কি জান না যে আমরাই জিতেছি। এটা আমাদের ভিক্‌ট্রি সেলিব্রেশন। বার্লিন যার জার্মানি তার। তবে সবটা নয়, এই যা আফসোস। বর্বর, বনমানুষ, পাষণ্ড, পাপিষ্ঠ, পিশাচ, রাক্ষস, শয়তান হিটলার নরকে গেছে। কিন্তু যাবার আগে আমাদের সঙ্গে শঠতা করে ইঙ্গ-মার্কিন সেনাকে ডেকে এনে আধখানা জার্মানি ধরিয়ে দিয়ে গেছে। ওরাও জয়ের অংশীদার। কী অন্যায়।"

বৌদি কোনোমতে হাসি চেপে তাকে উপরে নিয়ে যান। তার সঙ্গের লোকটাকে নীচের তলায় দিয়ে যান চাকরদের জিম্মা। তাদেরই একজন উপরে নিয়ে যায় মিষ্টি আর মাছ।

উপহার দেখে স্বপনদা তো হতবাক্‌। ইম্পিতে প্রশ্ন করেন, কেন?

"আজ হামারা ঈদ হ্যায়। আজ আমাদের বিজয়া দশমী। আমরা মহিষাসুরকে পরাস্ত করেছি। মহিষাসুর শুধু পরাস্ত নয়, নিহত। শুনছি স্বহস্তে নিহত, কিন্তু সেটা বোধহয় মার্কিন অপপ্রচার। সত্য বোধহয় এই যে সোভিয়েট বোমারু ওর গুহা তাক করে বোমা বর্ষণ করেছিল। অব্যর্থ লক্ষ্য। তবে ওর লাশ দাখিল করে প্রমাণ করতে পারা যাচ্ছে না যে বোমার ঘায়েই মৃত। ও তো কম ফন্দিবাজ নয়। ইতিহাসের জন্যে একটা ধাঁধা রেখে দিয়ে গেছে। জীবিত না মৃত। মৃত হলে কার হাতে নিহত।" বাবলী বকবক করে যায়।

স্বপনদা ধরা গলায় বলেন, "দ্যাখ, চকোলেট, কেউ মারা গেলে তার সম্বন্ধে দুটো ভালো কথা বলতে হয়, আপাতত মন্দ কথা বলতে নেই। এটাই সভ্য সমাজের রীতি। হিটলার এখন সব নিন্দাপ্রশংসার ঊর্ধ্বে। তিনি তাঁর ভূমিকায় অভিনয় করে গেছেন, সেটা একটা ঐতিহাসিক নাটকের অঙ্গ। ভাবীকালের উপরে ছেড়ে দাও সেই ভূমিকার বিচারভার। আমি আজ বিচার করব না, শুধু বলব হিটলার জার্মানিকে প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্ত করে জার্মানদের হৃদয় জয় করেছিলেন। কমিউনিস্ট বিপ্লবের ভয় থেকেও ত্রাণ করেছিলেন তিনি। এর জন্যেও জার্মানরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। ব্যাস্‌, এই পর্যন্ত। এর পরের অধ্যায়টা সম্বন্ধে আমি মৌন।"

"কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ, তবে আরো ঠিক হত যদি বলতে কমিউনিস্ট বিপ্লবের ভয় থেকে বুর্জোয়াদের ত্রাণ করেছিল। কিন্তু নীট ফল কী হল? আধখানা জার্মানি তার। তবে সবটা নয়, এই যা আফসোস। বর্বর, বনমানুষ, পাষণ্ড, পাপিষ্ঠ, পিশাচ, রাক্ষস, শয়তান হিটলার নরকে গেছে। কিন্তু যাবার আগে আমাদের সঙ্গে শঠতা করে ইঙ্গ-মার্কিন সেনাকে ডেকে এনে আধখানা জার্মানি ধরিয়ে দিয়ে গেছে। ওরাও জয়ের অংশীদার। কী অন্যায়।"

বৌদি কোনোমতে হাসি চেপে তাকে উপরে নিয়ে যান। তার সঙ্গের লোকটাকে নীচের তলায় দিয়ে যান চাকরদের জিম্মা। তাদেরই একজন উপরে নিয়ে যায় মিষ্টি আর মাছ।

উপহার দেখে স্বপনদা তো হতবাক্‌। ইম্পিতে প্রশ্ন করেন, কেন?

"আজ হামারা ঈদ হ্যায়। আজ আমাদের বিজয়া দশমী। আমরা মহিষাসুরকে পরাস্ত করেছি। মহিষাসুর শুধু পরাস্ত নয়, নিহত। শুনছি স্বহস্তে নিহত, কিন্তু সেটা বোধহয় মার্কিন অপপ্রচার। সত্য বোধহয় এই যে সোভিয়েট বোমারু ওর গুহা তাক করে বোমা বর্ষণ করেছিল। অব্যর্থ লক্ষ্য। তবে ওর লাশ দাখিল করে প্রমাণ করতে পারা যাচ্ছে না যে বোমার ঘায়েই মৃত। ও তো কম ফন্দিবাজ নয়। ইতিহাসের জন্যে একটা ধাঁধা রেখে দিয়ে গেছে। জীবিত না মৃত। মৃত হলে কার হাতে নিহত।" বাবলী বকবক করে যায়।

স্বপনদা ধরা গলায় বলেন, "দ্যাখ, চকোলেট, কেউ মারা গেলে তার সম্বন্ধে দুটো ভালো কথা বলতে হয়, আপাতত মন্দ কথা বলতে নেই। এটাই সভ্য সমাজের রীতি। হিটলার এখন সব নিন্দাপ্রশংসার ঊর্ধ্বে। তিনি তাঁর ভূমিকায় অভিনয় করে গেছেন, সেটা একটা ঐতিহাসিক নাটকের অঙ্গ। ভাবীকালের উপরে ছেড়ে দাও সেই ভূমিকার বিচারভার। আমি আজ বিচার করব না, শুধু বলব হিটলার জার্মানিকে প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্ত করে জার্মানদের হৃদয় জয় করেছিলেন। কমিউনিস্ট বিপ্লবের ভয় থেকেও ত্রাণ

নিরামিষ হে'সেল থেকে আমিষ হে'সেলও তেমনি দূরে। পুরোনো বাড়ি, পুরোনো প্রথা। জীবিকাটাও তো পুরোনো। আমি হচ্ছি দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ। না, না, প্রহ্লাদকুলের দৈত্য।" বাবলী হেসে ওঠে।

"তা তোমাকে দৈত্যের মতো দেখতে হলে তো? এত নরম মেয়ে কী করে এত ভয়ংকর কর্ম করে তার মর্ম আমি আজও বুঝতে পারি নে। ক্ষীরের ছুরি বলে একটা কথা আছে। তুমি কি সেই ক্ষীরের ছুরি? সন্ত্রাসবাদী দলে ভিড়লে কেমন করে?" বৌদি কৌতূহলী হন।

"সে অনেক কথা, বৌদি।" বাবলী অন্যমনস্ক হয়ে যায়। "আচ্ছা, একটুখানি বলি। আমি রোমান্টিক প্রেমে পড়েছিলুম। প্রেমটা দেশপ্রেমের আকার নিয়েছিল। পাগলিনী কী না করতে পারে! সে পাগলামি এতদিনে সেরে গেছে। তিনি বিয়ে-থা করে সংসারী হয়েছেন। বুর্জোয়া সংসার। দেখে শিউরে উঠি। ভাগ্যিস, বিয়ে করি নি। এ সমাজে বিয়ে করলে আর কিছু করা যায় না। আমাকে বিয়ে করবেই বা কে!" বাবলী দে'তো হাসি হাসে।

"কেন, তোমার কমরেডদের মধ্যে তেমন কেউ কি নেই? সবাই কি চিরকুমার থাকতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।" বৌদি প্রশ্ন করেন।

"না, সবাই নন। তাই যদি হত আমাদের কমিউন ভেঙে যেত না। গেল যত না সরকারি নেকনজরে তার চেয়ে বেশি নিজেদেরই ঘরসংসার করার বাসনায়। মেয়েদের দুর্বলতা কোথায়, জান তো? ওরা বয়স থাকতে মা হতে চায়। এ সমাজে বিয়ে না করে মা হওয়া যায় না। দেশসুদ্ধ লোক কমিউনিস্ট হলেও এ সংস্কার কাটিয়ে উঠবে বলে মনে হয় না। কমিউনিস্ট কন্যারাও বিয়ের জন্যে আপস করবে। বরপণ দিয়ে বিয়ে করবে। যদি না এক সর্বশক্তিমান ডিকটেটর চরম দণ্ড দিয়ে ওসব বন্ধ করেন। আর, সব শিশুকে বৈধ বলে গণ্য করেন। আমাদের হবু ডিকটেটররা বোনের বা মেয়ের বিয়ের সময় সমাজের কাছে কে'চো। তবে বলা যায় না, বিপ্লবের পরে নতুন হাওয়া বইতেও পারে। আগে তো মেয়েদের প্রত্যেককে জীবিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত করি। এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত যে বিয়ে না করে মা হলে কারো জীবিকা যাবে না। সন্তানের জন্যেও সুব্যবস্থা হবে। তখন ছেলেরাই ছুটবে কন্যাপণ দিয়ে বিয়ে করতে।" বাবলী স্বপ্ন দেখে।

"এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে।" বৌদি ভরসা দেন। "তখন তোমাকেও আমরা পাত্রস্থ করব বাবলী।"

"ততদিনে আমার মা হবার বয়স পেরিয়ে গিয়ে থাকবে, বৌদি।" বাবলী বলে।

স্বপনদা ও প্রসঙ্গ থামিয়ে দিয়ে বলেন, "মরার আগে হিটলার তাঁর দুই মহাশত্রুকেও মরণের মুখে ঠেলে দিয়ে গেছেন। কান ধরাধরি করে বসে থাকুক ওরা ইউরোপের মধ্যিখানে যতদিন পারে। কিন্তু একচুল এদিক ওদিক হলেই বেধে যাবে মহামারী। এটা একটা আন্‌স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম। ইতিহাসে আর কখনো এমনটি দেখা যায় নি। এর থেকে বোঝা যায় হিটলার লোকটা কত বড়ো চালবাজ। এটা কার জিত? হিটলারের না স্টালিন, চার্চিল, ট্রুম্যানের? এর উত্তর তোমরা এই মুহূর্তে পাবে না। পাবে ত্রিশ চল্লিশ কি পঞ্চাশ বছর বাদে। যখন দেখবে তোমরা ওখানে বসে আছ স্বেচ্ছায় নয়, হিটলারের ইচ্ছায়। হিটলার নেই, তার ভূত আছে। সে ভূত পেছন থেকে ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করছে। তোমাদের ফ্রী উইল একটা মায়া। তোমাদের প্রত্যেকটি পলিসি আগে থেকে ডিটারমিনড্‌। তখন বুঝবে যে গায়ের জোরে জেতাটাই জিত নয়। সত্যিকার জিত হচ্ছে যুদ্ধজয়ের পর শান্তিজয়। ভিক্‌ট্রি সেলিব্রেশনের দিন আসবে সেইদিনই যেদিন শান্তি স্থাপিত হবে। সে শান্তি মার্কিন সৈন্যদের ফেরত পাঠাবে আমেরিকায়, রুশ সৈন্যদের রাশিয়ায়। ব্রিটিশ সৈন্যদের ব্রিটেনে। ইউরোপের সব কটা রাষ্ট্রকে সংযুক্ত করে ইউনাইটেড স্টেটস অব ইউরোপ পত্তন করবে। রাশিয়া বাদে। তার আলাদা একটা ইউনিয়ন। সংযুক্ত ইউরোপ ধনতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র-উভয়ের একটা সমন্বয় খুঁজে বার করবে। গণতন্ত্রই হবে মূলভিত্তি। কিন্তু নামকা ওয়াস্তে গণতন্ত্র নয়। বিশের দশকে আমরা যারা ইউরোপে বাস করেছি এই স্বপ্নই ছিল তাদের জীবনের স্বপ্ন। ত্রিশের দশকে ঘোরতর স্বপ্নভঙ্গ। চল্লিশের দশকে সেই ভাঙা স্বপন জোড়া লাগবে বলে মনে হয় না। তবে একটা সুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ইউনাইটেড নেশনস বলে একটা সংস্থা গড়ে

উঠছে। লীগ অব নেশনস আমাদের বড়ো আশা দিয়েছিল। পরে হতাশ করে। ইউনাইটেড নেশনস যদি তারই অনুসরণ করে তবে আশা না রাখাই ভালো।"

বৌদি বাবলীর দিকে চেয়ে রগ্ড় করেন। "বিয়ে করলে বরের কাছে এইরকম লেকচার শুনতে হবে। শুনতে শুনতে একরকম ইমিউনিটি জন্মাবে। এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যাবে। উনি এইখানে বসেই ইউরোপের ভাগ্য নির্ণয় করছেন। সে মহাদেশে আমিও কিছুদিন বাস করেছি। একদা ওদের মিলনের সূত্র ছিল এক খ্রীস্ট, এক খ্রীস্টধর্ম, এক খ্রীস্টীয় সংঘ। রাষ্ট্র অনুসরণ করবে সংঘকে। সম্রাট অনুসরণ করবেন সংঘগুরুকে। কিন্তু স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের হাজারো গরমিল। ইউরোপ খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় প্রথমে ধর্মের নামে, পরে ভাষার নামে। এখন হতে যাচ্ছে মতবাদের নামে বা সমাজবিন্যাসের নামে। সংযুক্ত ইউরোপ একটা কথার কথা। রোমান এম্পায়ার, হোলি রোমান এম্পায়ার, নেপোলিয়নের এম্পায়ার, হিটলারের বর্ণচোরা এম্পায়ার, কোনোটাই টেকে নি। স্টালিনের যদি তেমন কোনো পরিকল্পনা থাকে সেটাও ব্যর্থ হবে। রাশিয়া ঠিক ইউরোপ নয়। ইউরেশিয়া—"

বাবলী বাধা দিয়ে বলে, "আমরা আর জায়গা বাড়াতে চাই নে। আমরা পশ্চিম জার্মানির বা পশ্চিম ইউরোপের মাটি মাড়াব না। আমেরিকার ছায়া মাড়াব না। মহামতি স্টালিন প্রত্যেকটি চুক্তি মানা করবেন। আমাদের জপমন্ত্র ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।" শুনে সবাই হেসে খুন। এল্‌ফ পর্যন্ত।

এর পরে ওঠে জুলির প্রসঙ্গ। স্বপনদা বলেন, "শুনছি ক্যারামেল নাকি ছাড়া পেয়েছে। কই, আসে না তো?"

"আসবে কী করে? ওর মা যে ওকে নজরবন্দী করে রেখেছেন। সেই শর্তেই ওকে ছাড়া দেওয়া হয়েছে। ছাড়া দেবার প্রধান কারণ ওর মাথার একটা ইস্ক্রুপ ঢিলে হয়েছে।" বাবলী যতদূর জানে।

"বলো কী! মাথা খারাপ হয়েছে!" স্বপনদা শিউরে ওঠেন।

"মাথা ওর কবে ভালো ছিল? তবে খারাপও ছিল না। একবার যেতে হবে ওকে দেখতে। না, সেটাও নিষেধ?" বৌদি সুধান।

"না, না, সেটা নিষেধ নয়। আমি একদিন দেখা করে এসেছি। বলেছি, যা হবার তা হয়ে গেছে। মাফ করিস্, ভাই। জুলি তা শুনে খুশি হয়েছে। আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছে, জানিস না বোধহয়, আমি এখন এন্‌গেজ্‌ড। যার সঙ্গে এন্‌গেজ্‌ড সে এখন জেলে। আমি ওকে বলেছি যে যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে, সরকার এবার কংগ্রেসওয়ালাদের ছেড়ে দিয়ে মিটমাটের কথাবার্তা চালাবে। তা শুনে জুলির সে কী রাগ! তখনি টের পাই যে ওর মাথার ইস্ক্রুপ আলগা। বলে, নিজের মা যদি শত্রু হয় তবে মানুষ কী করতে পারে! বেশ তো ছিলুম আমি জেলে। সবাই আমাকে তোয়াজ করত। সাহেবরা পর্যন্ত। গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পরে ওদের মধ্যে একটা পিছু-টান এসেছিল, কিন্তু আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন করে নেতাজী সুভাষ আসছেন শুনে ওদের চাপা উল্লাস। আমাকে দিনে দশবার প্রশ্ন করে, আর কত দেরি? আমি কেমন করে বলব কত দেরি? মনটা খারাপ হয়ে গেল শুনে যে ইম্ফল অবধি এসে ওঁরা ফিরে যান। কিন্তু ফিরে যাওয়া মানে তো বরাবরের জন্যে ফিরে যাওয়া নয়। আরো ভালো করে তৈরি হয়ে আবার এগিয়ে আসতেও তো পারেন। আমি ঠিক জানতুম যে নেতাজী রবার্ট ব্রুসের মতো বার বার ষ্টাই করবেন। শেষে একদিন সফল হবেন। সেটা হবে দেশব্যাপী বিপ্লবের সিগনাল। বিপ্লবী জনতা এসে ইংরেজদের তৈরি এই বাস্তিল দুর্গ ভেঙে আমাকে উদ্ধার করবে। আমি হাঁক দেব, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। অমনি ওরাও প্রতিধ্বনি করবে, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। আহা, সে কী উন্মাদনা! সে কী উন্দীপনা। সে কী গৌরব! সে কী গর্ব! আমি বাংলাদেশের জোন অব্ আর্ক। আমার নিজের মা আমাকে অসময়ে জেল থেকে বার করে এনে এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেছে। সরকার থেকে নাকি জানিয়েছিল যে আমার মাথার ঠিক নেই। কী করে ঠিক থাকবে শুনি? ইম্ফল থেকে নেতাজী ফিরে গেলে কি মাথার ঠিক থাকে? লেনিন যদি পেট্রোগ্রাড থেকে ফিনল্যান্ডে ফিরে যেতেন তো মাথার ঠিক থাকত? অবশ্য তুই তখন শিশু। আমার মা আমাকে চোখে চোখে রেখেছে। বেরোতে দিচ্ছে না। তবে বেশি দিন নয়। বিপ্লবী জনতা একদিন বাস্তিল ভাঙার পর এ বাড়ির সদর দরজাও ভাঙবে। আমাকে নিয়ে মিছিলে বেরোবে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। জুলির মুখে এইসব শুনে আমি তো একেবারে থ। ও যে কোন মুর্খের স্বর্গে বাস করছে তা ও নিজেই জানে না।" বাবলী দুঃখ করে।

"কাঁদিয়ে ছাড়লে! আমাকে কাঁদিয়ে ছাড়লে!" স্বপনদা আবার চোখে রুমাল দেন। এবার ক্যারামেলের জন্যে কান্না।

"সত্যি, কান্না পাবার মতো ব্যাপার!" বৌদিরও দৃষ্টি সজল।

"বিবাহ!" স্বপনদা বিধান দেন, "এই ব্যাধির এক-মাত্র ভেষজ বিবাহ। ক্যারামেলের বরকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। হিটলার হেরেছে, মুসোলিনি হেরেছে, তোজো আর কন্দিন! বাধছে তো ওই বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ নিয়ে। সেইজন্যে যুদ্ধশেষের বিলম্ব হচ্ছে। তার আগে কি ওরা কংগ্রেসওয়ালাদের ছাড়বে? অসম্ভব নয়। জাপানি আক্রমণের সম্ভাবনা নেই। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের দম ফুরিয়ে গেছে। একবার জাপানিদের সঙ্গে লড়ে আর একবার ইংরেজদের অনু-গত জওয়ানদের সঙ্গে লড়ে ওরা ক্লান্ত। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বই যথেষ্ট নয়। দম। দম যদি না থাকে তবে খেল্ খতম। আমার মনে হয় কংগ্রেস নেতাদের কারা-মুক্তি আসন্ন। ওঁরা বেরিয়ে এলে ওঁদের দলবলকেও বার করে আনবেন।"

সত্যই জাপানের পরাজয়ের জন্যে অপেক্ষা না করে সরকার কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দেয়। কথাবার্তা যাতে সুগম হয় তার জন্যে কংগ্রেসকর্মীদেরও দফায় দফায় খালাস করা হয়। সৌম্যকে যেদিন ছাড়ে তার আগেই জাপানে পরমাণু বোমা পড়েছে এবং জাপান বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করেছে।

জুলি তো হাতে স্বর্গ পায়। তার মন খারাপ থেকেই মাথা খারাপ। মন এখন ভালো, তাই মাথা এখন ভালো। তবু তার আক্ষেপ, "কোথায় সেই জনতা যে আমাকে বাস্তিল ভেঙে উদ্ধার করত আর আওয়াজ তুলত, ইনকিলাব জিন্দাবাদ? ওরা বোধহয় অপেক্ষা করছে কবে বাবলীরা ডাক দেবে। আমরা ন্যাশনালিস্টরা শ্রান্ত ক্লান্ত। ওরা কমিউনিস্টরা তরতাজা। জোয়ার এলে ওরাই তার সুযোগ নেবে।"

সৌম্য তাকে সান্ত্বনা দেয়। "আমাদের পক্ষে যা করা সম্ভব আমরা তা করেছি। ফাঁকি দিই নি। ফলাফল আমাদের হাতে নয়। ভগবানের হাতে। ভগবান না মানলে ইতিহাসের হাতে। জনগণ যদি আমাদেরকেই বেশি বিশ্বাস করে তো আমাদের আগে আর কেউ কিছু করতে পারবে না। যদি ওদেরকেই বেশি বিশ্বাস করে তবে ওরাই আমাদের আগে স্বাধীনতা আনবে, বিপ্লব ঘটাবে। এতে আফসোসের কী আছে? দেশের মুক্তি, দেশের জনগণের মুক্তিই তো আসল। আমরা নিমিত্তমাত্র। ওরাও তাই। মুক্তি যতদিন না আসে তত-দিন আমাদের কর্তব্য আমরা করে যাব। যার যেমন নীতি। আমি নীতি পরিবর্তন করব না। সত্য আর অহিংসাতেই অবিচল থাকব। বছর তিনেক আগে যেসব ভুলভ্রান্তি ঘটেছে তার সংশোধন করতে হবে। এই দুই বছর আমি তাই নিয়ে খুব ভেবেছি। বাপুকে আমরা পুরোপুরি মান্য করি নি। সরকারকে অমান্য করতে গিয়ে তাঁকেও কতকটা অমান্য করেছি। এই ডবল অমান্য কখনো ফলপ্রসূ হতে পারে না। তা হলেও আমাদের সান্ত্বনা আমরা নিষ্ক্রিয় বসে থাকি নি। দেখা যাক্ দেশ কোনটা বেশি পছন্দ করে। আমাদের সক্রিয়তা না বাবলীদের নিষ্ক্রিয়তা।"

দেশের মুক্তি, দেশের জনগণের মুক্তি অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু নারীর রূপযৌবন অপেক্ষা করতে পারে না। একদা মহাত্মার আশ্রবাণী ছিল 'এডুকেশন ক্যান ওয়েট, স্বরাজ ক্যান নট'। সৌম্য কি সেটা মান্য করবে, না অমান্য করবে? জুলির মা প্রসঙ্গটা পাড়লে সে বলে, "একবার বাপুর সঙ্গে কথা বলে আসি। দেখি তিনি কী বলেন। ইতিমধ্যে একবার আশ্রমেও ঘুরে আসতে হবে। দেখি সেটা কী অবস্থায় আছে। জুলি কি পারবে সেখানে তিষ্ঠতে? আশ্রম ছেড়ে আমিই বা যাই কোথায়? বিহারের গণ্ডগ্রামে? জুলি কি পালিয়ে আসবে না?"

জুলি মুখ খুলতে যাচ্ছিল, ওর মা কথা কেড়ে নেন। "তা জুলিও তো সফ্‌ট নয়। কতরকম দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে সাঁজন্‌ড। তোমার দুঃসহ তপস্যায় ও তোমার সাথী হবে।"

এই স্থির হল যে গান্ধীজী অনুমতি দিলে বিয়ে একটি শুভদিন দেখে হবে। তা সে হিন্দু, ব্রাহ্ম,

সিভিল যে মতেই হোক। জুলি তা শুনে কাঁদতে বসে। আনন্দের কান্না। ওর মা সৌম্যকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলেন, "জুলি তোমার গলগ্রহ হবে না। ওর বাবা ওর জন্যে যথেষ্ট রেখে গেছেন। ওর মাও তো কিছু দেবে। তবে, হ্যাঁ, ওর শ্বশুরে ওর মাসোহারা বন্ধ করবেন। বিয়ের পর তো জুলি ওঁর ছেলের বৌ থাকবে না। মাসোহারার টাকা জুলি নিজের জন্যে খরচ করত না। ওটা ওর রাজনৈতিক কার্যকলাপে লাগত। ওটা বন্ধ হলে ওর রাজনৈতিক কার্যকলাপও বন্ধ হবে। আপদ যাবে। ও মেয়ে রাজনীতির জন্যে নয়। ঘর-সংসারের জন্যে। তুমি দেখবে ওর ভোল ফিরে যাবে।"

"এই তো আমি চাই। ওর ভোল ফিরলেই আমি খুশি হব। রাজনীতি ওর স্বভাববিরুদ্ধ। সঙ্গদোষে ও সন্ত্রাসবাদী হয়েছিল। পরে হয়েছে বিপ্লবী নায়িকা। এটা ওর সত্যিকার ভূমিকা নয়। কিন্তু, মাসিমা, বিয়ে করলেও যে আমরা গৃহী হতে পারব তা নয়। সুদিনের জন্যে সবুর করতে হবে। কে জানে, আমাকে হয়তো শহীদ হতে হবে।" সৌম্য ভাবী শাশুড়ীকে একটা চমক দেয়।

"না, না। ওটা ভাবা যায় না। না, না। ওটা মুখে আনা যায় না। জুলিকে কক্ষনো জানতে দিয়ো না। ও মারা যাবে। আমিও।" তিনি কম্পমান।

স্বপনদা আর বৌদি আসেন দেখা করতে। বিয়ের কথাবার্তা চলছে শুনে স্বপনদা বলেন, "শুভস্য শীঘ্রম্। মহাত্মার অনুমতির কী দরকার? নিজের ছেলের বিয়ের বেলা তো অমন কোনো শর্ত নির্দেশ করেননি যে আগে স্বরাজ তারপরে বিয়ে। দেবদাস যা পারে সৌম্যও তা পারে।"

বৌদি বলেন, "এই হল ব্যারিস্টারের যুক্তি। কিন্তু গান্ধীজী আইন অমান্য করতে করতে আইনকানুন সব ভুলে গেছেন। ওঁর কাছে ব্রতটাই বড়ো। দেবদাসের বোধহয় তেমন কোনো ব্রত ছিল না। যেমন সৌম্যর।"

এর পরে কথাবার্তার মোড় ঘোরে। স্বপনদা বলেন, "তোমাদের যুদ্ধবিরোধী- আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, সৌম্য। যুদ্ধ থেমেছে তোমাদের আন্দোলনের ফলে নয়, পরমাণু বোমা ব্যবহারের ফলে। আমি তো নিন্দাবাদের ভাষা খুঁজে পাই নে। ছি ছি এ যে চূড়ান্ত অমানবিকতা! হিউমানিজমের যুগ যে শেষ হয়ে গেল! এ কোন্ যুগে আমরা পৌঁছলুম! অহিংসার নাম তো কেউ মুখেও আনতে চায় না। যেমন বিদেশে তেমনি এদেশে। একে তো পরমাণুর আঘাতে আমি শয্যাশায়ী, তার উপরে এ কী অবিশ্বাস্য সংবাদ! এটা কি সত্যি?"

"কোন্ সংবাদের কথা বলছেন, স্বপনদা?" সৌম্য হকচকিয়ে যায়।

"আমার সহপাঠী সুভাষ নাকি প্লেন অ্যাকসিডেনটে মারা গেছে! তাইপে জায়গাটা কোথায়? গেলই বা কেন সেখানে?" স্বপনদার কণ্ঠরোধ হয়।

জুলি চিৎকার করে ওঠে, "সব ঝুটে হ্যায়। ব্রিটিশ প্রোপাগান্ডা।"

ওর মা ওকে টেনে নিয়ে যান শোবার ঘরে। সেখানে ও পাগলের মতো চেঁচামেচি করে। বৌদিও পিছু পিছু যান ওকে শান্ত করতে।

সৌম্য দারুমূর্তির মতো নির্বাক। স্বপনদা ওর হাতে হাত রাখেন। চাপ দেন।

দুই

স্বপনদা ও দীপিকাদি জুলির খোঁজ নিতেই এসেছেন। জুলির সঙ্গেই গল্প করতে চান, তাই ওর মা ওকে ঠাণ্ডা করে ফিরিয়ে আনেন। তাঁর ভাবী জামাতাকে অন্য ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেন, "শুনলে তো ওর কথা? কেউ যদি বলে পাগল তা হলে কি ভুল বলবে? গভর্নমেন্ট ওর দায়িত্ব নিতে নারাজ। আমার ঘাড়ে চাপিয়েছে। আমি ওকে দিনরাত পাহারা দিচ্ছি। পাছে ওর রাজনৈতিক গোষ্ঠীর পাল্লায় পড়ে। তুমি এসেছ। খুব ভালো হয়েছে। পৃথিবীতে একটিমাত্র পুরুষ আছে যে ওকে সুখী করতে পারে। সুখী হলেই ওর পাগলামি সেরে যাবে। আশ্রমে বা সেবাগ্রামে না গিয়ে তুমি এখানেই কিছুদিন থেকে যাও। রোজ ওকে নিয়ে বেড়াতে বেরোবে। কখনো স্টীমারে করে। কখনো মোটরে করে। কখনো ট্রেনে করে। সারাদিন বাইরে কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরবে। দুপুরের খাবার টিফিন ক্যারিয়ারে সাজিয়ে দেব। আমার তো মনে হয় তোমার সঙ্গ পেয়েই ওর মতিগতি বদলাবে। তুমি যেদিন বলবে আমি সেইদিন ওর বিয়ে দেব। যে মতে বলবে সেই মতে। ইতিমধ্যে যদি মহাত্মার অনুমতি

নিতে হয় তো চিঠি লিখতে পার। সশরীরে সেবাগ্রামে যেতে হবে কেন?"

সৌম্য এর উত্তরে বলে, "বিয়ে করলে আমার মন পড়ে থাকবে স্ত্রীর কাছে, পরে ছেলেমেয়ের কাছে। অন্তত আধখানা মন তো পড়ে থাকবেই। সংগ্রামের সময় এগিয়ে যাব কী করে? সত্যাগ্রহীর পক্ষে এটা একটা গুরুতর সিদ্ধান্ত। যিনি সত্যাগ্রহীদের সেনাপতি তিনি যদি নিকট ভবিষ্যতে সত্যাগ্রহের জন্যে আমাকে চান তা হলে বিয়ে পেছিয়ে দিতেই হবে। যদি তার দেরি থাকে তা হলে হয়তো তাঁর অমত হবে না। বিয়ে আমি করবই। কথা যখন দিয়েছি তখন কথার নড়চড় হবে না। জুলি যদি রাজি হয় তো ওকেও আমি বাপুর কাছে নিয়ে যেতে পারি। তাতে সুফল হতে পারে।"

"কোথায় উঠবে ওখানে?" মিসেস সিন্‌হা জানতে চান।

"আমি যেখানে উঠি। সোনাদির কুটীরে। কেশবন তাঁর স্বামী। দুজনেই বিলেতফেরত। গান্ধীজীর গঠন-কর্মে যোগ দিয়েছেন। স্বরাজের রূপরেখা তৈরি করছেন। আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন।" সৌম্য জানায়।

"আচ্ছা, ভেবে দেখি। আমাকে দু-তিন সপ্তাহ ভাবতে দাও। ইতিমধ্যে তোমার সঙ্গগুণে জুলির অবস্থার রূপান্তর দেখি। ও মেয়ে যদি অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে যায় তা হলে তার মুখের উপর কী যে বলে বসবে কে জানে! হয়তো বলবে, আপনার নেতৃত্বে পূর্ণ স্বাধীনতা পাঁচ বছর পরেও হবে না। কেন আমি পাঁচ বছর অপেক্ষা করব?" জুলির মা আন্দাজে বলেন।

"ঠিকই বলেছেন, মাসিমা। পূর্ণ স্বাধীনতা পাঁচ বছর পরেও হয় কি না সন্দেহ। আমাদের বিচারে পূর্ণ স্বাধীনতা হচ্ছে যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ার স্বাধীনতা। তৃতীয় মহাযুদ্ধ বেধে যাবে, জানি নে। কিন্তু যদি বাধে তবে আমরা ওর মধ্যে নেই। আমরা নিরপেক্ষ। ব্রিটেন কি আমাদের এই স্বাধীনতা দেবে? এর চেয়ে কম নিয়ে আমরা কী করব? ব্রিটেনের জুনিয়র পার্টনার হব? গান্ধী থাকতে তা সম্ভব নয়। আমি থাকতেও সম্ভব নয়। আমাকে শহীদ হতেই হবে। জুলির যখন শোনবার মতো অবস্থা হবে তখন একথা ওকে আমি বলব। ওর যদি আপত্তি থাকে আমাকে বিয়ে না করাই ভালো। বাগ্‌দানের বাধ্যবাধকতা থেকে ওকে আমি রেহাই দেব। ও হয়তো আর কাউকে বিয়ে করে সুখী হবে।" সৌম্য বলে দুঃখের সঙ্গে।

"তুমিও দেখছি আরেক পাগল! আবার এক মহাযুদ্ধ! আবার ভারতকে জড়ানো! আবার তার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ! কিন্তু, বাছা, সেটা তো পাঁচশ বছরের আগে নয়। ততদিনে তোমার বয়স হয়ে থাকবে আটষট্টি, জুলির ষাট। বিয়ে করে থাকলে তোমাদের ছেলেমেয়ে হয়ে থাকবে। তারা বিয়ে করে থাকলে তাদেরও ছেলে-মেয়ে। সত্তর বছর বয়সে যদি কেউ শহীদ হয়—না হলেই ভালো—তবে এখন থেকেই ভয় পাইয়ে দেবার মতো কিছু নয়। জুলি আপত্তি করবে সেটা ঠিক, কিন্তু তাই বলে তোমাকে ছেড়ে অন্য একজনকে বরণ করবে না। এখন থেকে এসব সম্ভাবনার কথা তুলে বিয়েটাকে কেঁচে যেতে দিয়ো না। তা হলে ও মেয়ে আর কোনোদিন প্রকৃতিস্থ হবে না। ফরাসী বিপ্লব আর রুশ বিপ্লবের সঙ্গে সিপাই বিদ্রোহের ঘোঁট পাকিয়ে কী এক আজব তত্ত্ব বানিয়েছে ওর রাজনৈতিক গোষ্ঠী। আমি তো তার মাথামুণ্ডু বুঝি নে। জুলির যে মাথা খারাপ হবে এর আশ্চর্য কী! তুমি যদি ওকে সেবাগ্রামে নিয়ে গিয়ে তোমার সোনাদির কাছে শিক্ষা-নবীশ করতে পারতে তাহলে আমার আপত্তি কী ছিল? কিন্তু আমার একমাত্র শর্ত বিয়েটা তার আগে হওয়া চাই। মেয়েদের জীবনে বিয়ে একটা আমূল পরিবর্তন আনে। মাতৃত্ব আনে আরো গভীর পরি-বর্তন। এসব অভিজ্ঞতার পরে তুমি ওকে যা করতে বলবে ও তাই করবে। স্বেচ্ছায় ও সানন্দে তোমার কন্তুরবা হবে। আমার মেয়েকে আমি ভালো করেই চিনি। তুমি আর গড়িমসি না করে ওকে একটা চান্স দাও। তোমাকে তো ও বেঁধে রাখছে না। তুমি যদি নিজেকে দায়গ্রস্ত মনে কর তা হলে ওকে আমার কাছে থাকতে দিয়ো। আমি ওকে রাজনীতি করতে দেব না। সেবাকর্ম করতে দেব। আমার নার্সারি স্কুলের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে থাকবে। যতদিন না ওর নিজের ছেলে-মেয়ে হয়।" জুলির মা প্রাণ খুলে বলেন।

"ও নিজেই সেটা পছন্দ করবে না, মাসিমা। ও

আমার সঙ্গেই থাকতে চায়। সুখে দুঃখে আমার সাথী হতে চায়। মনে করুন আমি একজন সরকারি কর্মচারী। পূর্ববঙ্গই আমার কর্মস্থল। আমার স্ত্রী আমার কর্মস্থলেই বাস করবে। সেবাকর্ম যদি করতে চায় সেইখানেই করবে। যেমন করছে আমার বন্ধু মানসের বৌ যূথিকা। জুলির বন্ধু মিলিকে আপনার মনে আছে নিশ্চয়। মিলি চলে গেছে ওর বরের সঙ্গে বিলেতে। ইংরেজদের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনে ওর বেশ বনিবনা। জাতিগত জীবনে সংঘর্ষ। সুকুমারের সঙ্গে বিয়ে হলে জুলিরও একই বরাত হত। আমার সঙ্গে বিয়ে হলে আরেক রকম বরাত হবে। দেশ স্বাধীন হলেও আমার কাজ ফুরিয়ে যাবে না। নিচের থেকে ধাপে ধাপে অথরিটি গড়ে তুলতে হবে। উপরে উপরে ক্ষমতা হস্তান্তর আমার আদর্শ নয়। উপরে উপরে ক্ষমতা ক্যাপচার তো আমার আদর্শ নয়ই। জুলির সঙ্গে আমার আদর্শের অমিল আগেও ছিল, পরেও থাকবে। যেমন সুকুমারের সঙ্গে মিলির অমিল। সুকুমার লিখেছে লেবার পার্টি নির্বাচনে জিতে নিরঙ্কুশ হয়েছে। ইন্ডিয়াকে ওরা কানাডার মতো ডোমিনিয়ন স্টেটাস দিতে প্রস্তুত, শুধু ভারতীয় নেতাদের একমত হতে হবে। ওরা খুব শীগগির দেশে ফিরছে। সুকুমার আর মিলি। ইংলন্ডের সঙ্গে সেতুবন্ধনের চেষ্টা করবে। মিলি ততটা নয়, সুকুমার যতটা। কংগ্রেস নেতাদের হাত করতে বড়লাট ওয়েভেল সক্রিয়। তবে গান্ধীজীকে ভোলানো অত সহজ নয়। ভবী ভোলে না।” সৌম্য হাসে।

“মিঞা বিবি রাজী, কী করবে কাজী? ইঙ্গ বঙ্গ রাজী, কী করবে গান্ধী? লেবার পার্টি হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, কংগ্রেস পার্টিও হাত বাড়িয়ে দেবে। তারপরে দুপক্ষের হ্যান্ডশেক। অ্যামিকেবল সেটলমেন্ট। জেলযাত্রা ঢের হয়েছে। আর নয়। মানুষের ত্যাগশক্তিরও একটা সীমা আছে। সবাই তো আর মহাত্মা নয়। বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জবাহরলাল—এঁরা পঁচিশ বছর ধরে জেলে যাচ্ছেন আর আসছেন। এঁরা আর কদিন বাঁচবেন? মিটমাটের এই তো সময়। গান্ধীজী যদি এঁদের উপর দরাদরির ভার ছেড়ে দেন এঁরা দেশকে বিকিয়ে দেবেন না। অন্তত এইটুকু বিশ্বাস এঁদের উপর থাকা উচিত। অন্যান্য দেশের পলিটিসিয়ানদের সঙ্গে তুলনায় এঁরা কেউ নিরেস নন। এঁরাও সমান যান। হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন এখন না তোলাই ভালো। গভর্নমেন্ট চালাতে হলে কিছুটা ভায়োলেন্স তো দরকার হবেই। সেই ভয়ে যদি কংগ্রেস গভর্নমেন্টের দায়িত্ব না নেয় তো ইংরেজই থেকে যাবে। কংগ্রেসকে বাস্তববাদী হতে হবে। আদর্শবাদ নিয়ে গান্ধী থাকতে চান থাকুন। তুমিও তাঁর সঙ্গে। জুলিও তোমার সঙ্গে। আমি কিন্তু বাস্তববাদী। তাই সুকুমারের প্রচেষ্টার সমর্থন করি। কবে আসছে ওরা?” তিনি জিজ্ঞাসা করেন।

“জাহাজ পেলে নভেম্বরে। ওরা সমুদ্রপথেই আসতে চায়। সেটাই সস্তা। আরাম তাতে বেশি। বাচ্চা আছে সঙ্গে।” সৌম্য মনে করিয়ে দেয়।

জুলির মা ড্রয়িং রুমে ফিরে যেতেই স্বপনদা বলে ওঠেন, “শুভস্য শীঘ্রম্। আপনি আর দেরি না করে শাঁখ বাজিয়ে দিন। ওসব গান্ধী-টান্ধী বাজে ওজর। উনি কি পোপ আর সৌম্য কি রোমান ক্যাথলিক? জানেন তো, বিয়ের সময় রোমান ক্যাথলিকদের পোপের অনুমতি নিতে হয়। ওটা অবশ্য একটা ফর্মালিটি। বিশপরাই পোপের হয়ে অনুমতি দেন। পোপের এত সময় কোথায় যে কোটি কোটি ক্যাথলিকের বিয়ের কাগজপত্র দেখবেন? আমরা হিউমানিস্টরা পোপ-টোপ মানি নে। গান্ধীজীর আশীর্বাদ অবশ্যই চাই। কিন্তু অনুমতি? যদি না দেন? সৌম্য বাপের সুপুত্রের মতো আজ্ঞাবহ হবে। কিন্তু ক্যারামেল কেন সে অপমান সহ্য করবে?”

“কিন্তু বাপুকে যে ও বাপের মতো মানে।” জুলির মা বলেন।

“পোপ কথাটার মানেও তো বাপ্। তাঁকে বাপের মতো মানতে মানতে ক্যাথলিকরা বিবাহের মতো প্রাইভেট ব্যাপারে তাদের লিবার্টি হারিয়েছে। গান্ধীভক্ত ভারতীয় জনগণেরও সেই দশা হবে না তো? আমি বলি, সৌম্য, তুমি চোখ বুজে ঝুলে পড়ো। আমি বাপুর কাছে আপীল করে অনুমতি আনিয়ে নেব।” স্বপনদা হাসেন এবং হাসান।

সৌম্য বুঝিয়ে বলে, “ক্যাথলিকদের সঙ্গে তুলনা ঠিক নয়। গান্ধীজীর কাছে সবাই আশীর্বাদ চায়। অনুমতি চায় কেবল তারাই যারা কথা দিয়েছে যে দেশ মুক্ত না হলে বিয়ে করবে না। তখন তো জানা ছিল না, যে দেশের স্বাধীনতার এত দেরি হবে। জানলে কথা দিতুম না। দিয়েছি যখন তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করে সুধাব আমার অঙ্গীকার থেকে আমি খালাস পেতে পারি কি না। জুলি যদি আমার সহকর্মী হতে রাজী হয় বাপু খালাস দিতে রাজী হতে পারেন।”

“তার মানে ক্যারামেলকে তার স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে হবে। তুমি কি তাতে রাজি হবে, ক্যারামেল?” স্বপনদা প্রশ্ন করেন।

“ও যদি আমাকে গ্রহণ করে ওর জন্যে আমি সব কিছু বিসর্জন দিতে রাজী। স্বাতন্ত্র্য আবার কী?” জুলি আবেগের সঙ্গে বলে।

স্বপনদা তারিফ করে বলেন, “মহাত্মা চৌধুরী, এই কন্যা একদিন তোমার কস্তুরবা হবে। আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি তোমাদের দুজনেরই পায়ের ধুলো নেবার জন্যে গ্রাম গঞ্জ থেকে বুলক প্লেনে করে হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসবে। ক্যারামেল তোমার জন্যে সর্বকিছু বিসর্জন দিয়ে সীতা-সাবিত্রীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে রাজি। আর ওর বৌদিকে দেখছ তো? বিয়ের পরেও সমানে চাকরি করে যাচ্ছেন। কিছুতেই ছাড়বেন না।”

বৌদি এটা প্রত্যাশা করেন নি। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো হাসি দিয়ে রাগ চাপেন। বলেন, “এই প্রচ্ছন্ন হিটলারটির বদ্ধমূল ধারণা নারীজাতির প্রকৃত স্থান হচ্ছে রান্নাঘর, আঁতুড়ঘর আর ঠাকুরঘর। হাইকোর্টে আজকাল মহিলা ব্যারিস্টাররাও প্র্যাকটিসে নেমেছেন। তা দেখে এঁর যা আতঙ্ক। আমি অক্সফোর্ডের ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়ে নিজগুণে চাকরি পেয়েছি। নিজগুণেই চাকরি করে যাচ্ছি। এটা পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য নয়। তাই এঁর যত আক্রোশ। নারীকে ইনি স্বনাম্নী হতে দেবেন না। কিন্তু ইংলন্ডে আজকাল পুরুষরাই স্ত্রীর পদবী ধারণ করে যুক্তনামা। নতুন সেক্রেটারি অব্ স্টেট ফর ইন্ডিয়া লর্ড পেথিক লরেন্স বিয়ের আগে ছিলেন লরেন্স। মিস পেথিকের সঙ্গে বিবাহের পর হলেন পেথিক-লরেন্স।”

মিসেস সিন্‌হা স্বপনদার পক্ষ নিয়ে তর্ক করেন। “বিয়ের পরে যদি স্বামী স্ত্রী দুজনেই চাকরি বা প্র্যাকটিস করে ঘরসংসারে শ্রী থাকে না, ছেলেমেয়েরা আদরযত্ন পায় না, চাকরবাকর লুটেপুটে খায়। স্বামীও তো স্ত্রীর জন্যে ত্যাগস্বীকার করছে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করে আনছে। ত্যাগটা একতরফা নয়। কিন্তু একালের মেয়েদের দোষ দেওয়া যায় না। বেশি লেখাপড়া শেখালে বড়ো চাকরির উচ্চাভিলাষ জাগবেই। যে মেয়ে ডক্টরেট পেয়েছে সে মেয়ে বিয়ের পরে ঘরে বসে কাঁথা সেলাই করবে না, শুক্তুনি রাঁধবে না। সেইজন্যেই তো আমি জুলিকে বেশি লেখাপড়া শেখাই নি। বিয়ে দিই স্কুল শেষ করার আগেই। তার ফল হয়েছে শোচনীয়।”

স্বপনদার মাথায় ঘুরছিল হিটলার। খাপছাড়াভাবে বলেন, “হিটলারকে খাটো করার চেষ্টা বৃথা। তিনি ছিলেন জিতেন্দ্রিয় পুরুষ। ব্রহ্মচারী।”

তা শুনে হাসাহাসি পড়ে যায়। দীপিকাদি এবার তাঁর কর্তার বক্তব্য বিশদ করেন। বার্লিনের পতন আর হিটলারের নিধনসংবাদ শুনে উনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। বলেন, হেক্টরের নিধন। ট্রয়ের পতন। সেই যে উনি শয্যা নেন তার পরে চব্বিশ ঘন্টা দরজা বন্ধ। মস্কো রেডিও, বি.বি.সি. ভয়েস অব্ আমেরিকা আমি একাই শুনি। হিটলারের মৃতদেহকে কবর দেওয়া হয় নি, দাহ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে দাহ করা হয়েছে তার সঙ্গিনী এফা ব্রাউনেরও মৃতদেহ। হিটলারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পূর্বে নাকি এফার সঙ্গে আইন অনুসারে বিবাহ। তা হলে আর ব্রহ্মচর্য রইল কোথায়? কান্নাও পায়, হাসিও পায়। ওঁকে বলি নে। পাছে শক পান। কিন্তু বেশিদিন না বলেও থাকা যায় না। শুনে বলেন, যে মানুষ মাছ খায় না, মাংস খায় না, মদ খায় না, তামাক খায় না, টাকা খায় না, সে মানুষ বামাচারী হতে পারে না। ওটা প্লেটোনিক সম্পর্ক। ব্রতসিদ্ধির পর ওদের যথারীতি বিবাহ হত। পতির সঙ্গে সতী একই চিতায় আরোহণ করেছে। ব্রতসিদ্ধি হবার নয়। জয়ের আশা নির্মূল। পরাজয়ের গ্লানি অসহ্য। নাটক হিসাবে বিশুদ্ধ ট্র্যাজেডি। রজকিনীপ্রেম নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়।”

সৌম্য এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। বলে, “আমার মনে আছে এক মুসলমান ফকিরনীর কণ্ঠে শুনেছি ‘চন্ডিদাস আর রজকিনী তারাই প্রেমের শিরোমণি, এক মরণে দুজন মলো রে প্রেমপূর্ণ প্রাণে।’ হাজার বছর

পরে হিটলার আর এফা ব্রাউন সম্বন্ধেও ওদেশের লোকসংগীতে অনুরূপ পদ শোনা যাবে।"

স্বপনদা খুশি হয়ে বলেন, "লোকসংগীতের ধারা ওদেশে এখনো শুকিয়ে যায় নি। ব্যালাড সিঙ্গার এখনো নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায় আর বেহালা বা ম্যান্ডোলিন বাজিয়ে ব্যালাড শোনায়। জার্মানদের মধ্যে অশেষ বৈচিত্র্য। তবে এমন দুর্ভাগা জাতি আর নেই। অনেকটা আমাদেরই মতো। এবার তো ওরাও পরাধীন। আমরাও পরাধীন। আমরা একদিন ইংরেজের হাত থেকে মুক্ত হলেও হতে পারি, কিন্তু রুশের হাত থেকে মার্কিনের হাত থেকে জার্মানদের মুক্তি আমার দূরদৃষ্টির বাইরে। সৌম্য, তুমিও তো জার্মানি দেখে এসেছ! তোমার কী মনে হয়!"

সৌম্য একটু ভেবে নিয়ে বলে, "ভারত যদি গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে মুক্ত হয় তবে জার্মানিও ভারতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সত্যাগ্রহের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে মুক্ত হবে। সত্যাগ্রহই হচ্ছে যুদ্ধবিগ্রহের নৈতিক বিকল্প। বিদ্রোহ-বিপ্লবেরও। এটা যদি ভারতের বেলা উপযোগী হয়ে থাকে তো জার্মানির বেলাও উপযোগী। আমরা যারা ভারতের মুক্তিসংগ্রামে গান্ধীপন্থা অনুসরণ করে চলেছি তারা সারা বিশ্বের জন্যে পায়ের চিহ্ন রেখে যাচ্ছি।"

"দূর পাগলা!" স্বপনদা ফুতকারে উড়িয়ে দেন। "যারা এতকালের খ্রীস্টকে ছেড়েছে তারা একালের গান্ধীকে ধরবে? কেন ওরা নতুন করে পেগান হতে গেল এ নিয়ে কখনো ভেবে দেখেছ? আমি তো অন্ধকারে আলো খুঁজে পাচ্ছি নে। রাজনীতি-অর্থনীতির ভিতরে এর উত্তর নেই। সমাজনীতির ভিতরেও না। দর্শনের ভিতরে থাকলেও থাকতে পারে।"

প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিয়ে দীপিকাদি বলেন, "কই সৌম্য, তুমি তো বললে না জুলির জন্যে তুমি কী বিসর্জন দেবে? না বিসর্জনটা একতরফা হবে? যেমন তোমার স্বপনদার ধারণা।"

সৌম্য এর উত্তরে বলে, "আমার যা কিছু ছিল সবকিছু আমি দেশের জন্যে বিসর্জন দিয়েছি। তার মানে ট্রাস্টীদের হাতে দিয়েছি। জুলির খাতিরে ওদের একজন সরে যাবে। জুলিও একজন ট্রাস্টী হবে। গ্রামে গিয়ে বসলে খাওয়া-পরার কষ্ট হবে না। পরিশ্রম করলে স্বচ্ছন্দেও থাকা যায়। কিন্তু শহরের মায়া কাটাতে হবে। গ্রামের ধন শহরে এনে খরচা করা চলবে না।"

স্বপনদা দীপিকাদিকে মুখ খুলতে দেন না। বলেন, "আমার প্রশ্ন হল, হিটলার যদি পেগানই হবেন তা হলে মদ্য মাংস বর্জন করবেন কেন? পেগানরা তো আস্ত শুওর পুড়িয়ে খেত। এখনো ইংরেজ অভিজাতরা তাই করে। আমার মতে হিটলার ছিলেন প্রচ্ছন্ন হিন্দু, হিন্দুদের মতো তাঁর অগ্নিসংস্কার হল। হিন্দুদের মতোই তাঁর বিবাহিতা পত্নী সতী হলেন।"

বৌদি হাসতে হাসতে বলেন, "তুমি দেখছি ডেভিল্‌স্‌ অ্যাডভোকেট। আমি কিন্তু জানিয়ে রাখছি আমি সহমরণে গিয়ে সতী হব না। যদি তুমি আগে যাও। পুরুষের মতো নারীও একটি ব্যক্তি। তার জীবন তার, মরণও তার।"

সেদিন আলাপ-আলোচনার পর এই স্থির হয় যে সৌম্য যাবে সেবাগ্রামে মহাত্মার অনুমতি প্রার্থনা করতে। আগে অনুমতিলাভ। তারপরে আর সব। কবে বিয়ে, কোন্ মতে। বিয়ের পর জুলি কোথায় থাকবে। আশ্রমে, না শ্বশুরবাড়িতে, না মায়ের কাছে। অনুমতি না পেলে কিন্তু অচল অবস্থা। তখন কর্তব্য স্থির করার জন্যে আবার বৈঠক বসবে। স্বপনদা দীপিকাদি আসবেন।

এমন সময় সৌম্য এক ফ্যাসাদ বাধায়। "আমার তো বাবা নেই, বাপুই আমার বাবা। বাপের কাছে ছেলে মুখ ফুটে বলে না, বাবা, আমি বিয়ে করতে চাই। এদেশের রেওয়াজ কন্যাপক্ষের একজন মুরুব্বি গিয়ে বরকর্তার কাছে প্রস্তাবটা পাড়বেন। বর এমন ভাব দেখাবে যেন সে ভিজে বেড়ালটি। কিছুই জানে না। এক্ষেত্রে মুরুব্বি হতে হয় কনের মাকেই। কিন্তু তাঁকে সেবাগ্রামে টেনে নিয়ে যাওয়া এক প্রকার অত্যাচার। যদিও বাপু খুব খুশি হয়ে রাজি হতেন। আর দিদি তো অসুস্থ মানুষ। জুলির মুরুব্বি বলতে আমি একজনকেই দেখতে পাচ্ছি। তিনি স্বপনদা।"

স্বপনদা ফোঁস করে ওঠেন। "আমি যাব পোপের সঙ্গে অডিয়েন্স যাচ্ঞা করতে রোমে! পোপ যদি অনুমতি না দেন আমার মুখ থাকবে?"

"তা হলে, চলো, সৌম্য, আমিই তোমার মুরুব্বি

হয়ে যাই। আমার আর্জি শুনে তোমার বাপু কিছুতেই 'না' বলতে পারবেন না। বললে আমি ধরনা দেব। জুলি যদি আমার সঙ্গে যেতে রাজি থাকে তো আরো ভালো। ওর মুখ দেখলে পাষাণও গলে যায়। সারা জীবন কেবলি একটার পর একটা ধাক্কা খেয়ে আসছে। শেষ ধাক্কা নেতাজীর আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাণত্যাগ।" বৌদি সমবেদনার সঙ্গে বলেন।

"বিলকুল ঝুট হ্যায়!" জুলি জ্বলে ওঠে। "ওটা আত্মগোপনের ছলনা। মার্কিনদের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি রুশ দখলি অঞ্চলে চলে গেছেন।"

বৌদি তা শুনে বলেন, "তা হলে জুলির না যাওয়াই ভালো। আমি ওসব বিতর্কিত প্রশ্ন এড়িয়ে যাব।"

স্বপনদা ঘোরতর আপত্তি করেন। "গৃহকর্তাকে একলা ফেলে গৃহিণী কখনো ফেরার হন? আমি ফেরারি পরোয়ানা জারি করব না? ধরনা! ধরনা দেবে তুমি! আমার মাথা কাটা যাবে না! কাগজে কাগজে ঢি ঢি পড়ে যাবে না?"

জুলির মা হেসে বলেন, "স্বপন ওর বৌকে কত ভালোবাসে দেখছ তো? দেখে শেখো। একটা দিনও চোখের আড় করবে না।"

"না, মাসিমা, এর একটা প্র্যাকটিকাল কারণ আছে। রানু না থাকলে ওর কুকুর এল্‌ফকে আমি সামলাতে পারব না। তা হলে কুকুরকেও সেবাগ্রামে টেনে নিয়ে যেতে হয়। সে বেচারার উপর অত্যাচার।"

তখন এই স্থির হয় সেবাগ্রামে গিয়ে সৌম্য সোনাদিকে অনুরোধ করবে কন্যাপক্ষের মুরুব্বি হতে। সোনাদি সহায় হলে অনুমতি সহজলভ্য।

জুলি বায়না ধরে সেও সৌম্যর সঙ্গে সেবাগ্রামে যাবে। সোনাদিদের অতিথি হবে। ওর মা সেটা এককথায় খারিজ করেন। "কনের দিক থেকে ঝোলাঝুলি লজ্জাকর ব্যাপার। আমাদেরও তো মানসম্মান আছে।"

আসল কারণ পুলিশকে তিনি কথা দিয়েছেন যে জুলিকে চোখে চোখে রাখবেন। যদিও তার আর দরকার নেই, জেলগুলো খালি হয়ে গেছে। গোলমাল যা তা ওই আজাদ হিন্দ্ ফৌজের তিন প্রধানের বিচার নিয়ে। এর মধ্যে রেকর্ড বেরিয়ে গেছে, "কদম কদম বাড়ায়ে যা।" সরকারি কর্মচারীদের বাড়ির ছেলেমেয়েরাও সে রেকর্ড বাজিয়ে কুচকাওয়াজ করছে।

সোনাদিকে সৌম্য চিঠি লেখে। যতদিন না তাঁর উত্তর আসে ততদিন সে কলকাতায় থাকবে। সোদপুরে আশ্রমের কাজ সেরে জুলিকে নিয়ে বেড়াতে বেরোবে। ভাবী বরবধূ নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ায় আসবে। যদিও তাদের পরিচয় পনেরো-ষোলো বছরের তবু প্রাণ খুলে কথা বলার সুযোগ কেউ কোনোদিন পায় নি। প্রেমনিবেদন তো দূরের কথা। স্বরাজের জন্যে মুলতুবি রেখে দিয়েছে। এখন মনে হচ্ছে স্বরাজের খুব বেশি দেরি নেই। ইংরেজদের সঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে। এখন মুসলিম লীগকে নিয়েই ভাবনা।

একদিন জাহাজে গঙ্গা পার হওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা। "চিনতে পারছেন? সেই পুরনো পাপী। আপনাদের সিভিল সার্জন। ক্যাপ্টেন ল। পরে মেজর ল। শেষ সাক্ষাৎ সিঙ্গাপুর যাত্রার আগে। তার পরে প্রায় ছ বছর কেটে গেছে। এ কন্যাটি কে? মঞ্জুলিকা সিন্‌হা? সিভিল সার্জন ক্যাপ্টেন সিন্‌হার মেয়ে? ক্যাপ্টেন মুস্তাফীর মেয়ে মধুমালতীর বান্ধবী?"

সৌম্য চিনতে পারে। জুলি পারে না। ভদ্রলোক তাঁর সহযাত্রিণীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। "সিভিল সার্জন ডাক্তার ঘটকের কন্যা কৃষ্ণকলি। ঝরনা বলে জানে সকল লোক। বাপ-মায়ের অমতে ওয়াকি হয়ে যুদ্ধে যায়। যুদ্ধের শেষে দেশে ফিরে নিজের ঘরেই ঠাঁই পাচ্ছে না। ওয়াকি বলে সমাজেও একঘরে। এখন থাকে ওর বান্ধবী সবিতার ওখানে। সেও ছিল ওয়াকি। ওরা ইঙ্গবঙ্গ। তাই এমন গোঁড়া নয়। যুদ্ধকালে ইংরেজের মেয়ে যদি ওদেশে ওয়াকি হতে পারে বাঙালীর মেয়ে হবে না কেন? এরা বীরাঙ্গনা। তাই বীরপুরুষকে দেখে এক আঁচড়ে চিনতে পারে। সিঙ্গাপুরে নেতাজী আমাকে জাপানিদের বন্দিশালা থেকে উদ্ধার করে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের চিকিৎসাভার দেন। মেজরকে বানিয়ে দেন ব্রিগেডিয়ার। ফৌজের সঙ্গে সঙ্গে আমিও ফ্রন্টে গেছি। অ্যাকশন দেখেছি। জয় করে এগিয়ে এলে নেতাজী আমাকে মেজর জেনারেল বানাতেন। দুর্ভাগ্য! তাঁর ইচ্ছা ছিল আমরা আবার চেষ্টা করব। ট্রায়, ট্রায় এগেন। তিনি বলতেন, ডিফিট ইজ আ ওয়ার্ড নট ফাউন্ড ইন মাই ডিক্সনারি। জাপানিরা যে আচমকা আত্মসমর্পণ করবে এর জন্যে তিনি

প্রস্তুত ছিলেন না। কোথায় যে অন্তর্হিত হলেন কেউ সঠিক বলতে পারে না। মাঝখান থেকে আমি পড়ে যাই যাই ফাঁফরে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের চোখে আমি একজন ট্রেটর। চেনাজানা সাহেবরা সার্টিফিকেট দেন যে চিকিৎসায় আমার হাতযশ আছে বলে বিদ্রোহী ফৌজ আমাকে বন্দিশালা থেকে ধরে নিয়ে যায়। ডাক্তারের কর্তব্য হল চিকিৎসা, তা সে শত্রুরই হোক আর মিত্রেরই হোক। কাউকে তো আমি মারি নি, বরং কতকগুলি লোককে বাঁচিয়েছি। তারা দুই পক্ষের লোক। কোর্ট মার্শাল থেকে রক্ষে পেয়েছি কিন্তু চাকরিটি গেছে। র‍্যাঙ্ক কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এখন আমি কাগজে কলমে ক্যাপ্টেনও নই। চাকরি গেছে তার জন্যে দুঃখ নেই, লাহা পরিবার গরিব নয়। কিন্তু র‍্যাঙ্ক কেড়ে নিয়েছে। কী অন্যায়! আমি যাচ্ছি বিলেতে আপীল করতে। মাতাল ফিলিপের কাছ থেকে অপ্রমত্ত ফিলিপের কাছে। ব্রিটিশ জাস্টিসের উপর আমার আস্থা আছে।"

জুলি লাল হয়ে বলে, "মাফ করবেন, ব্রিটিশ জাস্টিস না ব্রিটিশ ইনজাস্টিস? আমার বাবা প্রথম মহাযুদ্ধে টার্কদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। যুদ্ধের ডেস্‌প্যাচে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু ক্যাপ্টেনের উপরে তাঁকে উঠতেই দেওয়া হয় না। কী অপরাধে, জানেন? জালিয়ানওয়ালাবাগ তিনি বরদাস্ত করেন নি। হুজুর বাহাদুরদের দুকথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। আপনি বিলেত যাচ্ছেন, যান। কিন্তু দেশ স্বাধীন হলে আপনাকে আমরা নেতাজীর বিশ্বস্ত চিকিৎসক হিসাবে সম্মানের পদ দেব না। সার্জন-জেনারেল তো নয়ই, ইন্সপেক্টর-জেনারেল অব্‌ প্রিজন্স পদও আপনার কপালে নেই। ক্ষেমা ঘেন্না করে আবার সেই সিভিল সার্জন।"

"তা বলে কি আমার জীবনের ওই সাধটা অপূর্ণ থেকে যাবে? মরার আগে একবার বিলেত দেখতে পাব না? আর এই যে বীরাঙ্গনা, এর কি এদেশে কোনো ভবিষ্যৎ আছে? তোমাদের হাতে ক্ষমতা এলে তোমরা কি একে ছেই কেই করবে না? এ মেয়ে ওয়াকি হলেও নেতাজীর পরম ভক্ত। আমি তাঁর বিশ্বস্ত সহযোগী বলে আমাকেও এ মেয়ে বীরপুরুষ বলে পুজো করে। আমার সংবর্ধনাসভা যখন যেখানে হয় তখন সেখানে হাজির হয়। সভা তো লেগেই রয়েছে। লোকে নেতাজী আর আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের খবর শুনতে লাগল। আমি ছিলুম তাঁর কাছের মানুষ। হাঁড়ির খবর জানতুম। তা বলে তো হাটে হাঁড়ি ভাঙা যায় না। তাঁর অনুমতি নিতে হবে আগে। প্রথমে জানতে হবে তিনি এখন কোথায় আত্মগোপন করে রয়েছেন। ওই যে রটেছে প্লেন দুর্ঘটনা, ওটা ডাহা মিথ্যে। কিন্তু যা বলছিলুম, এই যে বীর তরুণী এর কী জানি কেন আমার মতো এক বৃদ্ধকে ভালো লেগেছে। এককালে আমার স্বপ্ন ছিল বিলেত যাব, আই. এম. এস. হব, মেম বিয়ে করব, তার কোনো সম্ভাবনা দেখছি নে। তাই বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার কথা ভাবছি। ওর মা কিছুতেই রাজী নন। সোনার বেনের সঙ্গে বামুনের মেয়ের বিয়ে! ওর বাবা আমাকে কানে কানে বলেছেন, ওয়াকিকে কেউ বিয়ে করবে না। ও মেয়ে ওল্‌ড মেড হবে। আমরা মারা গেলে ওকে দেখবে কে? ওর বান্ধবী সবিতাই বা কদ্দিন আশ্রয় দেবে? শুনছি সবিতারও পাত্র জুটেছে। আমরা যদি ঝরনাকে তোমার হাতে সম্প্রদান করি আত্মীয়রা কেউ আসবে না। কিন্তু তুমি যদি ওকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে কর তা হলে আমরা দুদিন গালমন্দ করে পরে ঠান্ডা হব। তুমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরেছ, তুমি ক্ষত্রিয়। ঝরনাও যুদ্ধের আনুষঙ্গিক কাজ করেছে, সেও ক্ষত্রিয়ানী। তোমাদের বিবাহ অসবর্ণ নয়। পালিয়ে যাওয়ার আইডিয়াটা তিনিই আমার মাথায় ঢুকিয়ে দেন। আমি সেটাকে একটু পল্লবিত করি। কলকাতা থেকে জাহাজে চড়ে সোজা লন্ডন। সঙ্গে ঝরনা। বিয়ে তো জাহাজেও হতে পারে। তবে ঝরনা যদি চায় জাহাজে ওঠার আগেই সেরে নিতে পারি। কী বল, ডারলিং।" লাহা ওর দিকে সানুরাগে তাকান।

"বিশ্রী কালো মেয়ে, তিরিশের উপর বয়স, ওয়াকি বলে অপবাদের পাত্রী, গুরুজন আমাকে পাত্রস্থ করার আশা ছেড়ে দিয়েছেন। আমিও বিলেত যেতে চাই। কোয়ালিফিকেশন আরো বাড়াব। বিয়ের কথা তার পরে ভাবা যাবে। যদি ততদিন আপনার মেম বৌ না মিলে থাকেন। জাহাজে আমি আপনার সঙ্গিনী হব। জীবনসঙ্গিনী হব কি না সেটা পরের কথা।" ঝরনা দৃঢ়তার সঙ্গে বলে। ইস্পাতের ফলার মতো ঋজু দীঘল গড়ন। ঈষৎ পুরুষালি চেহারা। টেনিস চ্যাম্পিয়ন।

লাহা ওর হাত ধরে বলেন, "সৌম্য সাক্ষী, জুলি সাক্ষী, গঙ্গা সাক্ষী, অন্তরীক্ষ সাক্ষী, তোমার সঙ্গে আজ থেকে আমি এন্‌গেজড। যার কাছে আমি হীরো সেই আমার হীরোইন। গায়ের রঙ নিয়ে আমি কী করব। মনের রঙটাই আসল। ইউ আর এ লাভলি গার্ল। তিরিশ নয়, উনিশ।"

তিন

স্বপনদার জন্যে আরো প্রকান্ড শক অপেক্ষা করছিল। এটা তাঁকে একেবারে কাত করে দেয়। নাৎসীদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বিনা বিচারে আবদ্ধ ইহুদী, পোল ও জিপসিদের গ্যাস চেম্বারে পুরে গণহত্যা। সর্বমোট ষাট লক্ষের মতো। যুদ্ধকালে এসব গোপন ছিল। পরে ক্রমে ক্রমে উদ্ঘাটিত হয়েছে। সভ্য জগৎ শিউরে উঠছে। যারা ঘটিয়েছে, যাদের উপর ঘটানো হয়েছে দুই পক্ষই সভ্য। এ কেমনতরো সভ্যতা! মানবিক না দানবিক?

হিটলার সম্বন্ধে তাঁকে নতুন করে ভাবতে হয়। বোমার মুখে যারা পড়ে তারা নারীও হতে পারে, শিশুও হতে পারে, তাদের মৃত্যু ইচ্ছাকৃত খুন নয়। কিন্তু গ্যাস চেম্বারে পুরে যাদের মৃত্যু ঘটানো হয়েছে তারা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শহরে, বিভিন্ন গ্রামে বাস করত। তাদের বাড়ি থেকে একে একে ধরে বেঁধে বা ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে বলিদানের জন্যেই। লক্ষ লক্ষ বালবৃদ্ধবনিতা, তাদের আর কোনো দোষ নেই, তারা ইহুদী বা পোল বা জিপসি। যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে এক-একটা জাতির বংশলোপের অভিযান। যেমন মশককুল বিনাশের জন্যে ডি. ডি. টি. প্রয়োগ।

"ব্রহ্মচারী নয়, ব্রহ্মদৈত্য।" স্বপনদা অস্ফুট স্বরে বলেন।

তা শুনে বৌদি মন্তব্য করেন, "চোখ একটু একটু করে ফুটছে। আরো ফুটবে। তবে হিটলারকে তুমি হিন্দু ঐতিহ্যের মধ্যে পাবে না। বরং পেতে পার খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্যে। হিটলারই সেই অ্যান্টিক্রাইষ্ট যার আসার কথা খ্রীষ্টের পুনরাগমনের পর্বে।"

স্বপনদা খ্রীষ্টীয় থিওলজি পড়েন নি। পড়তে আগ্রহ বোধ করেন না। তাঁর অধ্যয়নের সীমা ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও শিল্প অবধি। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে যেটুকু থিওলজি পান সেইটুকুই তিনি জানেন। যেমন দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'র ভিতর দিয়ে। কিংবা মিলটনের 'প্যারাডাইজ লস্টে'র।

নেপথ্যে রিহার্সালের পর বিশ্বরঙ্গমঞ্চে প্রকাশ্যে অভিনীত এক মহানাটক হচ্ছে মহাযুদ্ধ। হিটলার, মুসোলিনি, তোজো, চার্চিল, রুজভেল্ট, স্টালিন, পেত্যাঁ, দ্য গল, সুভাষ প্রভৃতি তার কুশীলব। প্রেক্ষাগৃহে বসে পাঁচ ঘন্টা ধরে উপভোগ করা যায়। আর সব নাটকের মতো, উপন্যাসের মতো, আর্টের মতো এটাও হচ্ছে মায়া। মহাযুদ্ধ যখন, তখন মহামায়ার মায়া।

হিন্দুদের দুটি মহাতত্ত্ব আছে যা দিয়ে বিশ্বপ্রপঞ্চের অর্থ বোঝানো হয়। লীলাময়ের লীলা। মহামায়ার মায়া। যে নাটকে প্রেমের দৃশ্য নেই লীলাময়ের লীলা বলে তার ব্যাখ্যা করা চলে না। মহামায়ার মায়া বলে ব্যাখ্যা করলে তবু কতকটা বোধগম্য হয়।

স্বপনদার মুখে 'মহামায়ার মায়া' শুনে বৌদি জিজ্ঞাসা করেন, "কবে থেকে তুমি মায়াবাদী হলে?"

"কেন? আমি কি বলেছি ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মায়া?" দাদা জবাব দেন, "আর্টমাত্রেই মায়া। আর এটা তো মহানাটকের বিষয়—এই মহাযুদ্ধ, যা সম্প্রতি শেষ হয়েছে। মায়া! মায়া! মহামায়ার মায়া। এ ছাড়া আর কোনো অর্থ হয় না। অর্থ এর রাজনীতিতে নেই, অর্থনীতিতে নেই, সমাজনীতিতে নেই, ধর্মনীতিতেও নেই। ওসব যেন আঁধার ঘরে কালো বেড়াল খোঁজা যে বেড়াল সেখানে নেই।"

বৌদি সহানুভূতির কণ্ঠে বলেন, "বুঝতে পারছি তুমি খুব কষ্ট পাচ্ছ। কিন্তু তা বলে তুমি তোমার স্বধর্মভ্রষ্ট হবে কেন? তুমি হিউমানিস্ট। তোমার ধর্ম হিউমানিজম। মহামায়ার মায়া তোমার মুখে মানায় না। তোমার পক্ষে ওটা একটা পরাজয়। তুমি কেন ডিফিটিস্ট হবে?"

"দ্যাখ, রানু, যে-কোনো একটা হত্যাকাণ্ডের বিবরণ পড়েই আমি মর্মে আঘাত পাই। আর এ তো

কোটি কোটি হত্যাকাণ্ড! তার মধ্যে লক্ষ লক্ষ নিরীহ নারী আর শিশুর নিধন। একদিকে পরমাণুবোমা, আরেক দিকে গ্যাস চেম্বার। বৈজ্ঞানিক প্রতিভার বিকট ব্যভিচার। আসল খুনী সৈনিকরা নয়, বৈজ্ঞানিক আর রাজনীতিকরাই। মানুষকে এরা সুখস্বাচ্ছন্দ্য কিছু দিয়েছে বইকি। কিন্তু কত দামে? পঁচিশ বছর অন্তর অন্তর মহামারী। তাও বেছে বেছে ঠগ উজাড় নয়, ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়। গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকরা বলতেন, যোগ্যতমের উদ্ধর্বতন। সারভাইভাল অব্ দ্য ফিটেস্ট। কিন্তু এই শতাব্দীতে দেখা গেল যোগ্য অযোগ্য সবাই এক নৌকায় ডুবেছে। আবার যদি মহাযুদ্ধ বাধে গোটা পৃথিবীটাই টাইটানিক জাহাজের মতো সবাইকে নিয়ে ডুববে। যোগ্যতমের উদ্ধর্বতন একটা ফ্যালাসি।" স্বপনদা অভিযোগ করেন।

"বেশ তো, তোমরা সাহিত্যিকরা সে ফ্যালাসি শুধরে দাও। নাটক লেখো, উপন্যাস লেখো, গল্প লেখো। তুমি তো কেবলি ভাবছ আর ভাবছ। রদ্যাঁর ভাবুকের মতো। কলম ধরে লিখছ না কেন? বৈজ্ঞানিক আর রাজনীতিকরা যে অনিষ্টটা করছেন তোমরা সাহিত্যিকরা সেটাকে ইষ্ট দিয়ে ভাসিয়ে দিতে পার। ইভিল যত প্রবল হোক না কেন, গুড তার চেয়েও প্রবল হতে পারে। শয়তান যত শক্তিশালী হোক না কেন, ভগবান তার চেয়েও শক্তিশালী। যদি ভগবানকে বাদ দিয়ে ভাবতে চাও তো শয়তানকেও বাদ দিয়ে ভাব। কোথাও যদি ভগবানের হাত দেখতে না পাও তো শয়তানের হাতই দেখতে যাও কেন? আজকের দুনিয়ায় যেসব ফোর্স কাজ করছে হিটলার, স্টালিন, চার্চিল, রুজভেল্ট হলেন তাদের হাতের যন্ত্র। ওঁরা কেউ ব্যক্তিগত খামখেয়ালির দ্বারা চালিত হয়ে মারাত্মক সব সিদ্ধান্ত নেন নি। নৈর্ব্যক্তিক চাপ তাঁদের বাধ্য করেছে। প্রাইভেট লাইফে কেউ হয়তো খারাপ লোক নন। পাবলিক লাইফে প্রত্যেকেই কম বেশি খারাপ। বৈজ্ঞানিকরাও তাই, যদি রাষ্ট্রের অর্থ গ্রহণ করেন। তুমি স্বাধীন ব্যারিস্টার। তোমার মতো স্বাধীনতা কার? তুমি তোমার স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করো। অন্যের ব্যভিচার নিয়ে ওল্ড মেডদের মতো কুটকচালি করতে যাও কেন?"

"আমি ওল্ড মেড!" স্বপনদা করুণ কণ্ঠে বলেন।

"ওল্ড মেড বলি নি। বলেছি ওল্ড মেডদের মতো। বয়স গড়িয়ে যাচ্ছে, সেদিকে খেয়াল আছে? কবে লিখবে তোমার ক্লাসিক উপন্যাস? কবে থেকে শুনে আসছি তুমি এই লিখবে, ওই লিখবে, কিন্তু লিখতে তো হাত ওঠে না। মাদাম বোভারির ব্যভিচারের মতো ব্যভিচারই তোমার প্রিয় বিষয় মনে হচ্ছে। লেখ না কেন একটা মুখরোচক কেচ্ছা। তোমাদের ব্যারিস্টার মহলে তো পরকীয়া প্রেমের অভাব নেই। পরকীয়াকে পরে স্বকীয়াও করা হচ্ছে। স্বকীয়াকে পরকীয়া।" বৌদি রসিয়ে রসিয়ে বলেন।

"লিখি আর তার পরে লাইবেলের মামলায় জড়িয়ে পড়ি! এ দেশে 'মাদাম বোভারি' লেখার মতো ঝকমারি আর নেই।" স্বপনদা সহাস্যে বলেন।

"চিরন্তন ত্রিভুজ না হলে কি চিরায়ত সাহিত্য হয়? পশ্চিমের আদি কবি হোমারের 'ইলিয়াড' কি এর সেরা দৃষ্টান্ত নয়?" বৌদি পরিহাস করেন।

"তা যদি বল, ভারতের আদি কবি বাল্মীকির রামায়ণও তাই। হেলেন, পারিস, মেনেলাউস। রাম, রাবণ, সীতা। রাবণ সীতার সতীত্বহানি করে নি, এই যা তফাত। তবে অযোধ্যার লোক সেটা বিশ্বাস করল না। তাই শেষ পর্যন্ত ট্র্যাজেডি।" স্বপনদা দরদের সঙ্গে বলেন।

"মধ্যযুগেও তো একই থীম। এদিকে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস। ওদিকে দান্তে, পেত্রার্কা। পরকীয়া না হলে চিরায়ত সাহিত্যই হয় না। তার মানেই চিরন্তন ত্রিভুজ। এ সমস্যা তিন হাজার বছর আগেও ছিল, তিন হাজার বছর পরেও থাকবে। তুমি সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে দিনরাত ভাবছ, কিন্তু এক-আধ শতাব্দী পরে এসব সমস্যা বাসি হয়ে যাবে। হিটলারের আমলের কোনো চিহ্নই থাকবে না। চার্চিলকেও লোকে ভুলে যাবে। স্টালিনের ডিকটেটরশিপ রাশিয়ানদের অসহ্য হবে। রুজভেল্টের নিউ ডীল তাঁর সঙ্গেই লোপ পাবে। জাপান আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে। কিন্তু তার এটুকু শিক্ষা হয়েছে যে পার্ল হারবারে বোমা ফেললে হিরোশিমায় বুমেরাং হয়। ওটা জার্মানদেরও শিক্ষার সূত্র। স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ে এ শিক্ষা হত না। পরকে মেরে তার হাতে মরাও একপ্রকার

পরোক্ষ আত্মহত্যা। তৃতীয় মহাযুদ্ধে এটা আরো পরিষ্কার হবে।" বৌদির বিশ্বাস।

"তৃতীয় মহাযুদ্ধ কি সত্যি বাধবে?" স্বপনদার সন্দেহ।

"বাধলে আশ্চর্য হব না। না বাধলে আনন্দিত হব। মানবজাতির উপরে তোমার যতখানি ভরসা আমার ততখানি নেই। তুমি ধরে নিয়েছ এ জাতি দিন দিন আরো বিজ্ঞ হবে। আমি কিন্তু দেখছি যতবার নতুন কোনো যন্ত্র বা নতুন কোনো অস্ত্র উদ্ভাবন করছে ততবার ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। এর প্রগতিটাই হয়েছে দুর্মতির সঙ্গে একাত্ম। এর যদি কোনো প্রতিকার খুঁজে বার করতে পার তো সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লেখো। নয়তো মন দাও চিরন্তন বিষয় নিয়ে চিরায়ত কাব্য নাটক উপন্যাস রচনায়। যদি সে ক্ষমতা থাকে।" বৌদি গুরুজনের মতো উপদেশ দেন।

"একেই বলে কান্তাসম্মিত।" স্বপনদা হাসেন। "তুমি ছাড়া আর কে আমার উপর মাস্টারি করবে? কিন্তু সমসাময়িক ঘটনাগুলো আমাকে এমনভাবে নাড়া দেয় যে আমি অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে পাঁচ-দশ পৃষ্ঠার বেশি লিখতে পারি নে। অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে দেরাজ ভরে গেছে। একদিন না একদিন সমাপ্ত করব বলে সংরক্ষণ করছি। কিন্তু মনের মতো মুড পাচ্ছিনে। ডসটয়েভস্কির মতো যদি অন্নাভাব থাকত তা হলে পেটের জ্বালায় সমাপ্ত করতুম আর প্রকাশকের হাতে দিয়ে প্রাণরক্ষা করতুম। বাবা যা রেখে গেছেন তা তোমার আমার পক্ষে ঢের। আর একজন কি দুজন এলে অবশ্য গতর খাটিয়ে রোজগার করতে হবে। তার জন্যেই তো ব্যারিস্টার হয়েছি। বই লেখার চাড় নেই। তাই ডসটয়েভস্কির পদাঙ্ক অনুসরণ করে অফুরন্ত সৃষ্টি করতে পারছি নে। যার অন্নাভাব নেই তার থাকে রবি ঠাকুরের মতো ড্রাইভিং ফোর্স। যে ফোর্স ইঞ্জিনকে ঠেলে নিয়ে যায় হাওড়া থেকে দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ। বঙ্কিমের ভিতরেও সে ফোর্স ছিল। কিন্তু ছিল না মাইকেলের ভিতরে। হয়তো থাকত ব্যারিস্টার না হলে।"

ইতিমধ্যে সৌম্যর চিঠি পেয়ে সোনাদি লিখেছেন, "তোমরা বিয়ে করতে চাও শুনে পরম আনন্দিত হয়েছি। বাপু আজকাল কারো বিয়েতে বাধা দেন না। বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে তিনি বিদ্যাসাগরের চেয়েও উদার। অসবর্ণবিবাহ সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের চেয়েও উৎসাহী। তিনি এত জোরে জোরে হাঁটছেন যে আমরা কেউ তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছি নে। যেমন কায়িক অর্থে তেমনি মানসিক অর্থে। আগে ছিলেন কট্টর বর্ণাশ্রমী। এখন কাস্টলেস সোসাইটির প্রবক্তা। অসবর্ণবিবাহ ভিন্ন অন্য কোনো বিবাহে তিনি আশীর্বাদ করেন না। তাঁর সবচেয়ে পছন্দ ব্রাহ্মণ-হরিজন বিবাহ। হরিজনকে পুরোহিত করাও তাঁর আর-একটি নীতি। এতে ব্রাহ্মণদের মনোপলিতে হাত পড়ে। গোঁড়া ব্রাহ্মণদের ঘাঁটি পুনা। সেখান থেকে প্রায়ই হত্যার হুমকি আসে। বাপুকে সাবধান করে দিলেও তিনি গা করেন না। বলেন, মরতে তো একদিন হবেই। স্বধর্মে নিধনই শ্রেয়। আমার ধর্ম সত্য আর অহিংসা।"

এর পরে আসল কথা। "তোমাদের বিয়েতে বাপু সানন্দে অনুমতি দিয়েছেন। তবে তুমি যদি দেশের মুক্তির জন্যে আবার লড়তে চাও তবে তোমাকে ব্রহ্মচর্য রক্ষা করতে হবে। নয়তো দুজনে মিলে গঠনকার্যে আত্মনিয়োগ করো।"

আক্কেল গুড়ুম। চিঠিখানা সৌম্য জুলিকে দেখায় না। তার মাকেও না। সটান চলে যায় স্বপনদার কাছে।

"অ্যাঁ!" স্বপনদা চমকে ওঠেন। ছুটে আসেন বৌদি। চিঠি পড়ে তিনিও আঁতকে ওঠেন! "অ্যাঁ।"

"ওল্ড ম্যান গান্ধীর ওই এক অবসেশন। ব্রহ্মচর্য! এক বছরেই স্বরাজ হবে এই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে অনেকেই ব্রহ্মচর্য পালন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কোথায় এক বছর! কেটে গেছে পঁচিশ বছর! ব্রহ্মচর্যে অটল রয়েছে এমন সত্যাগ্রহীর সংখ্যা কজন? তুমি যদি তাদের একজন হতে চাও তা হলে বিয়ের জন্যে বাগ্‌দান করে ভুল করেছ। ইংরেজ কোন্ দুঃখে ভারত ছাড়বে? এখন সে আপদ্‌মুক্ত। আবার লড়তে হবে। তবে অহিংসভাবে কি না সন্দেহ। গান্ধীর দিন গেছে। সুভাষের দিন এখনো যায় নি। তবে সুভাষ যদি না ফেরে কমিউনিস্টরাই সহিংসভাবে লড়বে। তুমি গঠনের কাজ নিয়েই ব্যাপৃত থেকো। তা হলে একটি অনিচ্ছুক বধূর উপরে ব্রহ্মচর্য চাপিয়ে দিতে হবে না।

ওর সম্মতি থাকলে অবশ্য অন্য কথা। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না যে ও সম্মতি দেবে। মিলনবাসনার সঙ্গে রয়েছে মাতৃত্বের বাসনা। এসব বাসনা চরিতার্থ না হলে যা হয় তা ফ্রয়েড পড়লে জানতে পাবে। মানসিক অসুখের প্রধান কারণ রিপ্রেশন। এটা মেয়েদের বেলাই বেশি। পুরুষরা তো এদিক ওদিক চরে বেড়াতে পারে। মেয়েদের সে স্বাধীনতা নেই। জুলির মা গোপন করতে চাইলে কী হবে? জুলি এখন অর্ধ-পাগল। আস্ত পাগল হবে তুমি যদি বিয়ের পর ওর উপর ব্রহ্মচর্য চাপাতে যাও। হিটলারের মতো ব্রহ্মচারী আর কে? কিন্তু তিনিও এফা ব্রাউনের উপর ব্রহ্মচর্য চাপান নি।" স্বপনদা অম্লানমুখে বলে যান।

বৌদি ফিক করে হাসেন। "তুমি কী করে জানলে? তুমি কি ওদের বেড চেম্বারে আড়ি পেতেছিলে?"

"মৃত্যুর পূর্বক্ষণে হিটলার যে এফাকে বিয়ে করেন এটা কৃতকর্মকে সামাজিক স্বীকৃতি দেবার জন্যেই। নেপোলিয়নের আক্রমণের সময় মৃত্যু আসন্ন ভেবে গোটেও তাই করেছিলেন। অসাধারণদের সঙ্গে সাধারণদের তফাতটা এইখানে যে সাধারণরা আগে বিয়ে করে, তারপরে সহবাস করে।" স্বপনদা উত্তর দেন।

"আমি কেবল ভাবছি আমার দেশোদ্ধারের প্রতিজ্ঞার কী হবে। ওটা কি তবে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নয়? অন্যান্য সত্যাগ্রহীরা জেলে যাবে, জরিমানা দেবে, জায়গা জমি হারাবে, কেউ কেউ প্রাণও হারাবে। আর আমি কিনা বিয়ে করে বৌ নিয়ে নিরাপদে ঘরসংসার করব? আশ্রমে বাস করে ঘরসংসার করা বিসদৃশ দেখাবে। আশ্রমের বাইরেই থাকতে হবে। বাইরে থেকে আশ্রম চালানো যেন বাড়ি থেকে আপিস আদালত চালানো। আশ্রম ওভাবে চালানো উচিত নয়। আশ্রমেই বাস করতে হবে জুলিকে আর আমাকে। আলাদা একখানা কুঁড়েঘরে। কিন্তু আশ্রমের নিয়মই হচ্ছে ব্রহ্মচর্য পালন। বিবাহিত কর্মীদের তাই করতে বলা হয়। যারা পারে না তারা বাইরে বাসা নেয়। তারা কেউ আশ্রমের পরিচালক নয়। আমাকে পরিচালকের দায়িত্ব ছাড়তে হবে দেখছি। কিন্তু সে দায়িত্ব নেবে কে? মুক্তিযুদ্ধেও থাকব না, আশ্রম পরিচালনাতেও থাকব না, এতদিন যে অভিজ্ঞতা অর্জন করলুম সেটা কি তবে বৃথা যাবে? দেশ লাভবান হবে না?" সৌম্য উচ্চস্বরে চিন্তা করে।

স্বপনদা গম্ভীরভাবে বলেন, "সত্যাগ্রহ বিগিন্‌স অ্যাট হোম। সত্যটা এক্ষেত্রে কী? সত্যটা এই যে তুমি একটি মেয়েকে বিবাহ করবে বলে বাগ্‌দত্ত হয়েছ। দেশের স্বাধীনতা যদি আজ আসে তবে কাল তাকে তুমি বিয়ে করবে। তার পরে যথারীতি ফুলশয্যা। ব্রহ্মচর্যের প্রশ্ন উঠবে না। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা কবে হবে কেউ জানে না। দু বছর পরেও হতে পারে, দশ বছর পরেও হতে পারে। আরো একবার সংগ্রামের প্রয়োজন যদি হয় তবে সেটা যে গান্ধীজীর নেতৃত্বেই হবে এটা তোমার কাছে স্বতঃসিদ্ধ। আমার কাছে নয়। জবাহরলাল তো ব্যারিস্টারের গাউন এঁটে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের তিন সর্দারের মামলায় আসামী পক্ষের কৌঁসুলি হয়েছেন। অমনি করে আস্ত ফৌজটাকেই তিনি আপনার করবেন। দরকার হলে ওদের নিয়ে লড়াইয়ে নামবেন। তখন কোথায় গান্ধী আর কোথায় তুমি! সত্যাগ্রহই বা কোথায়! তুমি যাও, মহাত্মাকে বুঝিয়ে বলো যে বিয়ের পরে ব্রহ্মচর্য স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া সম্ভব নয়। রাসকিন তো তাঁর অন্যতম গুরু। রাসকিনের বেলা কী হয়েছিল তিনি কি তা জানেন না?"

"কী হয়েছিল?" বৌদি কণ্ঠক্ষেপ করেন।

"সে কী! তুমিও জানো না?" স্বপনদা আশ্চর্য হয়। "রাসকিন ভালোবেসে বিয়ে করেন, বিয়ের পরেও ভালোবাসেন। কিন্তু রাতের পর রাত যায়, মাসের পর মাস যায়, বছরের পর বছর যায়, পাঁচ বছরেও বিয়ের জল পড়ে না। রাসকিনের বিশ্বাস ওতে নরনারীর দেহমনের পবিত্রতা নষ্ট হয়। বেচারি এফি অতিষ্ঠ হয়। বিখ্যাত চিত্রকর মিলেসের সঙ্গে ইলোপ করেন। তার পরে রুজু হয় সেই প্রসিদ্ধ মামলা। পাঁচ বছরেও কনসামেশন হয়নি। রাসকিন নপুংসক। বিবাহ বাতিল। মিলেসের সঙ্গে এফির বিবাহ ফলপ্রসূ হয়। সাবধান, সৌম্য! অশরীরী প্রেম সারা জীবন স্থায়ী হতে পারে, কিন্তু অশরীরী বিবাহ যে-কোনো দিন আদালতের বিচারে বাতিল হবার যোগ্য। ক্যারামেল পরের হবে না, কিন্তু সেও একদিন গৃহত্যাগ করতে পারে। সেই যে একটা কথা আছে, অতি ঘরনী না পায় ঘর। তেমনি, অতি আদর্শবাদী না পায় ঘরনী। তোমাকে ঘরনীহীন হয়ে ধরণী ত্যাগ করতে হবে।"

সৌম্য এত কথা জানত না, শুনে তাজ্জব বনে।

স্বপনদা সৌম্যর মুখ দেখে সদয় হয়ে বলেন, "সব মেয়ে এফি নয়। বার্নার্ড শ-র সঙ্গে যখন শার্লটের বিয়ে ঠিক হয় তখন শার্লটই জেদ ধরেন বিয়ের পরে তাঁর বন্ধু যেন তাঁর গায়ে হাত না দেন। অর্থাৎ বিয়ের পরেও তাঁরা বন্ধু ও বান্ধবী। সখা ও সখী। সম্ভব, সম্ভব, এই সম্পর্কটাও সম্ভব। লোকে কী মনে করবে, তাই একসঙ্গে থাকতে হলে বিবাহ বলে একটা অনুষ্ঠান করতে হয়। একসঙ্গে থাকাটাই আসল, বিয়েটা লোক-দেখানো। তা তোমরা ইচ্ছে করলে বিবাহিত বন্ধু ও বন্ধুনী হতে পার। যদি ক্যারামেল সম্মতি দেয়। বলা যায় না, দিতেও পারে। কিন্তু সেটা হয়তো মন থেকে নয়। শুধু বিয়ে করে একসঙ্গে থাকার আগ্রহে। ইউরোপে এর নাম কম্পানিয়নেট ম্যারেজ। এদেশেও এর নজির আছে। কিন্তু ক্যারামেল যে রকম মেয়ে তার সম্মতিটা পরে অসম্মতিতে দাঁড়াতে পারে। ও কি মা না হয়ে সুখী হবে ভেবেছ?"

সৌম্য সামলে নিয়ে বলে, "ওর অসম্মতির আভাস পেলে বাপুকে জানিয়ে তাঁর অনুমতি চাইব। কিন্তু এই মুহূর্তে ওকে সোনাদির চিঠিখানা দেখাতে সাহস হচ্ছে না। খেপে গিয়ে বিদ্রোহ করতে পারে। তখন হয়তো আশ্রমে বাস করতে নারাজ হবে। গঠনের কাজে সহযোগিতা করবে না। সবচেয়ে ভালো হত ইংরেজরা যদি আজকেই ভারত ছাড়ত।"

"আহা! সেইখানেই তো গোল। সবচেয়ে যেটা ভালো সেটা কি কোথাও কখনো হয়েছে না হবে? মানুষকে অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা। ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে তুমি আর ক্যারামেল দুজনে দুজনকে ভালোবাস। এ ভালোবাসা দীর্ঘকালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আন্ডারগ্রাউন্ড আর ক্যারামেল দুজনে দুজনকে ভালোবাস। এ ভালোহবেই। দেশের স্বাধীনতা ইত্যাদির প্রশ্ন তুলে একে অযথা ঘোরালো করার মানে হয় না। তোমার কৌমার্য ভঙ্গ হবে, অথচ ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ হবে না—এটা একটা অবাস্তব অনুশাসন। তুমি এর বিরুদ্ধেই সত্যাগ্রহ করো। পোপ কি অভ্রান্ত? পোপের অমনতরো দাবির বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট করতে গিয়ে প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। এদেশেও তাই হবে। গান্ধীজীর সংঘেও। তুমিই ভারতের মার্টিন লুথার হতে পার। তিনি ক্যাথলিক সন্ন্যাসী থাকতে অনিচ্ছুক ছিলেন। প্রটেস্টান্ট হয়ে বিবাহ করেন। তখন থেকেই প্রটেস্টান্ট পাদ্রীরা বিবাহ করে আসছেন।" স্বপনদা সৌম্যকে উসকে দেন।

তা লক্ষ করে বৌদি বলেন, "সৌম্য যদি স্বাধীনতা-সংগ্রামের সম্প্রব ছেড়ে দিয়ে গঠনের কাজ নিয়ে থাকে তবে গান্ধীজী কৌমার্যভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য-ভঙ্গেরও অনুমতি দেবেন। ইচ্ছা করলে সে আর কারো নেতৃত্বে সংগ্রাম করতেও পারে, আর কেউ ব্রহ্মচর্যের উপর এতখানি জোর দেবেন না। তবে আমি যতদূর বুঝি বিবাহিত ব্রহ্মচারী একটা নতুন কনসেপ্ট। ক্যাথলিক বা প্রটেস্টান্ট কোনো সম্প্রদায়েই এ কনসেপ্ট নেই। থিওসফিস্টদের মধ্যেই এর চল দেখতে পাওয়া যায়। তাদেরই সমসাময়িক সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীদের মধ্যেও। পণ্ডিচেরী ও চন্দননগরেও এর পরীক্ষানিরীক্ষা চলেছে। এ সাধনা সর্বসাধারণের জন্যে নয়। বাছা-বাছা স্ত্রী-পুরুষের জন্যে। সৌম্য আর জুলি যদি তাদের পর্যায়ে পড়ে তো সভ্যতাকে এক ধাপ এগিয়ে দেবে।"

দরদী শ্রোতা পেয়ে সৌম্য বলে, "আমার যে কী সংকট তা কেমন করে বোঝাব, দাদা বৌদি! আমি ছিলুম দেশের কাছে সত্যবদ্ধ, তার পরে হলুম নারীর কাছে সত্যবদ্ধ। এক সত্যের সঙ্গে আরেক সত্যকে মেলাই কী করে? বিয়াল্লিশ সালে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ইংরেজরা সেই বছরই ভারত ছাড়বে, তার মানে ভারত সরকার গদি ছাড়বে। জন বুলের 'টেন ডেজ দ্যাট শুক দ্য ওয়ার্লড' পড়েছেন নিশ্চয়। আমার মাথায় তেমনি ঘুরছিল থার্টি ডেজ দ্যাট শুক দ্য ওয়ার্লড। সেই ধারণার বশে আমি জুলিকে বাগ্‌দান করি। তখন তো খেয়াল ছিল না যে জাপানিরা ভারতের দিকে পা বাড়াবে না, বার্মায় তটস্থ থাকবে। এখন আমি কথা রাখতে গিয়ে সংকটে পড়ে গেছি। আমার উদ্ধারের উপায় কী? বাপুর বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ? কেন, তিনি এমন কী নতুন কথা বলেছেন? রামকৃষ্ণদেব আর সারদামণি দেবী—এঁরাও তো ছিলেন

বিবাহিত ব্রহ্মচারী। জুলি যদি রাজি হত আমার দিক থেকে বিন্দুমাত্র আপত্তি থাকত না। তবে সেটা সারা-জীবনের জন্যে নয়। আমারও ইচ্ছা করে ঘরসংসার পাততে, সন্তানের পিতা হতে। আমার আদর্শ ব্রহ্ম-নিষ্ঠ গৃহস্থ। ব্রহ্মচর্যব্রতধারী সন্ন্যাসী নয়। কিন্তু যার দেশ পরাধীন তাকে স্বাধীনতার জন্যে লড়তে হবে। লড়াই যতদিন না শেষ হচ্ছে ততদিন আরামে ঘরসংসার করা চলবে না। তাই বলে কি একটি মেয়ে তার জন্যে শবরীর মতো প্রতীক্ষা করবে? যৌবন বয়ে যেতে দেবে? জরাগ্রস্ত হবে? সন্তানের জননী হবে না? স্বাভাবিক জীবন যাপন করবে না? অ্যাবনর্মাল হবে? আমি বড়ো আশা করেছিলুম যে জুলি সুকুমার দত্ত-বিশ্বাসকে বিয়ে করে সুখী হবে। তা তো হল না। জুলির আমাকেই পছন্দ। কোনোদিন ওকে আমি ভোলাবার চেষ্টা করি নি। বরং দাড়িগোঁফ রেখে হোঁদলকুৎকুতের মতো চেহারা করে ভয় পাইয়ে দিয়েছি। আমি যা খাই তা কি ও কোনোদিন খাবে? আকাঁড়া চালের ভাত, অড়হরের ডাল, কাঁচা আনাজ, সিন্ধ তরকারির ঘেঁটি। জুলিকে নিবৃত্ত করতেই চেয়েছি। কিন্তু কমলী নেহি ছোড়তি। বিয়ে ওকে করতেই হবে। বিয়ের পর বিয়ের সুখ দিতেই হবে। দুঃখও যে দিতে হবে না তা নয়। বিরহের দুঃখ। ওর যা মতি-গতি ও কখনো গ্রামে বা আশ্রমে থাকবে না। কিছুদিন পরে পালিয়ে আসবে। কলকাতা শহরে। ওর মায়ের কাছে। ওকে সুখী করার জন্যে আমিও আমার কর্ম-স্থল ছেড়ে চলে আসব নাকি? তা হয় না। পুরুষের কাছে তার কর্মক্ষেত্রই যথাস্থান। শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখা যাবে দুজনের দুই কর্মক্ষেত্র। সেটা মেনে নিয়েই বিবাহিত জীবন। আমি তাতে রাজি। তবে আপাতত আমরা একসঙ্গে থাকার কথাই ভাবছি। জুলি আপা-তত আমার আশ্রমেই বা তার আশেপাশেই থাকবে। সোনাদি যেমন আছেন সেবাগ্রামে। তার আগেই বিয়েটা যেন চুকে যায়। কিন্তু আরো আগে আমাকে একবার আশ্রমে গিয়ে সব ঠিকঠাক করতে হবে।"

বৌদি সহানুভূতির স্বরে বলেন, "ভেবো না, সৌম্য। সব আপনি ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক করে দেবে প্রকৃতি। সে তোমার বাপুর চেয়ে বলবান। তার কাছে কত ঋষি মুনি হার মেনেছেন। তাঁদের আশ্রমে কী না হত! প্রকৃতির সঙ্গে মানুষকে আপস করতে হয়। তোমাদেরও করতে হবে। বাপুকে মানা করতে গিয়ে প্রকৃতিকে অমানা করলে তার ফল হবে মানসিক বিকার। এর মধ্যে আমি কোনো নৈতিক স্খলন দেখি নে। হিন্দুদের গৃহস্থ আশ্রমে পতিপত্নীর সহবাসই সুনীতি।"

স্বপনদা জুড়ে দেন, "রাজনীতি ছেড়ে দিলে বাপুও তোমাদের গৃহস্থের মতো আচরণ করতে বলবেন। তবে সংগ্রামের বেলা ডাকবেন না। কী আসে যায়!"

সৌম্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। "ভারতের শেষ স্বাধী-নতা-সংগ্রামে আমার অংশ থাকবে না? তপস্যা ব্যর্থ যাবে?"

স্বপনদা তাকে সান্ত্বনা দেন। "ভারতের শেষ স্বাধীনতা-সংগ্রাম এত বেশি ভায়োলেন্ট হবে যে তাতে তোমার অংশ থাকতেই পারে না। যদি না তুমি সুভাষের মতো জঙ্গী নেতা হও। তা যদি হও তবে তোমার বাপুর সঙ্গে তোমার বিচ্ছেদ অনিবার্য।"

"না, না। আমি কখনো আমার মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হব না। উদ্দেশ্য যেমন মহৎ হবে উপায়ও তেমনি বিশুদ্ধ হবে। মিলিটারিজমের সাহায্য নিলে পরে তার সঙ্গে লড়তে পারা যাবে না। স্বাধীন ভারত মিলি-টারিস্ট হলে সেটা কি আমার সহ্য হবে? আবার আমি জেলে যাব। বাপুর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ অসম্ভব। সত্য আর অহিংসা তো আমি বিসর্জন দিচ্ছি নে। সেখানে স্থির থাকছি। অস্থিরতা কেবল ব্রহ্মচর্যের বেলা। আরো কিছুদিন লাগবে মনঃস্থির করতে। দেশকে ভালোবাসা আর নারীকে ভালোবাসার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। বাপুর সঙ্গে একদিন এ নিয়ে আমার বোঝাপড়া হবে। কিন্তু এখন নয়। এখন তিনি সিমলা বৈঠকের ব্যর্থতার পর বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পলিসি নির্ধারণ নিয়ে ব্যস্ত। বড়ো বড়ো নেতাদেরই সময় দিতে পারছেন না। আমাকে দিলে কতটুকু সময় দেবেন? বাপুর সঙ্গে বোঝাপড়া ধীরেসুস্থে হবে। আপাতত জুলির সঙ্গে বোঝাপড়া তো হোক। আমি বেশ বুঝতে পারছি যে আমি যদি ওর হাত না ধরি ও সমুদ্রের অন্তঃস্রোতের টানে তলিয়ে যাবে।" সৌম্য উদ্বেগের সঙ্গে বলে।

"ঠিক বলেছ। সাবাশ!" বৌদি তারিফ করেন।

"এবার আমার একটা পরামর্শ শোনো দেখি। তুমি জঙ্গী নেতা হবে না। কিন্তু তার বদলে হবে জংলী নেতা। দাড়িগোঁফের জঙ্গলে তোমার মুখচোখ ঢেকে যাবে। সেটা কোন্ বৌ পছন্দ করবে? বিয়ের আগে হেয়ার কাটিং সেলুনে গিয়ে জঙ্গল সাফ করে এসো। তখন তোমাকে রাজপুত্তুরের মতো দেখাবে।"

সৌম্য হো হো করে হাসে।

স্বপনদা হাসি থামিয়ে বলেন, "দেশমাতার চল্লিশ কোটি সন্তান। তুমিই একমাত্র নও। কিন্তু ক্যারা-মেলের তুমিই একমাত্র বর। তুমি না থাকলেও সংগ্রাম দিব্যি চলবে, ফলাফলের এমন কিছু ইতরবিশেষ হবে না। কিন্তু তুমি না থাকলে ওই মেয়েটির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তা হলে বুঝতে পারছ তোমার উপস্থিত কর্তব্য ওর পাশে দাঁড়ানো। ওকে স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা। কোথায় থাকবে, কী খাবে, এসব প্রশ্ন গুরুতর নয়। তুমি দেখবে, ও তোমার সঙ্গেই আশ্রমে বা গ্রামে থাকবে। আকাঁড়া চালের ভাত আর অড়হরের ডাল খাবে। তবে হজম করতে পারবে কি না সন্দেহ। প্রেমে পড়লে বা প্রেমে পড়ে বিয়ে করলে মেয়েরা সব দুঃখ সইতে পারে। সইতে পারে না কেবল স্বামীর ভালোবাসার শরিক। সেদিক থেকে তুমি ঠিক থাকলেই হল। অন্য কোনো নারী তোমার দিকে ফিরেও তাকাবে না। তোমার ওই জঙ্গলটি ওদের ভয় পাইয়ে দেবে। খবরদার ওটি সাফ করতে যেয়ো না। রাজপুত্তুর হলেই তুমি গেছ। তোমাকে নিয়ে অশান্তি সৃষ্টি হবে। তবে ক্যারামেল যদি তোমাকে সভ্য ভব্য করতে চায় সেকথা আলাদা। বৌরা নিজেরাই খুরে কাঁচি ধরে শিল্পকর্ম করে, জান তো? তুমিও হয়তো একদিন একটি শিল্প-কর্মে পরিণত হবে।" এই বলে স্বপনদা শাসান আর হাসান।

[ক্রমশ

বাড় বেড়েছে

প্রবাল দাশগুপ্ত

এক

একটা কথা চালু আছে, 'অমুকের তো খুব বাড় বেড়েছে!' সাধারণ ভাষায় যে কথা চালু আছে তাকে অবলম্বন করেই বিজ্ঞানের পরিভাষা গড়ে উঠবে, এরকম আশা করতে পারি। নইলে লোকজনের দৈনন্দিন কান্ড-জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগ হবে কী করে? এ লেখায় প্রস্তাব করছি যে প্রচলিত 'বাড়' কথাটার ব্যবহার হোক ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায়। যে ইংরেজি পারিভাষিক শব্দের এই প্রতিশব্দ প্রস্তাব করছি সেই bar-এর সঙ্গে কিছু ধ্বনির মিলও রয়েছে।

বাড় ধারণাটা অন্বয়ের ব্যাপার। অন্বয় হল ভাষা-বিজ্ঞানের সেই শাখা যা বাক্য, বাক্যাংশ আর তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে ব্যাপৃত থাকে।

অন্বয়ে তাই দু ধরনের প্রশ্ন ওঠে : বাক্যাংশ নিয়ে (বাক্যের বিভাজন ঠিক কী রকম?) আর অংশের সঙ্গে অংশের সম্পর্ক নিয়ে (কোন্ অংশ কোন্ অংশের উপর নির্ভরশীল এবং কীভাবে নির্ভর করে?)। অন্বয়ের এই দুই অনুসন্ধানকে বলা চলে বিভাজনতত্ত্ব আর সম্পর্কতত্ত্ব। বাড় ধারণাটা আদতে বিভাজনতত্ত্বের জিনিস। তবে বিভাজন আর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত, বলাই বাহুল্য।

দুই

একটা সোজা বাক্য নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক।

১। চিঠি এল

এই বাক্যে দুটো বিভাগ আছে বলব। বন্ধনীর সাহায্যে দেখানো চলে।

২। ((চিঠি) (এল))

এটুকুতেই বিভাজনের কাজ শেষ হয় না। প্রত্যেক বিভাগের জাতি বলতে পারা চাই। ভাষা জিনিসটা যদি খুব সরল হত তাহলে বলতে পারতাম যে প্রথম বিভাগ বিশেষ্য, দ্বিতীয় বিভাগ ক্রিয়া, গোটা ব্যাপারটা বাক্য। বন্ধনীর নীচে লিখে রাখলে স্পষ্ট হয়।

```
৩। (      (        চিঠি ) (      এল ) )
   বাক্য  বিশেষ্য          ক্রিয়া
```

জাতির পুরো নামটা প্রত্যেকবার লিখলে অসুবিধে হয়। ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে ক্রি লেখাই ভালো। বিশেষ্য বিশেষণ দুটোকেই বি লিখে লাভ নেই বলে রাজশেখর বসু যথাক্রমে ষ্য আর ণ লিখেছিলেন চলন্তি-কায়। সেই একই রীতিতে প্রস্তাব করছি যে বাক্যকে সংক্ষেপে ক্য লেখা হোক। ৩-এর সংক্ষিপ্ত চেহারা তাহলে ৪।

```
৪। (   (   চিঠি ) (   এল ) )
   ক্য  ষ্য       ক্রি
```

কিন্তু ভাষা তো ওরকম সরল নয়। যেমন মাঝে মাঝে বিশেষ্যের বাড় বেড়ে যায়।

৫। বিদেশী চিঠি এল

যখন 'চিঠি' বেড়ে 'বিদেশী চিঠি' হয় তখন বাক্যের অন্বয় কী দাঁড়ায়? এখানে 'বাড়' কাজে লাগে। 'বিদেশী চিঠি' একটা বিশেষ্য-বাড়। আর 'বিদেশী' তো বিশেষণ; সংক্ষেপে ণ।

```
৬। (   (   (  বিদেশী ) (   চিঠি ) ) (   এল ) )
   ক্য  ষ্য̄  ণ          ষ্য          ক্রি
```

ওই যে ৬-এ ষ্য̄ লিখেছি, ওটাকে পড়তে হবে, 'বিশেষ্য-বাড়', অর্থাৎ বিশেষ্য বেড়ে গিয়ে যা হয়েছে সেই বৃহত্তর বস্তু।

যদি বলি ৭?

৭। সেই বিদেশী চিঠি এল

আরো একবার বাড় বেড়েছে বুঝে নিতে হবে তাহলে। 'সেই' একটা নির্দেশক, সংক্ষেপে বলব নি।

```
৮। (  (  (  সেই) (  (  বিদেশী ) ( চিঠি ))) ( এল))
   ক্য ষ্য̿ নি      ষ্য̄ ণ          ষ্য        ক্রি
```

এখানে ষ্য̿ লিখেছি। পড়তে হবে 'বিশেষ্য-দুই-বাড়' অথবা 'বিশেষ্য-দুই'। এই দ্বিতীয় পাঠরীতি ব্যবহার করলে সংকেতেও সুবিধে হয়। লেখা চলে ৯।, পড়তে পারি ১০।

৯। ষ্য, ষ্য১, ষ্য২

১০। বিশেষ্য, বিশেষ্য-এক, বিশেষ্য-দুই

এবার ফিরে গিয়ে বলব, ১-ও আসলে ৪ নয়, ১১। ৫-ও আসলে ৬ নয়, ১২।

```
১১। (  (   (   (   চিঠি ) ) ) (  এল ) )
    ক্য ষ্য২ ষ্য১ ষ্য            ক্রি
```

```
১২। (  (   (   (  বিদেশী ) (  চিঠি ) ) ) (  এল ) )
    ক্য ষ্য২ ষ্য১ ণ          ষ্য             ক্রি
```


এমন কথাও বলছি না যে ১১-১২-ই ১ আর ৫-এর শেষ সত্য। সত্যের দিকে এগোচ্ছি এটুকু আশা করতে পারাই যথেষ্ট। জাতিবন্ধনীনির্দেশ হিসেবে ৪ আর ৬-এর চেয়ে ১১-১২ ভালো।

তিন

ভালো কীসে? বুঝে নেওয়া দরকার।

আমরা ৭-এ আর তার জাতিবন্ধনীনির্দেশ ৮-এ দেখেছি যে বিশেষ্যের অধিকার আছে বিশেষণ নেওয়ার আর নির্দেশক নেওয়ার। এ অধিকারগুলো খাটালে সে প্রকাশ্যত বেড়ে উঠে বিশেষ্য-দুই হিসেবে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু ভেবে দেখা দরকার বিশেষ্য-দুই হিসেবে দাঁড়ানো কাকে বলে। বিভাজনতত্ত্ব সম্পর্কতত্ত্বের সহ-যোগী।

বাক্যে বিশেষ্য-দুই বলে একটা বিভাগ 'দাঁড়ানো' মানেই সেই বিভাগের সঙ্গে আরেক বিভাগের কোনো-না-কোনো সম্পর্কস্থাপন। আপাতত কাজ চলে যদি বলি যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় উদ্দেশ্য 'সেই বিদেশী চিঠি'-র সঙ্গে বিধেয় 'এল'-র। এই সম্পর্কের উদ্দেশ্য-ভূমিকায় নামতে বিশেষ্য-দুই পারে। অন্য কোনো জাতি পারে না। প্রত্যেক উদ্দেশ্য বিশেষ্য-দুই-জাতীয়। প্রত্যেক বিশেষ্য-দুইএর সামর্থ্য আছে উদ্দেশ্য হওয়ার।

আমাদের ১, ৫, ৭-এ উদ্দেশ্য তো যথাক্রমে 'চিঠি, বিদেশী চিঠি, সেই বিদেশী চিঠি'। যেকোনো উদ্দেশ্য যদি বিশেষ্য-দুই হয় তাহলে স্পষ্টতই বলতে হবে যে ১-এ 'চিঠি' আর ৫-এ 'বিদেশী চিঠি' নিছক বিশেষ্য বা নিছক বিশেষ্য-এক নয়, দুবারই বিশেষ্য-দুই। তাই ১১ আর ১২ নিচ্ছে ৪ আর ৬-এর জায়গা।

কেউ কি ১১ দেখে ভাববেন যে বলা হল 'চিঠি' পদটাই স্বয়ং বিশেষ্য-দুই জাতির সদস্য? ওরকম ভাবা ভুল। যদি ঠিক হত তাহলে তো ৭-এও 'চিঠি'-কে বিশেষ্য-দুই বলতে পারতাম, অর্থাৎ ভাবতে পারতাম যে ৭-এর আরম্ভে আছে ১৩।

```
১৩। (   (  সেই) (   (  বিদেশী ) (  (   (  চিঠি )))))
    ষ্য২ নি       ষ্য১ ণ          ষ্য২ ষ্য১ ষ্য
```

আশা করি ১৩ যে ভুল এটা স্পষ্ট, কেন ভুল তাও বোঝা যাচ্ছে। ১১-য় তো বলা হয় নি যে 'চিঠি' পদ টা ই নিঃশর্তে বিশেষ্য-দুই। ১১-য় 'চিঠি' পদের

গায়ের উপর যে বন্ধনী তাতে তো জাতিচিহ্ন দেওয়া আছে বিশেষ্যেরই। দু দিকে দুই বিশেষ্য-বন্ধনীর ঠিক বাইরে দু দিকে দুই বিশেষ্য-এক-বন্ধনী। এমনিতে আমরা ৫ আর ৭ থেকে জানি যে বিশেষ্যের সঙ্গে কোনো বিশেষণ থাকলে দুয়ে মিলে বিশেষ্য-এক তৈরি হয়। কিন্তু ১-এ বিশেষণ নেই। অগত্যা এখানে বলতে হচ্ছে, ১৪-র বদলে, ১৫।

১৪। বিশেষ্য+বিশেষণ=বিশেষ্য-এক

১৫। বিশেষ্য+থাকতে-পারত-বিশেষণ=বিশেষ্য-এক

এ পর্যন্ত ১১-র ($_{\text{ষ্য}^1}$ ($_{\text{ষ্য}}$ চিঠি)) এই অংশের কথা হয়েছে। ওই ($_{\text{ষ্য}^1}$)-র ঠিক বাইরেই ($_{\text{ষ্য}^2}$)।

এবার প্রশ্ন ওঠে, বিশেষ্য-দুইএর মালমসলা কী। ৭ থেকে জানি ১৬, কিন্তু এখানে বলতে হবে ১৭।

১৬। বিশেষ্য-এক+নির্দেশক=বিশেষ্য-দুই

১৭। বিশেষ্য-এক+থাকতে-পারত-নির্দেশক=বিশেষ্য-দুই

লেখার এই তিন-এর ভাগে আমরা বুঝে নিতে চেষ্টা করলাম যে বিশেষ্যের বাড় না বেড়ে উপায় নেই। বিশেষণ বা নির্দেশক সত্যি সত্যি হাজির না থাকলেও বিশেষ্যকে বিনা আভরণেই বিশেষ্য-এক হয়ে বিশেষ্য-দুই পর্যন্ত বেড়ে উঠতেই হবে, যদি সে বাক্যসমাজে বাস করতে চায়।

চার

বিশেষ্যের বাড়ের ঠিক এই এক-দুই-এর হিসেবটাই মানতে হবে এমন কোনো কথা নেই। ১৮-র কথা ভাবুন।

১৮। সেই দুটো বিদেশী চিঠি

নানারকম বিভাজন ভাবতে পারি ১৮-র।

১৯। ((সেই) ((দুটো) ((বিদেশী) (চিঠি))))

২০। (((সেই) (দুটো)) ((বিদেশী) (চিঠি)))

২১। ((সেই) (((দুটো) (বিদেশী)) (চিঠি)))

সে তর্ক এখন থাক। মোট কথা, বিশেষ্যের পুরো বাড় হয়তো দুই নয়, হয়তো তিন বা চার। পুরো-বেড়ে-ওঠা চেহারার সংখ্যাটা ঠিক কী, সেটা বড়ো কথা নয়। ও প্রশ্নটা অমীমাংসিত না রেখে উপায় নেই। ভাষা-বিজ্ঞানের বহু অমীমাংসিত প্রশ্নের এটা অন্যতম। আপাতত আমাদের কথা বলতে পারা দরকার চওড়া ক'রে মেলে ধরা বিশেষ্যের গোটা সংসারটা নিয়ে। সেজন্যে বাড়ের গোনাগুনতির প্রশ্ন মুলতুবি রেখে আমরা বলব—বিশেষ্যজোট।

২২। আশ্রয়দাতা বিশেষ্য+সবরকম আশ্রিত=বিশেষ্যজোট

ভাষাবিজ্ঞান আরো এগিয়ে গেলে জানা যাবে বিশেষ্যের পুরোপুরি বেড়ে ওঠা চেহারা বিশেষ্যজোটে তিন বাড়, না চার, না দুই, নাকি এ প্রশ্নটাই আসলে অবান্তর। এর মধ্যেই কোনো কোনো পন্ডিত বলতে শুরু করেছেন যে সংখ্যাগুলো শুধু আমাদের সুবিধের জন্যেই, ভাষাবিজ্ঞানে এ ধরনের সংখ্যার হয়তো কোনো তাত্ত্বিক গুরুত্ব নেই।

সংখ্যাগুলো আলাদা করে অর্থপূর্ণ যদি নাও হয়, এই সংখ্যানরীতির কোনো মানে আছে-কি? বিশেষ্য-জোটের ভিতরে বিভাগে বিভাগে সম্পর্ক কী ধরনের? নির্দেশক কাকে বলে? বিশেষণ আর বিশেষ্য কী যোগে যুক্ত? এ প্রশ্নগুলো যে উড়িয়ে দেওয়া যায় না একথা তাঁরাও মানেন যাঁরা এক-দুই-তিনের অঙ্কটাতে কোনো তাৎপর্য দেখতে পান না।

পাঁচ

শুধু বিশেষ্যেরই বাড় বেড়ে ওঠে না নিশ্চয়। বিশে-ষণেরও বাড়ে। 'বিদেশী'-র মতো দৃষ্টান্তের বেলায় এটা দেখানো সহজ নয়। কিন্তু যখন দেখি ২৩ বেড়ে ২৪-২৫ হল, তখন বুঝি বিশেষণও অন্য জিনিসকে আশ্রয় দিয়ে তার সঙ্গে জোট বাঁধে।

২৩। ময়লা জামা

২৪। বেশি ময়লা জামা

২৫। খুব বেশি ময়লা জামা

জাতিচিহ্ন দিলাম না। 'বেশি'-র আর 'খুব'-এর জাতি নিয়ে তর্ক আছে। হয়তো এটুকু বলা চলে যে 'ময়লা' বিশেষণটার একরকম বিশেষণ 'বেশি', যার আরেকরকম বিশেষণ 'খুব'। এটা মানলে অন্তত বন্ধনী-গুলো বসানো যায়।

২৬। (((খুব) (বেশি)) (ময়লা))

তাহলে ২৬ একটা বিশেষণজোট। আশ্রয়দাতা এখানে 'ময়লা' বিশেষণ। আর তার আশ্রিত (অপ্রধান সঙ্গী) 'খুব বেশি' নিজেও একরকম বিশেষণজোট। সেই জোটে 'খুব' আশ্রিত আর 'বেশি' আশ্রয়দাতা।

এভাবে কথা বললে আস্তে আস্তে নানারকম জোটের ভিতরে এক বিভাগের সঙ্গে অন্য বিভাগের সম্পর্ক অসম্পর্ক নিয়ে ভাবার অভ্যেস হয়। চিন্তা বিশেষ্যজোটেই আটকে থাকুক, এটা বাঞ্ছনীয় নয় নিশ্চয়। আশ্রয়দাতার সঙ্গে আশ্রিতের 'আশ্রয়' বলে যে সম্পর্ক থাকে তার গতিপ্রকৃতিই অন্বয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। জাতিনির্বিশেষে যতরকম দৃষ্টিকোণ থেকে এই সম্পর্কের যত আলাদা আলাদা চেহারা দেখতে শিখব, ততই স্পষ্টতা পাবে অন্বয়ের সংস্থান।

ছয়

ক্রিয়া তো চিনি। এবার ক্রিয়াজোটের কথা হোক। নানা কারণে সবচেয়ে স্পষ্ট দৃষ্টান্ত হল অসমাপিকা ক্রিয়াজোট।

২৭। আস্তে-আস্তে আমটা খেয়ে

আমরা ২৭-এ পাচ্ছি আশ্রয়দাতা ক্রিয়া 'খেয়ে'-কে আর তার দুই আশ্রিতকে। 'আমটা' বিশেষ্যজোট। 'আস্তে-আস্তে' একরকম বিশেষণজোট।

ক্রিয়ার আশ্রিত বিশেষ্যজোটকে ইংরেজি ব্যাকরণে অবজেক্ট বলে। ইস্কুলপাঠ্য বাঙলা ব্যাকরণের বইয়ে এর অনুবাদ করা হয় 'কর্ম'। ২৭-এর মতো দৃষ্টান্তে বলা হয় ডিরেক্ট অবজেক্ট, যার প্রতিশব্দ নাকি 'মুখ্য কর্ম'। এ পরিভাষা ভুল। প্রতিবাদ করে বদলাতে হবে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু সে প্রতিবাদ এখানে করছি না। আপা-তত কাজ চালাবার জন্যে এই প্রচলিত প্রয়োগ মেনে নিচ্ছি। একই পরিভাষা অনুসারে ২৮-এর 'ওকে'-ও কর্ম; গৌণ কর্ম। 'আমটা' ২৮-এও মুখ্য কর্ম।

২৮। ওকে আমটা দিয়ে

জানতে ইচ্ছে করে, ২৯-এ ক্রিয়ার সঙ্গে তার আশ্রিতদের সম্পর্ক কী।

২৯। ওকে বইটা ধার দিয়ে

যদি বলি 'ওকে' গৌণ কর্ম আর 'বইটা' মুখ্য কর্ম, তাহলে 'ধার' এখানে ক্রিয়ার কী হয়?

'ধার'-কে এখানে বলতে পারি ক্রিয়ার ধৃত কর্ম। অর্থাৎ ক্রিয়াটা আসলে 'দিয়ে' নয়, 'ধার দিয়ে'। 'ধার দিয়ে'-কে বলব ধারক ক্রিয়া, কারণ 'দিয়ে' যেন 'ধার' পদটাকে ধ'রে এনেছে, ধারণ করেছে।

খেয়াল করা ভালো যে 'ধার' পদটাই আছে এখানে। ২৯-এ 'ধার' বিশেষ্যমাত্র। বিশেষ্যজোট নয়। 'ওকে' আর 'বইটা' বিশেষ্যজোট। ইচ্ছে করলে বলা যেত ৩০।

৩০। ওই বিদেশী ছাত্রকে এই বাঙলা বইটা ধার দিয়ে

কিন্তু ২৯ বা ৩০-এ'ধার'-এর জায়গায় 'বিরাট ধার' বা ওরকম অন্য কিছু বলা যায় না। অথচ ৩১-৩২ তো হয়।

৩১। ওকে ধার দিয়ে

৩২। ওকে এই বিরাট ধারটা দিয়ে

তার মানে, ৩২-এ আছে 'ধার'-কেন্দ্রিক বিশেষ্য-জোট যার জোটচরিত্র ৩২-এ স্পষ্ট, ৩১-এ অপরিস্ফুট। ৩২-এ এই বিশেষ্যজোট 'দিয়ে'-র মুখ্য কর্ম। মুখ্য বা গৌণ কর্ম হতে সাধারণত বিশেষ্যজোটই পারে। (ব্যতি-ক্রম দেখবেন **সাত**-এ; ৩৫ দ্রষ্টব্য।) ২৯ আর ৩০-এ 'ধার' বিশেষ্য। বিশেষ্য পারে ধৃত কর্ম হিসেবে ধারক ক্রিয়ায় অঙ্গীভূত হতে; বিশেষ্যজোট তা পারে না। ৩১-কে দুভাবে বিশ্লেষণ করা চলে।

৩৩। ($_{\text{ক্রিয়াজোট}}$ (ওকে) (ধার) ($_{\text{ক্রি}}$ দিয়ে))

৩৪। ($_{\text{ক্রিয়াজোট}}$ (ওকে) ($_{\text{ক্রি}}$ (ধার) (দিয়ে)))

যদি ৩৩ ধরি তাহলে 'দিয়ে'-র গৌণ কর্ম 'ওকে', মুখ্য কর্ম 'ধার'। ৩৪ ধরলে 'ধার দিয়ে'-র গৌণ কর্ম 'ওকে', মুখ্য কর্ম অনুক্ত কোনো জিনিস। ৩৩-কে বাড়ালে মুখ্য কর্ম 'ধার' বেড়ে ওঠে (৩২ দ্রষ্টব্য)। ৩৪-কে বাড়ালে অনুক্ত মুখ্য কর্ম উক্ত হয় (২৯ দ্রষ্টব্য)। ৩১ 'আসলে' ৩২-এর সংকুচিত রূপ, না 'আসলে' ২৯-এর সংকুচিত রূপ—এ প্রশ্ন অর্থহীন। ৩১-কে বিশ্লেষণ করা যায় দুভাবেই। দুটো বিশ্লে-ষণই আসল।

সাত

'দিয়ে'-র মতোই দ্বিকর্মক ক্রিয়াপদ 'পাঠিয়ে'।

৩৫। ওঁকে বইটা পাঠিয়ে

৩৬। ওঁর কাছে বাচ্চাকে পাঠিয়ে

তুলনা করে মনে হয় যে মুখ্য কর্ম যথাক্রমে 'বই, বাচ্চাকে'। গৌণ কর্ম যথাক্রমে 'ওঁকে, ওঁর কাছে'। অথচ 'ওঁর কাছে' বিশেষ্যজোট নয়। অব্যয় জাতির অন্তর্গত অনুসর্গ জাতির সদস্য 'কাছে' এই জোটে প্রধান ভূমিকায় নেমেছে। 'ওঁর কাছে' অনুসর্গজোট। অনুসর্গজোটও তাহলে অবশ্যবিশেষ গৌণ কর্ম হতে পারে। অনুসর্গজোট আর কী পারে?

৩৭। একটা ডাকঘর স্টেশনের কাছে ছিল

'স্টেশনের কাছে' অনুসর্গজোটটা ৩৭-এ নিশ্চয় ক্রিয়ার গৌণ কর্ম নয়। অথচ কর্মের সঙ্গে এর একটা মিল এই যে 'ছিল'-র অর্থটা পূর্ণতা পায় 'স্টেশনের কাছে' জোটের অর্থের সঙ্গে মিলে। ঠিক যেমন সকর্মক ক্রিয়ার অর্থ তার কর্মের অর্থের সঙ্গে মিলে পূর্ণতা পায়। তাই বলব, ৩৭-এ 'ছিল' ক্রিয়ার পূরক 'স্টেশনের কাছে' অনুসর্গজোট। সে এই ক্রিয়াকে পূরণ করে বলব।

মুখ্য কর্ম আর গৌণ কর্মও ক্রিয়ার পূরক। কর্ম আর অন্য পূরকের তফাত কী? বলতে লোভ হয়, ক্রিয়ার যে পূরক বিশেষ্যজোট তাকে কর্ম বলে। এ কথা বলা যায় না নানা কারণে।

একটা কারণ তো স্পষ্ট। ৩৬-এ 'ওঁর কাছে'-র মতো অনুসর্গজোট যদি গৌণ কর্ম হতে পারে তাহলে কী ক'রে বলি সব কর্মই বিশেষ্যজোট?

দ্বিতীয়ত, ৩৮-৩৯ বিবেচ্য।

৩৮। রাম ক্ষমতাশালী ছিল

৩৯। রাম নেতা ছিল

'ছিল'-র পূরক বলব 'ক্ষমতাশালী'-কেও, 'নেতা'-কেও। 'ক্ষমতাশালী' বিশেষণজোট। 'নেতা' বিশেষ্য-জোট। 'নেতা' ক্রিয়ার পূরক তথা বিশেষ্যজোট ব'লে তাকে কর্ম ভাবা উচিত এমন কেউ বলবে না।

তাহলে, ক্রিয়ার সব কর্মই বিশেষ্যজোট, এমন নয়। ক্রিয়ার পূরক যেকোনো বিশেষ্যজোটই কর্ম, এমন নয়। কর্ম তাহলে কী?

কর্ম ক্রিয়ার এমন পূরক যা নিজের ঠিক-ঠিক অর্থ বজায় রেখে বর্ধক হতে পারত না। এ কথা বুঝতে হলে জেনে নেওয়া দরকার বর্ধক কী জিনিস। জেনে নিয়ে ফিরে আসতে হবে ৩৫-৩৯-এর কথায়।

আট

বর্ধকের কাজ বর্ধন। এর সবচেয়ে চেনা দৃষ্টান্ত—

৪০। ভালো লোক

এখানে 'লোক' বিশেষ্যকে বর্ধন করছে 'ভালো' বিশেষণজোট। বর্ধন করাকে অনেকে এ ধরনের দৃষ্টান্তে বলেন বিশেষিত করা। কিন্তু বিশেষিত করা বললে মনে হয় এটা শুধু বিশেষণজোটেরই কাজ। অথচ অনুসর্গজোটও এ কাজটা করে।

৪১। ডাকঘরের কাছে রাম শ্যামকে ব্যাগটা দিল

'ডাকঘরের কাছে' অনুসর্গজোটটা তো ৪১-এ বর্ধক (কাঁসের বর্ধক—'দিল'-র? 'শ্যামকে ব্যাগটা দিল'র? 'রাম শ্যামকে ব্যাগটা দিল'-র? সেটা তর্কসাপেক্ষ)। তাই বলে তাকে বিশেষণজোট বলার কোনো মানে হয় না। 'কাছে' বিশেষণ নয়, অনুসর্গই। অনুসর্গজোটও বিশেষিত করতে পারে, এ কথা বলতে হলে অসুবিধে। তাই বিশেষিত করা না বলে বলছি বর্ধন করা। বিশে-ষণ বা অনুসর্গ হল জাতির নাম। বর্ধক একটা ভূমিকার নাম। সেই ভূমিকা পালন করাকে বর্ধন করা বলছি। বর্ধন করাকে বিশেষিত করা বললে জাতির সঙ্গে ভূমিকা গুলিয়ে যাবে। জাতি আর ভূমিকার এটুকু সম্পর্ক রয়েছে যে বিশেষণজোট জাতটাই বর্ধক জাত। কিন্তু বর্ধকমাত্রেই বিশেষণজোট নয়। অনুসর্গজোটও বর্ধন করতে পারে, যেমন ৪১-এ। তাই জাতি আর ভূমিকার ধারণা আলাদা রাখা দরকার।

বিশেষণজোট যে সবসময় একইভাবে বর্ধন করে তা নয়।

৪০। ভালো লোক

৩৮। রাম ক্ষমতাশালী ছিল

'লোক' বিশেষ্যকে 'ভালো' বিশেষণজোট সরাসরি বর্ধন করছে ৪০-এ। এরকম বর্ধককে বলব প্রত্যক্ষ বর্ধক।

কিন্তু ৩৮-এ 'ক্ষমতাশালী' বিশেষণজোট 'ছিল' ক্রিয়ার পূরক। 'ছিল' সকর্মক ক্রিয়া নয়, মধ্যস্থ ক্রিয়া।

ওর কাজই বর্ধক 'ক্ষমতাশালী' আর বর্ধিত 'রাম'-এর মধ্যে মধ্যস্থতা করা। মধ্যস্থ ক্রিয়া 'ছিল'-র পূরক হিসেবে 'ক্ষমতাশালী' বর্ধন করছে 'রাম'-কে। এরকম বর্ধককে বলব পরোক্ষ বর্ধক।

নয়

এবার ফিরি ৩৫-৩৯-এর কথায়।

৩৫। ওঁকে বই পাঠিয়ে

৩৬। ওঁর কাছে বাচ্চাকে পাঠিয়ে

৩৭। একটা ডাকঘর স্টেশনের কাছে ছিল

৩৮। রাম ক্ষমতাশালী ছিল

৩৯। রাম নেতা ছিল

আলোচনা হচ্ছিল কর্ম কী তাই নিয়ে। বলা হয়েছিল কর্ম ক্রিয়ার এমন পূরক যা নিজের ঠিক যে মানে সেটা বজায় রেখে বর্ধক হতে পারত না। উদাহরণ-গুলোতে 'ওঁকে, বই, ওঁর কাছে, বাচ্চাকে' কর্ম। 'স্টেশনের কাছে, ক্ষমতাশালী, নেতা' কর্ম নয়। কেন?

বোঝা গেল যে ৩৮-এ 'ক্ষমতাশালী' পরোক্ষ বর্ধক। কাজেই ৩৯-এ 'নেতা' যে পরোক্ষ বর্ধক হবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। 'নেতা' বিশেষ্যজোট, তাতে কী হয়েছে? ৩৮-এর সঙ্গে 'রাম ক্ষমতাশালী মানুষ ছিল'-র তো বেশি তফাত হবার কথা নয়। নেতা তো একরকম ক্ষমতাশালী মানুষই।

৩৭-এ 'ছিল'-র পূরক অনুসর্গজোট কাজ করছে বর্ধক হিসেবে। (কাঁসের বর্ধক তা নিয়ে তর্ক তোলা যায়। যে মীমাংসাই হোক, বর্তমান আলোচনার সিদ্ধান্ত অক্ষুণ্ণ থাকবে।)

৩৭-৩৯-এর বর্ধকগুলোর ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে। ৩৫ আর ৩৬-এর কর্মগুলোর কথায় আসি এবার। ৩৫-এর 'ওঁকে, বই' আর ৩৬-এর 'বাচ্চাকে' যে কোনো-মতেই বর্ধকের কাজ করতে পারত না এটা (ধরে নিচ্ছি) স্পষ্ট। প্রশ্ন ওঠে ৩৬-এর 'ওঁর কাছে' নিয়ে। কেউ ভাবতে পারেন, এটা তো অর্থ বজায় রেখে বর্ধক হতেও পারত।

৪২। ওঁর কাছে বাচ্চারা ভালো থাকে

৪৩। ওখানে বাচ্চারা ভালো থাকে

মনে তো হচ্ছে ৪২ আর ৪৩-এ যথাক্রমে 'ওঁর কাছে' আর 'ওখানে' বর্ধকের কাজ করছে (কাঁসের বর্ধক সেটা যথারীতি তর্কসংকুল)। তাহলে কেন ৩৬-এর 'ওঁর কাছে'-কে কর্ম বলব?

এইজন্যে যে ৩৬-এর 'ওঁর কাছে' আর ৪২-এর 'ওঁর কাছে' ঠিক সমার্থক নয়।

৩৬। ওঁর কাছে বাচ্চাকে পাঠিয়ে

৩৭। ওঁকে বইটা পাঠিয়ে

৪৪। ওখানে বাচ্চাকে পাঠিয়ে

ইচ্ছে করেই ৩৬-এর কথা তুলেছিলাম ৩৫-এর অনুষঙ্গে। ৩৬-কে ৩৫-এর মতোও ভাবা চলে, ৪৪-এর মতো ভাবাও অসম্ভব নয়। কিন্তু ৪২-কে আমরা ৪৩-এরই অনুরূপ বলতে বাধ্য। 'ওঁকে বাচ্চারা ভালো থাকে' বলা চলে না। তাই ৪২-এর 'ওঁর কাছে'-টা কর্ম নয়। কিন্তু ৩৬-এর 'ওঁর কাছে'-র যেন দুটো মুখ আছে। একটা মুখ ৩৫-এর 'ওঁকে'-র মতো। সেটা তার 'কর্ম' মুখ। অন্য মুখটা ৪৪-এর 'ওখানে'-র মতো। সেটা তার 'অকর্ম পূরক' মুখ।

৩৬-এর দুমুখো 'ওঁর কাছে'-র সঙ্গে তাই ৪২-এর একাগ্র 'ওঁর কাছে' তুলনীয় নয়। ৩৫-এর খাতিরে ৩৬-এর 'ওঁর কাছে'-কে কর্ম ভাবা চলে। ৪২-এ কোনোমতেই তা চলে না। এবং ৩৬-এ যখন ৪৪-এর ছায়া পড়ে তখন ৩৬-এর 'ওঁর কাছে'-টাও অকর্ম হয়ে যায়। ৪৪-এর 'ওখানে'-কে কর্ম ভাবতে রাজি হওয়া কঠিন। যে পরিমাণে ৩৬-এর 'ওঁর কাছে' ৪৪-এর 'ওখানে'-র মতো, সেই পরিমাণে এই 'ওঁর কাছে'-টাও তাই অকর্ম পূরক।

তাহলে ৩৬ দ্বিধাজড়িত। এখানে 'ওঁর কাছে' অর্ধ-মনস্ক কর্ম। সেই পর্যন্ত কর্ম যে পর্যন্ত ৩৫-এর সঙ্গে ৩৬-এর মিল অনুভব করা যায়।

কিন্তু ৪৫ দ্বিধাহীন।

৪৫। ওঁর কাছে বাচ্চাকে রেখে এসে

এখানে কোনো ৩৫-এর ছায়া পড়ে নি। আমরা বলি না 'ওঁকে বই রেখে এসে'। 'ওঁর কাছে' যে ৪৫-এ অকর্ম পূরক এ ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই।

৩৬-এ অনুসর্গজোট যে কর্ম হতে পেরেছে এটা তাহলে ৩৫-এরই প্রভাব যেন। এ কথাটাকে হয়তো স্বীকৃতি দেওয়া উচিত তত্ত্বেও। তাহলে বলি, ক্রিয়ার

যে পূরক বিশেষ্যজোট, যার জায়গায় বিশেষণজোট বসতে পারে না (এটা বলার ফলে ৩৯-এর 'নেতা' যে কর্ম নয় এটা স্পষ্ট হল—ওর জায়গা নিয়েছে বিশেষণ-জোট, ৩৮-এ), সেই পূরক তার ক্রিয়ার 'আসল কর্ম'। তবে, ক্রিয়ার পূরক অনুসর্গজোটকে 'নকল কর্ম' ভাবতে পারি এমন বাক্যে যেখানে মনে হচ্ছে ওর জায়-গায় আসল কর্মও বসতে পারত। ৩৬-এর অনুসর্গ-জোট ৩৫-এর সুবাদে নকল কর্ম। যাঁদের পরিভাষায় আসল-নকলের মতো শব্দ চলে না তাঁরা প্রকৃত কর্ম আর কৃত্রিম কর্ম বলতে পারেন।

কর্মের তাহলে দুটো সংজ্ঞার্থ পেলাম।

৪৬। কর্ম হল ক্রিয়ার এমন পূরক যা নিজের অর্থ বজায় রেখে বর্ধক হতে পারত না

৪৭। কর্ম হল ক্রিয়ার এমন পূরক যা (ক) হয় নিজে এমন বিশেষ্যজোট যার জায়গায় বিশেষণজোট বসতে পারে না, (খ) নয়তো এমন অনুসর্গজোট যার জায়গায় ৪৭ (ক)-মাফিক কর্ম বসতে পারে

যেসব দৃষ্টান্ত দেখেছি তাতে তো মনে হচ্ছে ৪৬ আর ৪৭ সমান। ভাষাবিজ্ঞানে এ ধরনের মনে হওয়া অবশ্য মাঝে-মাঝেই ফুটো হয়ে যায়। তবু আপাতত ৪৬ আর ৪৭-এর যে সমীকরণ বিশ্বাস্য ঠেকছে সেটাকে গোয়েন্দাগিরির সূত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ৪৬ যদি ৪৭-এর সমান হয় তাহলে কেন সমান? এ প্রশ্ন ভবিষ্যৎ অনুসন্ধানের জন্যে রইল। সে অনুসন্ধানে নিশ্চয় দামি দামি খবরই বেরোবে, ৪৬ আর ৪৭-এর সমীকরণে যদি আসলে কোনো গলদ রয়ে গিয়ে থাকে তাহলেও।

দশ

প্রবন্ধের **চার** অংশের শেষে প্রশ্ন তুলেছিলাম, বাড়ের সংখ্যানরীতির কোনো মানে আছে কি? বিশেষ্যজোটের ভিতরে বিভাগে বিভাগে সম্পর্ক কী ধরনের? নির্দেশক কাকে বলে? বিশেষণ আর বিশেষ্য কী যোগে যুক্ত?

তার পর সরে গেছিলাম অবিশেষ্য নানা জোটের অন্দরমহলে। সে অনুসন্ধানের তাগিদে একপলক তাকিয়ে নিতে হয়েছিল বিশেষণজোট আর বিশেষ্য যে যোগে যুক্ত সেই বর্ধনের দিকেও, **আট**-এ। বাকি প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে কিছু প্রস্তুতিও হয়েছে। এবার মীমাং-সার দিকে এগোনো যাক। সাময়িক সমাধান পেলেও একরকম তৃপ্তি হয়।

এক জোটের আশ্রয়দাতা বা প্রধান সদস্যের সঙ্গে আশ্রিতদের ঘনিষ্ঠতার মাত্রার হিসেব রাখে বাড়ের সংখ্যান। যখন বলি (সেই (বিদেশী চিঠি)) তখন জানাই যে 'চিঠি'-র ঘনিষ্ঠতম যোগ 'বিদেশী'-র সঙ্গে। 'সেই' নির্দেশকটার সঙ্গে অন্বয় তাহলে স্বয়ং 'চিঠি'-র নয়, 'বিদেশী চিঠি' এই বিশেষ্য-একের।

নির্দেশক কাকে বলে? 'এই ওই সেই যে কোন' আর হয়তো 'কোনো'—এসব শব্দ নির্দেশক। অঙ্গুলি-নির্দেশের মতো কাজ করে। 'এই ওই' সোজাসুজি দেখিয়েই দেয়, 'এই বই' আমার বা আমাদের দিকের, 'ওই বই' তোমার বা তোমাদের দিকের। ('এ বই ও বই'-ও হয়। 'এই ওই' কীসে 'এ ও' থেকে আলাদা সে আলোচনা এ লেখায়, বা **এই** লেখায়, হবে না।) 'যে' আর 'সেই' পরস্পরসম্পৃক্ত। 'যে বন্ধু কাল এসেছিল সেই বন্ধু' বললে দেখতে পাই কীভাবে পরস্পরের দিকে সংকেত করে এ দুই নির্দেশক। 'কোনো' সংকেত করে কোনোকিছুর দিকে, 'কোন' সংকেত করে হয়তো-কিছু-না-এর দিকে।

আমরা যে 'বিদেশী সেই চিঠি' না বলে 'সেই বিদেশী চিঠি' বলি এর কারণ বোধহয় এই যে বিশেষ্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বর্ধকেরই, এবং বর্ধিত বিশেষ্য অর্থাৎ গোটা বিশেষ্য-এক অপেক্ষা করে নির্দেশকের জন্যে।

কিন্তু কখনো কখনো এর ব্যত্যয় হয়। বিশেষ করে কবিতায় পাই 'অচেনা কোন ক্ষণিক ফুল'-এর মতো শব্দবন্ধ। এখানে 'অচেনা' বিশেষণজোট 'কোন' নির্দেশকের বাঁ দিকে নেমেছে কোন ভূমিকায়? বর্ধকের ভূমিকায় কি?

এগারো

নির্দেশক বাঁ দিকে বিশেষ্যজোটের কী ধরনের সদস্য বসতে পারে?

৪৮। ফল কাটার ওই ছুরি

৪৯। যে ছুরি দিয়ে ফল কাটে সেই ছুরি

৫০। আমার এ পথ

৫১। নাম-না-জানা কোন কুঁড়ি

৫২। পুরানো সেই দিন

সম্বন্ধপদ 'আমার' পাচ্ছি ৫০-এ। আমরা এখন জানি যে ওটা নিছক পদ নয়, তাই বলব সম্বন্ধী জোট। 'র'-বিভক্তি যদি সম্বন্ধের সূচক হয় তাহলে ৪৮-এ 'ফল কাটার'-ও সম্বন্ধী জোট। ৪৯-এর 'যে ছুরি দিয়ে ফল কাটে'-ও তাহলে তুলনীয়, এটাকে বলব সম্বন্ধী অঙ্গবাক্য। ৫১-কে ভাবতে পারি 'যার নাম জানি না এমন কোন কুঁড়ি', তাহলে 'নাম-না-জানা'-ও একরকম সম্বন্ধী। ৫২-তেও 'সেকালের সেই দিন'-এর অনুষঙ্গ আসে, তাই 'পুরানো' এখানে সম্বন্ধী বলে গণ্য।

বড়োজোর ৫১ আর ৫২-য় বলা যেতে পারে যে বিশেষণজোট রয়েছে সম্বন্ধীর বেশে, নকল সম্বন্ধী। বাকিগুলো আসল সম্বন্ধী অঙ্গবাক্য (৪৯) বা আসল সম্বন্ধী বিশেষ্যজোট (৪৮, ৫০)। সম্বন্ধ বেঁধে দেয় বিশেষ্যজোটের বেলায় 'র'-বিভক্তি আর অঙ্গবাক্যের বেলায় সম্বন্ধসূচক নির্দেশক 'যে'।

প্রশ্ন তুলতে পারেন, ৪৮-এ 'কাটা' তো ক্রিয়া, 'ফল কাটার'-কে নিছক বিশেষ্যজোট বলা হচ্ছে কেন।

আমি নিছক বলি নি। এও বলি নি যে 'কাটা' ক্রিয়া নয়। বিষয়টা নিয়ে কথা বাড়াচ্ছি না, তার কারণ, অ-নিছক বিশেষ্যজোটে ক্রিয়া কীভাবে কাজ করে এ প্রশ্ন এখনও বিচারাধীন; গবেষণা করছেন মীনা দে।

অনুসর্গজোট যথারীতি মুশকিল বাধায়।

৫৩। টেবিলের ওপরের লেখাটা

৫৪। ভাষাবিজ্ঞানের ওপর লেখাটা

মেরেকেটে সম্বন্ধী বলা যায় এদেরও। কিছু সম্বন্ধ-স্থাপক 'র'-বিভক্তি কেন ৫৩-য় আছে ৫৪-য় নেই তা বলা যাচ্ছে না।

নির্দেশকের বাঁ দিকের সব জিনিসকে সম্বন্ধী বল-লেই তাদের সব কথা বলা হয় না। সম্বন্ধীরা সবাই সমান নয়।

৫৫। যে ছুরি দিয়ে ফল কাটি আমার সেই ছুরি

দেখাই যাচ্ছে যে ৫৫-র সম্বন্ধী অঙ্গবাক্য আর সম্বন্ধী বিশেষ্যজোট পাশাপাশি বসতে পারে।

৫৬। ভাষাবিজ্ঞানের ওপর আমার লেখাটা

৫৭। টেবিলের ওপরের আমার লেখাটা

আমরা ৫৬ বলি, ৫৭ বলি না। তার মানে কি এই যে ৫৩-য় 'টেবিলের ওপরের' আসল সম্বন্ধী বিশেষ্য-জোটের মতো ব্যবহার করছে কিন্তু ৫৪-য় 'ভাষা-বিজ্ঞানের ওপর'-এর ব্যবহার সম্বন্ধী অঙ্গবাক্যের মতো? না, অত সহজ খেলা নয় এটা।

৫৮। আমার এই ভাষাবিজ্ঞানের ওপর লেখাটা

৫৯। আমার এই টেবিলের ওপরের লেখাটা

৬০। আমার এই ফল কাটার ছুরিটা

যে অর্থে ৫৯-৬০ পড়ে মনে হয় যে 'আমার টেবিল, আমার ফল' নিয়ে কথা হচ্ছে (৫৮-য় 'আমার ভাষা-বিজ্ঞান' ভাবা একটু শক্ত) সে অর্থটা সরিয়ে রেখে 'আমার এই লেখা' বা 'আমার এই ছুরি' অর্থেই ৫৮-৬০-এর কথা ভাবুন। 'এই' বাদ দিয়েও ৫৮-৬০ বলা যেত। কিন্তু নির্দেশক থাকায় স্পষ্ট হচ্ছে যে কোনো কোনো সম্বন্ধীজোট বর্ধকের ভূমিকায় নামতে জানে। এবং এসব জোট নির্দেশকের ডান দিকে এলে ৫৩ আর ৫৪-র তফাত ঘুচে যায়। বর্ধকের ভূমিকায় কিন্তু সম্বন্ধী অঙ্গবাক্য নামতে চায় না; অসম্ভব ৬১ বা এমনকি অস্বস্তিকর ৬২ না বলে ৬৩-ই বলি।

৬১। আমার সেই রাম যেটা পছন্দ করে ছুরিটা

৬২। আমার রাম যেটা পছন্দ করে সেই ছুরিটা

৬৩। রাম যেটা পছন্দ করে আমার সেই ছুরিটা

নিশ্চয় ৬১-র দুর্দশার কারণ এ নয় যে বাঙলায় 'যে' বাঁ দিকে আর 'সেই' ডান দিকে বসতে বাধ্য। 'আমি সেই ছুরিটাই নেব যেটা রাম পছন্দ করে' বলতে অসুবিধে হয় না, অথচ এখানে 'সেই' বসেছে 'যে'-র বাঁ দিকে। ৬১ অসম্ভব এইজন্যে যে বিশেষ্যের বর্ধক হিসেবে, নির্দেশকের ঠিক পরে, সম্বন্ধী অঙ্গবাক্য বসে না। কাজেই ৫৩ আর ৫৪-র ব্যাখ্যা এই নয় যে ৫৪-র অনুসর্গজোটের সঙ্গে সম্বন্ধী অঙ্গবাক্যের মিল আছে। অবৈধ ৬১ তো বৈধ ৫৮-রই আদলে গড়া—তফাত এটুকুই যে ৫৮-য় আছে অনুসর্গজোট, আর ৬১-তে অঙ্গবাক্য।

৬২-র চেয়ে ৬৩ যে শুনতে স্বাভাবিক বেশি, এ থেকে বোঝা যায় যে সম্বন্ধী অঙ্গবাক্য বিশেষ্যজোটের

একেবারে বাঁ ধার ঘেঁষে থাকতে চায়। বেরিয়ে যেতে পারলেই যেন বাঁচে। সত্যিই বেরিয়ে যায়ও।

৬৪। রাম যে ছুরিটা পছন্দ করে আজকে আমি সেই ছুরিটা বার করব

স্পষ্টতই ৬৪-তে সম্বন্ধী অঙ্গবাক্য আর 'ছুরি'-কেন্দ্রিক বিশেষ্যজোটের সদস্য হয়ে নেই। বাইরে বসে আছে। বসে থাকতেই হয় যদি একসম্বন্ধী না হয়ে অঙ্গবাক্য অনেকসম্বন্ধী হয়।

৬৫। যে যাকে যা দিতে চায় সে তাকে তা দিতে পারে কি?

এখানে তিনটে সম্বন্ধ স্থাপন করতে হচ্ছে—যে-সে, যাকে-তাকে, যা-তা। ফলে 'যে যাকে যা দিতে চায়' অঙ্গবাক্যটার পক্ষে কোনো একটা বিশেষ্যজোটের সদস্যতা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাকে নিরপেক্ষভাবে বসে থাকতে হবে 'সে, তাকে, তা' এই সব-কটা বিশেষ্য-জোটের বাইরে।

'রাম যেটা পছন্দ করে' এই একসম্বন্ধী অঙ্গবাক্য ৬৩-তে যে দয়া করে বিশেষ্যজোটে আদৌ শামিল হয়েছে এটাই ভালো। বাইরে বসে থাকতেও পারত। ভিতরে এসে বসতে হবে এ আবদার যে চলবে না, সেটা স্পষ্ট হয় ৬১-৬২-র অবৈধতায়।

বারো

বিশেষ্যজোটের নির্দেশকপূর্ববর্তী অঞ্চলে তাহলে সম্বন্ধীরা বসে। অর্থাৎ ওটা বহির্বাণিজ্যের জায়গা। 'অচেনা কোন ক্ষণিক ফুলে' যদি বলি, 'ক্ষণিক' সেখানে 'ফুলে'-এর নিজস্ব বর্ধক, আর 'অচেনা' একরকম বাইরের কথা, সম্বন্ধী—যেন বললাম 'যাকে চিনি না এমন কোন ক্ষণিক ফুলে'।

৫৮-৬০-এ দেখিয়েছি যে নির্দেশক ডিঙিয়ে চলে এসে বর্ধকের ভূমিকায় নামতে পারে কোনো কোনো অপেক্ষাকৃত হালকা ওজনের সম্বন্ধী। তাদের এ প্রবেশাধিকার নিমন্ত্রণসাপেক্ষ। কেবল হালকা সম্বন্ধী-দেরই নিমন্ত্রণ করা যায়। ৬৬-র মতো ৬৭ হয়। কিন্তু ৬৮-র চেয়ে ৬৯-ই বেশি স্বাভাবিক শুনতে (যদি না পিন্টু আর রিংকু 'তোমার' হয়)।

৬৬। তোমার এই উপভোগ্য গল্প

৬৭। তোমার এই মনভোলানো গল্প

৬৮। তোমার এই পিন্টু আর রিংকুর মন-ভোলানো গল্প

৬৯। পিন্টু আর রিংকুর মন-ভোলানো তোমার এই গল্প

কোনো জোট নির্দেশকের আগে বসল না পরে বসল তাতে মানে-র তফাত হয়।

৭০। হারানো সেই গ্রাম্য বাঁশি

৭১। সেই হারানো গ্রাম্য বাঁশি

বাড়ের অঙ্কে বলে, ৭০-এ 'হারানো' বিশেষ্য-তিনের সদস্য, বহিরঙ্গ। ৭১-এ 'হারানো' বিশেষ্য-একের সদস্য, অন্তরঙ্গ।

৭২ ক। (হারানো (সেই (গ্রাম্য (বাঁশি))))
স্থ৩ স্থ২ স্থ১ স্থ

খ। ((সেই (হারানো গ্রাম (বাঁশি))))
স্থ৩ স্থ২ স্থ১ স্থ

হতে পারে যে ৭২খ ৭০-এর নির্ভুল ছবি নয়। তাহলেও মোদ্দা কথাটা বোধহয় ঠিক। বিশেষ্যজোটে সদর অন্দর আছে। নির্দেশকের বাঁ দিকে সদর এলাকা, ডান দিকে অন্দরমহল।

এ কথাটা আরো স্পষ্ট হয় যদি বিশেষ্যজোটের অন্তর্গত নির্দেশকপূর্ববর্তী জোটকে সম্বন্ধী না বলে সরাসরি বলি বহিরঙ্গ বর্ধক, আর এতক্ষণ যাদের শুধু বর্ধক বলছিলাম তাদের বলি অন্তরঙ্গ বর্ধক। এটা বললেই প্রশ্ন উঠবে প্রত্যক্ষ বহিরঙ্গ বর্ধক ছাড়া পরোক্ষ বহিরঙ্গ বর্ধকও হয় কিনা। ক্ষেত্রবিশেষে হয়—

৭৩ক। আমার ওই ছাতাটা
খ। ওই ছাতাটা আমার ছিল

৭৪ক। ফল কাটার এই ছুরিটা
খ। এই ছুরিটা ফল কাটার নয়

কিন্তু সম্বন্ধী অঙ্গবাক্য এর ব্যতিক্রম। ৭৫খ হওয়া সত্ত্বেও ৭৬খ হয় না।

৭৫ক। আমার পড়া বই
খ। বইগুলো আমার পড়া ছিল

৭৬ক। আমি যেসব বই পড়েছি সে বইগুলো
খ। বইগুলো আমি-যেসব-বই-পড়েছি ছিল

অর্থাৎ বিশেষ্যজোটের সঙ্গে সম্বন্ধী অঙ্গবাক্য যেভাবে সম্বন্ধ পাতায় সেটা সত্যিই খুব বাইরে থেকে। বর্ধক-বর্ধিত-সম্বন্ধ বলে ভাবাটা হয়তো বাড়াবাড়ি। তবু আপাতত কাজ চালাবার জন্যে বলব যে সম্বন্ধী অঙ্গবাক্যও বিশেষ্যজোটে একরকম বহিরঙ্গ বর্ধকের ভূমিকায় নামতে পারে। কথাটা ভুল হতে পারে জেনেও বলছি। এর চেয়ে নির্ভুল কী বলা যায় সে বিষয়ে নাকি অ্যালেক ম্যারান্ট্স্ গবেষণা করছেন।

তেরো

বাড়ের বর্তমান তত্ত্বের জন্যে বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী চমস্কি দায়ী। তবে তাঁর একটা স্বপ্ন ছিল যার সঙ্গে বাস্তবকে মেলানো যাচ্ছে না। তাঁর স্বপ্ন ছিল, জাতি-নির্বিশেষে বাড়ের সমান্তরাল অঙ্ক বেরোবে। হয়তো বেরোবে যে বিশেষ্যেরও পূরক থাকে, ক্রিয়ার মতো (৫৮-র অনুসর্গজোট কি পূরক?), এবং ক্রিয়ারও নির্দেশক থাকে বিশেষ্যের মতো (কালবিভক্তি কি নির্দেশক?)। তাহলে হয়তো বলা যাবে : আশ্রয়দাতা ('শ্র')+পূরক=শ্র-এক ; শ্র-এক+অন্তরঙ্গ বর্ধক= শ্র-দুই ; শ্র-দুই+নির্দেশক=শ্র-তিন ; শ্র-তিন+বহিরঙ্গ বর্ধক=শ্র-চার। জাতিনির্বিশেষে, শ্র (আশ্রয়দাতা) যাই হোক না কেন—বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, এমনকি অনুসর্গ। যেকোনো জোটে আশ্রয়ের একই গণিত হবে। যেকোনো আশ্রয়দাতার আশ্রিত থাকবে চাররকম —পূরক, অন্তর্বর্ধক, নির্দেশক, বহির্বর্ধক।

চমস্কি ১৯৬৭ সালে ঠিক এই পরিস্ফুটন দেন নি। তাঁর তখনকার অন্য কাজের তাড়াও ছিল, ইংরেজির নিজের তাগিদও ছিল। অনেকের কাজের আলোয় অনুবাদ ক'রে বলছি তাঁর স্বপ্নের কথা।

এ স্বপ্ন আজ হয়ে আসে দূরস্মৃত কাহিনী কেবলই'। বিশেষ্যের অন্তত কর্ম থাকে বলে মনে হচ্ছে না, যদিও পূরক থাকতেও পারে। অনুসর্গের খুব সম্ভব নির্দেশক বা বহির্বর্ধক নেই। জাতির তফাতে মানে আলাদা হয়ে যায় বলে একেকটা জাতির সম্পর্ক পাতানোর ধরনে নিজস্বতা থাকে। সেগুলো পার হয়ে জাতিনিরপেক্ষ কোনো অভিন্ন বাড়ের তত্ত্বে উপনীত হতে পারার আশা কম।

তবে 'আন্তর্জাতীয়' আলোচনা চলতেই পারে। এক জাতির বেলায় যা স্পষ্ট তা বুঝে নিলে অন্য জাতির রহস্য ভেদ করতে সুবিধে হতেই পারে। বর্ধক থাকে সব জাতিরই। হয়তো পূরকও থাকে। কালবিভক্তিকে ক্রিয়ার নির্দেশক বলে ভাবতে শিখলে লাভ হওয়া অসম্ভব নয়।

বাক্যের উদ্দেশ্য ক্রিয়ার আশ্রয়প্রার্থী কিনা এরকম কিছু মৌলিক প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত বলে এই উপস্থাপনে অনেক কথা ঝাপসা রাখতে বাধ্য হলাম। কিন্তু বাড়ের অঙ্কে সামগ্রিক নীতি আর আশ্রয়দানের প্রকারভেদ—এই সমগ্রতা আর এই বিশেষত্ববহুল সূক্ষ্মতার জগৎ এখনকার ভাষাজিজ্ঞাসার অন্যতম প্রধান কৌতূহলের বিষয়। বাড়ের অঙ্ক বিভাজনতত্ত্বের অন্তর্গত। আশ্রিতদের বিভিন্ন ভূমিকা সম্পর্কতত্ত্বের ব্যাপার। অন্বয় এই দু দিক সামলে চলবার চেষ্টা করে। বাড়ের অঙ্ক যদি ঠিকমতো কষতে নাও পারি, অন্তত কষতে পারছি ভাবলে যেসব প্রশ্ন তুলি সেগুলোও অনেক সময় আমাদের ঠিক পথে ঠেলে দেয়।

বাড়ের তত্ত্বে মোট কথাটা তো এই যে অন্তরঙ্গ আশ্রিতের সঙ্গে মিলে আশ্রয়দাতা যে ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠী রচনা করেছে সেই গোষ্ঠীর সঙ্গেই কম-অন্তরঙ্গ আশ্রিতের দেখা হয়, সরাসরি আশ্রয়দাতার সঙ্গে হয় না। অর্থাৎ সম্পর্কস্থাপন ঘটলে সত্যিই একটা কিছু গঠিত হয়, বস্তুর মতো ঘন। এই অন্তর্দৃষ্টির যদি মুখরক্ষা হয় তাহলে বাড়ের অঙ্কের খোলস ফেলে দিলেও এই তত্ত্ব অবলম্বনে যে গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে তার মূল দৃষ্টিটা ভাষাবিজ্ঞানে রয়ে যাবে—হয়তো একেবারে-পালটে-যাওয়া চেহারায়।

চিত্তবনে বাঁশি বাজে

মাফরুহা চৌধুরী

পথটায় এসে দাঁড়াল নাসিম। রঙের ভেতরে তুলি চুবিয়ে বোলাতে লাগল এখানে ওখানে। ভালো করে দেখল এবার—ঠিক যেন সেই পথ, পাশে যার একটি পুকুর। কিছুদূরে এগিয়ে চৌধুরীদের বাগান, আরো এগোলে খেলার মাঠ! যে মাঠে সারা বছর খেলার পর্ব লেগেই থাকে! ফুটবল, ফুটবলের পর ভলিবল, ক্রিকেট, হকি, ব্যাডমিন্টন, একধারে বাস্কেট বল—এমনকি হাডুডু, দাড়িয়াবান্দা—সবরকম।

মাঠের এককোণে ছোট্ট একটি মসজিদ। মসজিদটি আছে বলেই ঈদের সময় এই মাঠে ঈদের জামাত হয়। চৌকোনা মাঠটিকে দুটি ত্রিভুজে ভাগ করে ফেলেছে একটি পায়ে-চলা পথ। জ্যামিতিক বিভাজনক্ষমতা মানুষের কিছুটা সহজাত হয়তো।

সিঁথির মতো এই পথ চলে গেছে মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তের গেট পর্যন্ত। এদিক দিয়ে নাসিম হাটে গেছে বাবার হাত ধরে। প্রায়ই তেমনি কোনো পথ-ঘাট-মাঠ দেখলে ও দাঁড়িয়ে যায়, রঙ লাগিয়ে চেহারা ফিরিয়ে নেয়। ফুটিয়ে তোলে পূর্বস্মৃতিটি।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার শেষ মাথায় বাবার অফিস। ওখানে ভোজ্যতেল ইত্যাদি পরীক্ষা হয়। পরীক্ষার জন্যে যে তেল আসে, তার অবশিষ্ট তেল বাবারা ভাগ করে নেয় কজন মিলে। টেস্টের জন্যে সামান্য একটু তেলের প্রয়োজন। বাকি তেলের পেটমোটা বোতলের গলা হাত বাড়ালেই ধরা যায়। চক্ষুলজ্জা ছেড়ে আর সবার সঙ্গে বাবাও হাত বাড়ায়।

একদিন শুধু সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে রাস্তাটি চিনিয়ে দিয়েছিল ওকে। তারপর থেকে একা-একা প্রায়ই গেছে। মাঠের সিঁথিপথ পার হয়ে গেট। গেট পেরিয়ে সরু কাঁচা রাস্তা। কাঁচা খোয়া-ওঠা রাস্তাটি বহুদূরে অবধি চলে গেছে। নাসিমের তখন মনে হত পৃথিবীর দীর্ঘতম পথ বুঝি এইটাই।

ধীরে ধীরে হাটিত আর তাকাত এদিক ওদিক। কত বাড়ি-ঘর! বাড়ির সামনে ফল-ফলারির গাছ। পড়ন্ত রোদ রাস্তা জুড়ে। অনেক দূর অবধি তাকালে মনে হয় বিয়ের মজলিশে বিছানো চাদরের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

এই চাদরের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে ওর ভালোই লাগে। পায়েও ব্যথা পায় না। মনে হয়, অফিসে পৌঁছে

গেলেই তো বাবার দেখা পাবে। বাবা তখন ওর হাতে একটি কাগজের মোড়ক দিয়ে বলবে—চল্। সেই সঙ্গে বলত—ভালো করে ধরিস, কাত হয় না যেন!

বাবা ওকে নিয়ে বাজারে যায়। বিকেলের ভাঙা বাজার, খুব ফাঁকা। লোকজনের ভিড় থাকে না। দু-চারজন জেলে, কিছু তরকারিআলা। কম দামের জিনিস-পত্র সব। সরেস জিনিস, ভালো টাটকা জিনিস ওবেলাতেই বেচা হয়ে যায়। বাজারের শেষ নিংড়ানো সওদা নিয়ে বসে আছে ওরা। বাবাকে দেখে হারু জেলের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে ওঠে। বলে—অ্যায় যে ভাইসাব, আপনের জন্যে রাখিছি। এই একভাগা মাছই আছে। বাছা থুয়া দিছি! জানিই আপনে আসপেন! তাই কাকো দেই নি!

বাবার মুখে কোমল হাসি—ভালো হবে তো হারু! —বলতে বলতে থলের মুখ মেলে ধরে।—পচা-ধচা নয়তো!

—আপনে থায়া তারপর কবেন।

কিন্তু বাড়ি এসে যেন বে-আক্কেল হয়ে যায় বাবা। মা চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বলে—একশোবার বলেছি, বিকেলে তুমি মাছ কিনতে যেয়ো না। সারাদিন অন্তর পচা মাছগুলো তোমাকে গছায়! তা শুনবে না! যে যা বলে, তাই! এরপর আনলে ধরে ফেলে দেব!

চুপ করে থাকে বাবা। কখনো বলে—এ রকম তো হবার কথা নয়। ও যেভাবে বলল!—

ঘটনা, সংলাপ সব যেন নাসিমের চোখের সামনে—কানে বাজে। হেসে ওঠে ফিক করে। বাবা-মার কাণ্ড-গুলো ঠিক যেন নায়ক-নায়িকার মতো। আসলেও দুজনের ভেতরে খুব ভাব ছিল।

বাবা ওকে বাজারে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে—কী খাবি নাসু? কটকটি, ঝালমুড়ি না শনপাঁপড়ি!

—কটকটি।

কটকটির দাম কম, খেতে ভালোই। বাবা বুঝে ফেলে ব্যাপারটা। বলে, না বোধহয়—শনপাঁপড়িই!

দু ছটাক শনপাঁপড়ি কিনে ওর হাতে দেয়। বলে, তাজিমের জন্যে একটু রেখে খা। ছোট বোন তো, খুশি হবে!

নাসিম বাবার দিকে এগিয়ে ধরে বলে—খেয়ে দেখো, খুব মজা!

আচমকা হেসে ওঠে বাবা—পাগল!

নাসিম আরো এগোয়—হাতে রঙ-তুলি। খোঁজে সেই পুকুরটি। হঠাৎ বলে ওঠে—এই তো, এই তো সেই! পুকুরের কিনার ঘেঁষে একটি গাছ। গাছের তলায় বসে! সেই পুকুরটার বাঁধানো ঘাট ছিল, যদিও ভাঙাচোরা। এখানে ঘাট নেই। নাসিম আর চেষ্টা করল না ওকে একটি ঘাট বেঁধে দিতে। থাকগে, ঘাট ক্ষণস্থায়ী একটি জিনিস। একজন বানায়, তারপর কিছুদিনের ভেতরেই দিনের ঢেউয়ের আঘাতে ভেঙে যায়! থাক!

বেশ নিরিবিলি জায়গা। প্রতীক্ষা করতে থাকে, কখন একটি কাক এসে কিনারে কাপড়-ধোয়া তক্তার ওপরে দাঁড়াবে। ঠোঁট চুবিয়ে দেবে পানিতে। তারপর আরেকটু নেমে পাখনা ডুবিয়ে পানি তুলে গা ধোবে। আবার ঠোঁট দিয়ে পানি তুলে তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে কণ্ঠে নামিয়ে আনবে সেই পানি।

নাসিমের শ্বশুরবাড়িতে যেতে হলে এদিক দিয়ে যাওয়া যায়। বাপের বাড়িতে সুরাইয়া এসেছে বাবলাকে নিয়ে। নাসিম এলে শ্বশুরবাড়ি খুব খুশি হয়, যত্ন করে, খাওয়ায় কত কিছু!

ওর শ্বশুরবাড়ির ভোজসভায় হঠাৎ একসময় বাবার মুখ ভেসে ওঠে। বাবা খেতে খুব ভালোবাসত!... বাবার শ্বশুরবাড়ি...তেমন কিছু মনে পড়ে না ওর!

দারুণ বর্ষা! একবার বৃষ্টি শুরু হলে সাত দিন—পনেরো দিন আর সূর্যের মুখ দেখা যায় না। সামনের ছোট্ট বৈঠকখানাঘরে ওরা ভাইবোনেরা, সবাই বাবাকে ঘিরে বসেছে। গল্প বলছে বাবা, ওরা শুনছে আর বৃষ্টি দেখছে। টিনের চাল, কী ঝমাঝম শব্দ বৃষ্টির! পৃথিবীর আর-সব শব্দ তলিয়ে গেছে তার নীচে। পথ-ঘাট সব জনশূন্য—বহুদূর অবধি, যতদূর দৃষ্টি যায়—গাছগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে কেবল বোকার মতো।

ওরা খুব ঘন হয়ে বসেছে, প্রায় জড়াজড়ি করে। একসময় বাবা বাইরের দিকে তাকিয়ে আপন মনে বলে —ইট্স্ রেইনিং ক্যাট্স্ অ্যান্ড ডগ্স্!

কথাগুলোর অর্থ ওরা বোঝে না। তবু কিছু জিজ্ঞেস না করে কেবল বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। থেকে থেকে একটি কলকল শব্দ সব কথা

ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এত বৃষ্টি হচ্ছে যে, গলির ভেতর থেকে পানির একটি স্রোত ছুটে আসছে—গিয়ে মিশবে পুকুরে। তারই শব্দ। সামনে খোলা উঠোনের সরু পথটি পানির তোড়ে কেটে গভীর নালা তৈরি হয়ে গেছে। শাখানদীর মতো সেই নালা বেয়ে পানি ছুটছে।

বৃষ্টি কমে এল। ঝিরঝির করে পড়ছে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি। বাবা মাকে গিয়ে বলে, দাও তো গোটা দুয়েক টাকা আর ছাতাটা। এই সময় বাজারে ইলিশ পাওয়া যাবে খুব সস্তা। চট করে গিয়ে নিয়ে আসি।

চুপ করে থাকে মা। সংসারের জমাখরচের ফিরিস্তি সারা বাড়ির দেওয়ালেই তো টাঙানো! কিন্তু বাবা সেসব দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। তাড়া দেয়—দেরি কোরো না! আবার জোরে বৃষ্টি এলে বের হওয়া যাবে না! এই ফাঁকে গিয়ে নিয়ে আসি! একেবারে ঝকঝকে রুপার পাতের মতো ইলিশ, জেলেদের ঢাকি বোঝাই!

ভাইজান শুধু টাকা পাঠায়, আসে না। আসার কথা লিখলে উত্তর দেয়—আসতে যে টাকা খরচ হবে—

সুরাইয়া বাবলাকে বুকের কাছে নিয়ে দিব্যি ঘুমায় আর নাসিম উঠে এসে বারান্দায় পায়চারি করে। সামনেই রেলস্টেশন। সারারাত ট্রেন চলে—সান্টিঙ লেগেই থাকে। মাঝে মাঝে ওর সাড়া পেয়ে মা উঠে আসে দরজা খুলে। বলে, এখনো ঘুমাস নি! বারান্দায় পাশাপাশি দুটি চেয়ারে বসে মা আর নাসিম। একটি ট্রেন হুইসিল দিয়ে এগিয়ে আসছে। নাসিম বলে—চলো মা, দেশে যাই একবার। অনেকদিন যাওয়া হয় নি। আমাদের বাড়িটা এবারই মেরামত করে ফেলি। মধ্যে মধ্যে গিয়ে থাকব!

মা যেন বুঝে ফেলে অনেক কিছু। বলে, তুই এত সব ভাবিস, এইজন্যেই চোখে ঘুম নেই!

সেদিকে কান দেয় না নাসিম। বলে, ভাইজান এই বাড়ি দোতলা করার জন্যে টাকা পাঠাচ্ছে, সেই টাকা নিয়ে বরং চলো, তুমি আর আমি যাই! বাড়িটা ঠিকঠাক করে নিই এই সুযোগে।—যাওয়া তো এমনিতেও দরকার। তোর বাপের গোর জিয়ারত, মিলাদ টিলাদ!

দুজনেই চুপ করে থাকে। মা বলে, কী ভাগ্য মানুষটার। সারা জীবন খালি কষ্ট করেই গেল! তোদের নিয়ে আশা করতে করতে জীবনই শেষ করে দিল। দেখতে পেল না কিছুই। ভোগেও এল না ছেলেদের কামাই-রোজগার!

রাস্তায় নিয়ন বাতি জ্বলছে। কিন্তু ওরা যেখানে বসে আছে, সেখানে কিছু গাছগাছালি আড়াল করে রেখেছে নিয়নের উজ্জ্বল আলো। একটু আব্ছর মতো অন্ধকার। এই অন্ধকারে সবরকম কথা বলা যায়। আলোর ভেতরে যেসব কথায় সংকোচ—সেসব!

—আমার মনে আছে মা, ভাইজান ঢাকায় কী যেন ছোটখাটো এক চাকরিতে ঢুকেছিল পড়তে পড়তেই। বাবা বাড়ি থেকে চিঠি লিখল—কেউ এলে তার হাতে আমার একটা শার্টের কাপড় পাঠিয়ে দিয়ো। কাপড়টা যেন একটু ভালো হয়! কিন্তু ভাইজান পাঠাতে পারে নি। বাবার সে কী রাগ তোমার সঙ্গে!—খবরদার, ও যেন একটি পয়সাও আর না পাঠায়! ওর পয়সা আমার জন্যে হারাম! কিন্তু ভাইজান বাড়িতে এল যখন, বাবা যেন সব ভুলে গেল! কী সে আদরযত্ন তার! খাওয়া-দাওয়া! অবশেষে ভাইজানের একটি শার্ট দেখে বলল—এটা রেখে যা! তুই এমনি আরেকটা করে নিস!

মা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। মা যেন এসব সহ্য করতে পারে না বেশিক্ষণ! বাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই দিন-গুলোকেও কবরে পাঠিয়েছে তাই! বলে—যা, ঘরে যা! শুয়ে পড়!

বাবলা কেঁদে উঠল বুঝি! ঘুমের ভেতরে ও মাঝে-মাঝে কেঁদে ওঠে। কেন কাঁদছিস, জিজ্ঞেস করলে চোখ না মেলেই বলে, রোকন আমাকে বল দিচ্ছে না! অথবা—

নাসিমের মনে আছে, ও বাবার কাছে ঘুমাত। আর রাতে এমনি স্বপ্ন দেখত। একদিন সকালবেলা ওর এক স্বপ্নের কথা বলতে গিয়ে বাবা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল।—নাসিম একেবারে দাঁড়িয়ে গেছে মশারির ভেতরে। বাবা হঠাৎ জেগে দেখে, নাসিম দাঁড়িয়ে তার দিকে পা উঁচু করে আছে। বাবা বলে উঠল—এই নাসু! কী রে! কী করিস!

ও চোখ বন্ধ করেই বলল, দাঁড়াও বাবা, এই শটটা মেরে নিই—বলেই বাবা আবার হোঃ হোঃ করে হাসতে লাগল।

বাবলার বয়স এখন সাত। সকালে ওদের ইস্কুল। ইউনিফরম পরে ইস্কুলের গাড়িতে ইস্কুলে যায়।

সুরাইয়া সকালবেলা উঠে ইস্ত্রিকরা কাপড়-জামা পরিয়ে চুল আঁচড়ে ওকে তৈরি করে দেয়। টেবিলে বসে নাশতা খাওয়ায়। টিফিন বক্সে টিফিন দিয়ে ছেলেকে ইস্কুলে পাঠায় যেন পাঁজরের একটি হাড় খুলে দিচ্ছে।

ছুটির দিন বাবলার, নাসিমেরও। নাসিম বলল—বাবলা, বাজার যাবি আমার সঙ্গে?

লাফিয়ে উঠল বাবলা—যাব আব্দু!

হাঁ হাঁ করে উঠল সুরাইয়া—পাগল হয়েছ! এই রোদের ভেতরে! আর বাজারের মতো জায়গা! নোংরা-কাদা! মানুষের ভিড়! এ কী খেয়াল তোমার! বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে বাজার যাবে!

—কত ছোটো-ছোটো ছেলেরা একা-একা বাজার করছে! তোমার কাজের ছেলেটা কত বড়! ও কি আজ থেকে বাজার করছে!

—ওদের কথা আলাদা!

—আমার কথাও আলাদা! একটু জোর দিয়েই বলে উঠল কথাটা।

সুরাইয়া তাকাল ওর মুখের দিকে—থেকে-থেকে এমন সব পাগলামি দেখাও তুমি! অবাক লাগে!

সুরাইয়ার এই কথাগুলো নিয়ে মনের ভেতরে নাড়াচাড়া করে কিছুক্ষণ। সুরাইয়া ঠিকই ধরেছে। আসলে ও খুব বুদ্ধিমতী। নানা বিষয়ে দারুণ বুদ্ধি খেলে ওর মাথায়!

সে রাতে আবার ঘুম আসছিল ওর। চুপচাপ শুয়ে থাকল। পাখা চলছে। মাঝে-মাঝে ট্রেন যাচ্ছে। আলো ঠিকরে এসে পড়ছে দেয়ালে।

সুরাইয়া প্রায়ই বলে, যেন ফুসলায়—আমাদের বাড়িটা কিন্তু ভারি সুন্দর, সবাই বলে! শুধু উপযুক্ত ফার্নিচার কিছু হয় নি। এই বাড়ি ঠিক মনের মতো করে সাজালে যা লাগবে না! অদ্ভুত!

—কেন, ঠিকই তো আছে! অন্যমনস্কভাবে জবাব দেয় নাসিম।

সুরাইয়া বোঝে তা। বলে, তুমি আসলে আমার কথা শুনতেই পাও নি! আমি বলছি, ভাইজানের টাকা এলে এই সোফা-সেটটা মেরামত করে কভার পালটে বারান্দায় সাজিয়ে রেখে দেব! আর ড্রয়িংরুমের জন্যে একটা বেশ মডার্ন ডিজাইনের সেট, একটা ডিভান করে নেব। বাড়ির আসবাবই সে বাড়ির মানুষের রুচির পরিচয়! বুঝেছ! তুমি তো আবার সেসবের ধার ধার না! যাই হোক, রীতা ভাবীর সঙ্গে গিয়ে দেখেও এসেছি।

একটু থেমে বলল—রীতা ভাবী মানে বুঝলে তো!

নাসিম অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল এতক্ষণ। অন্য-দিকে তাকিয়েই শুনছিল বুঝি। এবার ফিরল।

বলে উঠল সুরাইয়া—পাশের বাড়ির বউ রীতা! চিনলে? তোমার তো কিছুই খেয়াল থাকে না!

—হুঁ।

—ওরাও কিনবে। তবে একেবারে পাশাপাশি বাড়ি বলে আমি একটু অন্য ধরনের ডিজাইন নেব। বরং তুমি আর আমি একসঙ্গে গিয়ে কিনে আনব! কী বল!

নাসিম চুপ করে না থেকে একটা শব্দ করল মুখ দিয়ে অথবা গলা থেকে। ওকে বোঝাবার জন্যে যে, সে শুনেছে ওর সব কথা।

—কথা থাকল কিন্তু! টাকা এলেই আগে এটা করতে হবে! না হলে টাকা খরচ হয়ে যাবে অন্য সব বাজে কাজে!

একটু থেমে বলল সুরাইয়া—তোমরা নাকি দেশের বাড়ি মেরামত করতে যাচ্ছ? কী লাভ!

কোনো সাড়া দিল না নাসিম।

বাবলা কিন্তু তার কথা ভোলে নি। চুপিচুপি আব্বুর পাশে এসে বলে—আব্দু, চলো আমরা বাজার যাই!

বাবলাকে কোলের ওপরে তুলে নেয়, চুমু দেয় কপালে—অনুভব করে সে বাপ! বলে, থাক। বাজারে গিয়ে কাজ নেই! তুমি আর আমি বরং বিকেলবেলা বেড়াতে যাব!

বিকেল হতেই বাবলাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বাবলার হাত ধরে হাঁটছে। বাবলা অনেক প্রশ্ন করছে। সামনে অবারিত আকাশের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল—আকাশের ওপারে কী আছে আব্দু?—যারা মরে যায়, তারা কি সবাই ওপারে গিয়ে জমা হয়? তোমার বাবা!—এরোপ্লেন ওপারে যেতে পারে না?

ওদের ভেতরে যেন প্রশ্ন আর উত্তরের খেলা চলছে। নাসিম এবার প্রশ্ন করে—বাবলা, করতোয়া নদী দেখেছিস?

—হ্যাঁ—অ্যাঁ! করতোয়া নদীর ওপর দিয়ে ট্রেন যাচ্ছিল, তখন তুমি বললে, এই নদীর নাম করতোয়া!

—ঝাউগাছ চিনিস?

—বাবলা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল—না।

—ঝাউগাছের একরকম গোটা হয়। আমরা বাঁশের নলের ভেতরে সেই গোটা ঢুকিয়ে দিয়ে একরকম পটকা ফোটাতাম। ঠিক বন্দুকের মতো আওয়াজ হত। আমরা বন্দুক-বন্দুক খেলতাম!

—এখনো আছে আব্বু?

—হ্যাঁ। আমাদের বাড়ির পেছনেই আছে। একেবারে ঝাউবন!

—তোমাদের দেশে গেলে আমাকে অমনি বানিয়ে দেবে?

নাসিম ছেলের মুখের দিকে তাকায়—ওটা তোরও দেশ বাবলা!

ছেলের মুখের দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকে নাসিম। আবার বলে—আচ্ছা, আমার বাবা যদি বেঁচে থাকত তবে আমরা বাবার কাছে দেশে থাকতাম, না এখানে থাকতাম? বল তো!

বাবলা যেন একটু বিপদে পড়ে। অনেক ভেবে বলে, ওখান থেকে তোমার বাবাকে এখানে নিয়ে এসে—

—কিন্তু জানিস! থামিয়ে দিল সে বাবলাকে। আমাদের কী সুন্দর ছোট্ট বাড়িখানা! মাটির চার দেয়ালের ভেতরে সাজানো। ঢুকে পা রাখতেই প্রাণ জুড়িয়ে যায়। রাজ্যের পাখি এসে বসে আঙিনার পেয়ারাগাছে, কামরাঙাগাছে। কোঠাভরা কবুতর! সকালবেলা কবুতরের বাক-বাকুম ডাকে ঘুম ভাঙে। খিড়কিদরজার পাশে একটা গাছ আছে। আঁশফলের গাছ। আঁশফলের পাতা কী ঘন সবুজ! তুই অমন দেখিস নি কখনো! দেখেছিস?

মাথা নেড়ে বলে বাবলা—না! জিজ্ঞেস করে, আঁশফল কেমন আব্বু?

—গেলে দেখতে পাবি। যখন আঁশফল ধরে, তখন একবার নিয়ে যাব তোকে। দুপুরবেলা সেই গাছের ঘন সবুজ পাতার আড়ালে ছায়ায় এসে বসে ঘুঘু। ইচ্ছে হলে মনের খুশিতে ঝিমধরা সুর করে ডাকে ঘু-উ-ঘু, ঘু-উ-ঘু—

বাবলা ওর মুখের দিকে তাকাল। সব কথা যেন বুঝতে পারছে না।

ওরা হাঁটছে আর কথা বলছে। এক সময় নাসিম বলে, তোর পা ধরে গেছে—আয়, আমার কোলে আয়!

সত্যিই পা ধরে গেছে বাবলার। সে হাত বাড়িয়ে দেয়। নাসিম কোলে তুলে নেয় ওকে।

—হাঁটতে হাঁটতে আমার পা ধরে গেলে আমার বাবাও আমাকে এমনি করে কোলে নিত। আমি তোর মতোই এমনি হালকা আর পাতলা ছিলাম।

—তুমি তোমার বাবার সঙ্গে বেড়াতে যেতে?

—হ্যাঁ। হাটে যেতাম, বাজারে যেতাম! এমনিতেও বেড়াতে যেতাম!

—আর কতদূর যাবে আব্বু?

—কেন, তোর ভালো লাগছে না! ওই যে বাড়িগুলো, টিনের চাল, খড়ের চাল, মাটির ঘর! সামনে কত খোলা জায়গা, পুকুর, মাঠ, তরি-তরকারির খেত—ওখানে যেতে ইচ্ছে হয় না তোর!

—তুমি চেন ওদের?

নাসিম চট করে জবাব দিতে পারে না। একটু ভেবে বলে, গেলেই চেনা হবে। এই পথটা করতোয়ার পাশ দিয়ে বকুলতলার হাটে গেছে যে পথ, ঠিক তারই মতো! পৃথিবীর পায়ে-হাঁটা সব পথের চেহারা আসলে একই রকম, বুঝলি বাবলা!

—বড় চাচা যেখানে আছে, সেই দেশেও ঠিক এই-রকম পথ?

—এইরকমই হবে! আমি তো দেখি নি! তোর বড় চাচা এলে জিজ্ঞেস করিস তাকে।

—বড় চাচা কবে আসবে? আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে!

—আসবে! আমরা ভালো করে বললেই আসবে। বড় চাচা চলে এলে তোর ভালো লাগবে?

—না, একেবারে চলে আসবে না। এসে আবার চলে যাবে! ওখানে তো বড় চাচা অনেক টাকার চাকরি করে, আম্মু বলে। এখানে এলে অত টাকা পাবে না!

ছেলের মুখের দিকে তাকায় নাসিম। আস্তে নিঃশ্বাস ফেলে।

একটি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। নাসিম চোখ দুটো চারদিকে ঘুরিয়ে নিল।—বাড়ির সামনে

ঝাপড়া গাছ। তার নীচে দাঁড়াল ওরা। খোলা আঙিনায় খুটখুট শব্দ করে শালিক, চড়ুই কী-যেন খুঁটে-খুঁটে খাচ্ছে। ওদের দেখেও উড়ে গেল না। একটি বাঁশের আড়ে কাপড় শুকোচ্ছে একপাশে।

কানে এল—কাকে চান? একজন লোক এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

—কাউকে না। বেড়াতে বেড়াতে চলে এসেছি।

—আসেন! ভেতরে বসেন!

—বসব না। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ঘুরে ফিরে একটু দেখি।

—আব্বু, বাসায় চলো।

—হ্যাঁ বাবা। এটাও তো বাসা! কেমন সুন্দর না!

লোকটি শুনতে পায়। বলে, আমাদের বাসা আর কত সুন্দর হবে! মাটির ঘর-দোর। আপনারা বড়-লোক মানুষ! এসেছেন যখন, বসুন দয়া করে! এক পেয়ালা চা খেলে খুব খুশি হব—বলতে বলতে এগোল লোকটি। নাসিম তার পিছু পিছু বারান্দায় উঠে এল।

ছোট্ট বৈঠকখানা ঘর। ছোট্ট একটি জানালা। জানালার কাছে চৌকিতে বসে ওরা। চৌকির ওপরে একটি সতরঞ্চি পাতা, তার ওপরে চাদর। নাসিম চৌকির বিছানায় হাত বুলোয় ধীরে ধীরে। সামনে গরম চায়ের পেয়ালা থেকে ধোঁয়া উঠছে। বাবলা ধীরে ধীরে মোয়া চিবোচ্ছে তার পাশে বসে।

—বৃষ্টির দিনে এখান থেকে বৃষ্টি দেখতে খুব মজা লাগবে, তাই না! আর কী সুন্দর হাওয়া আসছে—দেখেছিস?

বাবলা জবাব দেয়—হ্যাঁ।

—এখান থেকে কতদূর দেখা যাচ্ছে! দেখতে পাচ্ছিস?

—হ্যাঁ—অ্যাঁ!

—কেমন লাগছে তোর?

—ভালো।

—আর কী মনে হচ্ছে?

বাবলা বুঝল না কথাটা। আব্বুর মুখের দিকে তাকাল।

—এইরকম যদি আমাদের একটা বাড়ি হয়!

বাবলা এবারও ঠিক বুঝে উঠল না।

—ওই বাড়িতে আর থাকব না তাহলে! কী বলিস! রাগ করবি?

—হ্যাঁ। মাথা নাড়ল।—সবাই রাগ করবে। মা—বাপের মুখের দিকে তাকাল।

চা শেষ হয়ে এসেছে নাসিমের। বাবলা উঠে দাঁড়াল —হয়েছে আব্বু, চলো!

বেরিয়ে এল ওরা। লোকটিও সঙ্গে সঙ্গে এল পথ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে।

—আসি! বিদায় চাইল নাসিম।

পথে নেমে বাবলাকে বলল—অনেকদূর চলে এসেছি রে! এখান থেকে ফিরতে অনেক সময় লাগবে।

বাবলা একটু অভিমানের সুরে বলল—এলে কেন এতদূর!

—তাই তো! ছেলের মুখের দিকে তাকাল নাসিম।

কবিতাগুচ্ছ

শামসুর রাহমান

এক দশক পরে

একটি দশক ছিল প্রস্ফুটিত গোলাপের মতো,
কিছুবা কাঁটায় কীর্ণ, সেয়ানা কীটের
লোভ ছিল জেগে
সাপের মণির মতো ; লোকশিল্পের ধরনে ব্যাপ্ত
ছিল রোগ শোক,
বিলাপে পড়ে নি ভাটা, যদিও আনন্দ-ধ্বনি প্রাণে
বুনেছে সৌন্দর্য, খ্রীষ্টপূর্ব শতকের
গোধূলি এসেছে নেমে সোনালি কুয়াশা হয়ে আর
হরিণের ছালে
ভোরাকাটা বাঘের মুখের লালা ঝরেছে নিয়ত।

একটি দশক আমি তার কথা জানতে পারি নি।
সে-কথা লুকোনো ছিল রোদপড়া পাতার আড়ালে,
লতাগুল্মে, পর্যটক মেঘে,
দরবারি কানাড়ার পরতে পরতে,
সূর্যাস্তের অবসন্ন বিশদ মোটিফে,
ঈগল এবং রাগী সাপের বিবাদে।

একটি দশক আমি তার কথা জানতে পারি নি,
অথচ ছিল সে আশপাশে
বিকশিত রাগিণীর মতো। অকস্মাৎ
একটি গভীর রাত চন্দ্রমল্লিকার
সৌরভ বিলায় পোড়-খাওয়া অস্তিত্বের
অলিতে গলিতে,
নৈশ ঘ্রাণে ভরপুর স্বরের চুমোয়
গ্লাস্টারের মতো খসে পড়ে দীর্ঘ দশটি বছর।

বয়সে গোলাপ ফোটে, সহসা যযাতি
পুরুরবা হয়ে যায়, ধাবমান পাঁচটি ঘোড়ার
ঘাম আর মুখের কবোষ্ণ ফেনা ঝরে
শিরায় শিরায়,
আমার প্রতিটি লোমকূপ
নিমেষেই ময়ূরের চোখ হয়। এক দশকের
দ্বিধা আর সংশয়ের সূর্যাস্তের পরে
বস্তুত সত্তার মৌন তটে
অপরূপ সখ্যে জেগে ওঠে দুলিয়ে চিত্রিত মাথা
মনসার গৌরবের মতো এক অনার্য সভ্যতা!

পাইথন

আসলে ব্যাপার হল, এখন আমরা
একটা খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে আছি। ঘুরঘুট্টি
অন্ধকারে কেউ কারো মুখ
স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না ; অন্ধের মতো
এ ওকে হাতড়ে বেড়াচ্ছি, খুঁজছি
ভালো করে দাঁড়াবার মতো একটা জায়গা।

একটু পরেই হয়তো আলোর আবীর
ছড়িয়ে পড়বে, কিন্তু যতক্ষণ না পড়ে ততক্ষণ
আমাদের সতর্ক থাকার পালা,
যাতে পা হড়কে অতল খাদে না পড়ে যাই।

আমরা পেছনে ফেলে এসেছি
অনেক থানাখন্দ, চোরাবালি ; বহু বালিয়াড়ি
পাড়ি দিয়েছি, আমাদের চামড়া
ঝলসে গেছে রোদের অত্যাচারী চুমোয়,
আমাদের পাগুলো এখন সাঁসার মতো ভারি ;
নিজেদের টেনে হিঁচড়ে কোনোমতে
নিয়ে এসেছি এই খাদের কিনারে।

এক পা এক পা করে আরেকটু এগোলে
কী নজরে পড়বে, জানি না।
হয়তো খুব কাছেই একটা পাইথন
ভীষণ কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে,
যে-কোনো মুহূর্তে নড়ে উঠতে পারে
আমাদের গিলে খাওয়ার জন্যে,
ভাবতেই ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ,
বুকের রক্ত হিম।

এই পাইথনের কথা অজানা নয় কারো ;
কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে
চারদিকে রটানো হয়েছে ওর কীর্তিগাথা।
ইতিমধ্যে ঢের ছাগল,
ভেড়া,
শূয়োর,
এবং মানুষ
শিকার হয়েছে ওর। আমাদের আগে যারা এসেছিল
এই পথে, তারা কেউ গন্তব্যে পৌঁছতে পারে নি,
একে একে সবাই ফোত হয়ে গেছে
পাইথনের স্বেচ্ছাচারে।

এই গিরিখাদ পেরুতে পারলেই
একটি নদীর রুপালি কল্লোল শুনতে পাব,
দৃষ্টি সবুজ করে দিয়ে
উদ্ভাসিত হবে শস্যের মাঠ, শত শত
শিশুর কলস্বর পাখির গানের মতো ঝংকৃত ছায়া
বুনে দেবে স্মৃতিতে।

ভয়ের গলায় পা রেখে,
পাইথনের বিখ্যাত ক্ষুধায় ধুলো দিয়ে
এখন একটু পা চালানো দরকার।
পাইথনের আড়মোড়া ভাঙার ধরনে আমাদের
পায়ের তলার মাটি নড়ে উঠছে
ঘন ঘন। তবে কি এখন
শুরু হবে ভয়ংকর সেই ভূমিকম্প, যার ধমকে
টাল সামলাতে না পেরে
পাইথনটা নিজেই পড়ে যাবে অতল গিরিখাদে?

মা তার ছেলের প্রতি

এখন আমি বড়ো ক্লান্ত, আমার দৃষ্টি ক্রমশ
ধূসর হয়ে আসছে। সন্ধ্যার
সোনালি-কালো প্রহরে ভাবছি, বাচ্চু,
কতদিন তোর সঙ্গে আমার দেখা নেই।
দিনের এই হট্টগোল আর
চেঁচামেচিতে কতজনের গলা শুনি,
কিন্তু তোর কণ্ঠস্বর আমি শুনি না।

তোর তিন ভাই প্রায় রোজানা আমার কাছে আসে,
আরেকজনের কাছেই থাকি দিনরাত।
শুধু তুই কালেভদ্রে আসিস, মাঝে-মধ্যে
টেলিফোনে শুনি তোর গলা।
আমি জানি তুই তোর নাম মিলিয়ে দিয়েছিস

গাছের পাতায়, ফসলের শীষে,
মেঘনা নদীতে, অলিগলি আর অ্যাভিনিউতে,
শহীদের স্মৃতিসৌধে, মৌন মিছিলে।
বাচ্চু, তুই সবখানেই আছিস,
শুধু দূরে সরে গিয়েছিস আমার কাছ থেকে।

আমার ইন্দ্রধনু বয়সে তোকে আমি
পেটে ধরেছি দশ মাস দশ দিন, তোর নাড়িছেঁড়া
চিৎকার এখনো মনে পড়ে আমার।
মনে পড়ে তোর হামাগুড়ি, মুখের প্রথম বুলি।
হাঁটি হাঁটি পা-পা করে তুই
চলে যেতি ঘর থেকে বারান্দায়, তোর মৃদু তাড়ায়
রেলিঙ থেকে উড়ে যেত পাখি,
আমি দেখতাম দুচোখ ভরে।
কখনো কখনো ফোরাত নদীর ধারে
তীরে তীরে ঝাঁঝরা-হয়ে-যাওয়া কাঁচবন্দী
দুলদুলের দিকে একদৃষ্টিতে তুই
তাকিয়ে থাকতিস, যেন ভবিষ্যতের দিকে আটকা পড়েছে
তোর দুটো চোখ।
জ্বরে তোর শরীর পুড়ে গেলে, তুই আমার
হাত নিয়ে রাখতিস তোর কপালে,
তোর কাছ থেকে আমাকে এক দণ্ডের জন্যেও
কোথাও যেতে দিস নি কখনো।

অথচ আজ তুই নিজেই
আমার নিকট থেকে কত দূরে অপরিয়মাণ।

বাচ্চু, তোর নাড়ি-নক্ষত্র আমার নখদর্পণে,
কিন্তু কখনো কখনো মনে হয়,
পরিচয়ের আবছা ঝালর কতটা দুলে ওঠে আমার চোখে!
তোর এখনকার কথা ভাবলে
হজরত ঈশা আর বিবি মরিয়মের কথা মনে পড়ে যায়।
যখন ওরা তাঁকে কাঁটার মুকুট পরিয়ে তাঁর
কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছিল ক্রুশকাঠ,
কালো পেরেকে বিদ্ধ করেছিল সারা শরীর,
তখন তাঁর কাছে ছিলেন না মাতা মরিয়ম ;
ধু ধু একাকিত্বে ধুঁকছিলেন তিনি।

তোর আর আমার মধ্যেও
নিঃসঙ্গতার খর নদী, আমি সেই নদী কিছুতেই
পাড়ি দিতে পারি না।
তোর কথা ভেবে ইদানীং আমি বড়ো ভয় পাই, বাচ্চু।
তাই বারবার ইসমে আজম পড়ে
তোর বালা-মুসিবত তাড়িয়ে বেড়াই।
তুই তোর নিজস্ব সাহস, স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষাগুলিকে
আগলিয়ে রাখ, যেমন আমি তোকে রাখতাম
তোর ছেলেবেলায়।

চতুরঙ্গ মে ১৯৮৪

শহর সংস্করণ

শংকর বসু

রাত দশটার পর যখন দোলানো পাল্লা ঠেলে তাকে ঢুকতে হল, বা দোলানো পাল্লার ওপাশের অন্ধকুঠরি থেকে তার ডাক এল, তখন সেই সাঁতসেঁতে ঘরটিতে, কাগজ আর ফাইলের গন্ধের মধ্যে যেতে তার শরীর একান্তই রাজি নয়, শরীর গুলিয়ে উঠছিল।

অমল এই অফিসটিতে টিঁকে আছে তা-ও প্রায় চার বছর হতে চলল, এই চারটি বছরে ঈর্ষা, নীচতা আর হৃদয়হীন সামরিক আচরণসমূহ যেভাবে সে দেখেছে, তাতে নিজের সম্পর্কে যুদ্ধবন্দীর অনুভব ছাড়া অন্য কিছু মহৎ ব্যাপার যা সামান্য-সামান্য আঁচ করেছে সেটাই ধোঁয়ার অস্পষ্টতা আর কাগজের গন্ধের মধ্যে হারিয়ে যায় বারবার। আজ, অমল একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, একবারে, বা হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারটি ঘটে নি, বরং সে অত্যন্ত গোপনে এবং সম্পূর্ণ একা-একাই তিল-তিল করে গড়ে তুলেছে সিদ্ধান্তটি। তবু, একাকিত্বের জন্যই হয়তো একটু দ্বিধায় তালগোল অসহায়তা-ই গুলিয়ে উঠছিল শরীর জুড়ে।

সে যাই হোক, এরপর যে অস্বাভাবিক ঘটনাপ্রবাহ সেসবের মধ্যে প্রবেশ করার আগে, একথা স্পষ্ট বলে নেওয়া ভালো যে, এই ঘটনাপঞ্জী বস্তুত ক[১] নামের একটি শহরে ১৯৮০ সাল জুড়ে ঘটে চলেছিল, শহরের সমস্ত মানুষই এ বিষয়ে একমত যে সত্তর-পরবর্তী দশকটিকে তাদের বেশ অদ্ভুত মনে হয়েছে, এমন কি তার স্বাভাবিকতাও তারা ঠিক হজম করতে পারছিল না, কেমন অচেনা মনে হচ্ছিল, ভয় করছিল। আমরা যেখান থেকে শুরু করছি তা একটু পিছিয়ে গিয়েই, কারণ আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের একজন নায়ক আছে। আমরা এই নায়কের জীবনের একটি বাঁক থেকে শুরু করতে যাচ্ছি বলেই এই পিছিয়ে আসা, তবে হাবিজাবি বিষয়ে সময় খরচ না করে চেষ্টা করা যেতে পারে এটুকু পুষিয়ে নেওয়ার।

পৃথিবীর অনেক শহর দেখেছেন এমন মানুষকেও বলতে শোনা গিয়েছে যে ক শহরের আশ্চর্য নিজস্বতা আছে।' যদিও 'আশ্চর্য নিজস্বতা'টি খুব কমই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ভৌগোলিক এবং আচারগত দিকটি বাদ দিয়ে অন্য কোনোভাবে 'আশ্চর্য' শব্দটির বর্ণনা তাঁরা

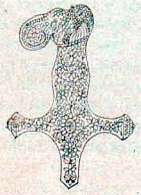

[১] কলকাতার আদাক্ষর হিসাবেই ব্যবহার করা হচ্ছে।

দিতে পারেন নি। তবে হামেশাই বলে থাকেন এখানকার মানুষের মন আর সংস্কৃতি-অনুরাগ সম্পর্কে কিছু কথা। আবার সেইসব মানুষই চরম বিরক্তি আর গভীর ঘৃণা প্রকাশ করে ফেলেন বর্ষাঋতু যখন উঠে আসে শহরের সমস্ত হাইড্রেন্ট ছাপিয়ে, বা যখন রূপকথার গল্পের মতোই জাম নামের এক অশরীরী আত্মা প্রতিদিন শহরের কোথাও-না-কোথাও স্তব্ধ করে দেয় সমস্ত স্পন্দন ও গতি।

জীবনদায়ী ওষুধের জোগানও এখানে অব্যাহত নয়, যেমন নেই সুস্থ সরল মানুষের রোজগারের রাস্তা ; মোট কথা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান—সমস্ত দিক থেকেই শহরটির পরিচয় নেতিবাচক। গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তরগুলির একই ঘরের দুটি টেবিলের মধ্যে একটি ফাইল চালাচালি করতে লেগে যেতে পারে কয়েক বছর। শহরটি আশ্চর্য, এ কারণে যে এইসব পার্থিব বিষয় নিয়ে এখানকার মানুষজন এমন মজা আর রঙ্গরস করতে পারে যার তুলনা অসম্ভব।

ফলে একটি বিস্ময় ঘন হয়ে উঠতে পারে আর তা হল প্রথমত এতকিছু সত্ত্বেও শহরটি থেমে নেই কেন, মরে যায় নি কেন, বরং তার সাজ-সজ্জা আর উন্নয়ন সম্পর্কে প্রতিবছরই কোনো-না-কোনো নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে। হতে পারে তারা একজন সুদক্ষ শেরিফ পেয়েছে কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন : অতি বৃদ্ধ, প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই মেয়র হতে পারেন পালাক্রমে এবং শেরিফ হওয়ার জন্য শহর-বিশেষজ্ঞ হওয়ার কোনো প্রয়োজন হয় না। শেরিফের অফিসটি হাই-কোর্টের এলাকার মধ্যে। তাহলে কি এ বিষয়ে আইনের কোনো মন্ত্রপূত ব্যাপার আছে? আইন এবং শৃঙ্খলার?

শেষ পর্যন্ত জনজীবনেই এসব গল্পের বেশ কিছু উত্তর হয়তো পাওয়া যেতে পারে, যদিও, সে ব্যাপারটাও কেমন ঠাণ্ডা আর অস্তিত্বহীন কিছু বলেই মনে হতে পারে। কেননা তাহলে তো শোভাযাত্রা, প্রতিবাদ আর চিৎকারের পাশাপাশি সুশৃঙ্খল দায়িত্ববোধ থাকত। নিঃশব্দে বেঁচে থাকার কল্পনা একান্তই কাব্যিক, বাস্তবে মানুষের হাঁটা-চলা, কাজ, সম্মতি-অসম্মতি থাকে, যা থেকে জন্ম নিতে পারে কিছু ঘটনা। এখানে সরকারি দপ্তরগুলিই ঘটনার হ্যান্ড-আউট জুগিয়ে যায় রোজ সন্ধ্যাবেলা। আর সে-সমস্ত ঘটনাই পরিকল্পনা, পরিসংখ্যান আর অন্তর্দ্বন্দ্বের। বড়ো জোর তার সঙ্গে দপ্তরগুলি নিয়মিত চেষ্টা করে যায় আশা-উদ্রেককারী একটি মনোভাব ছড়িয়ে দেওয়ার। অর্থাৎ ঘটনা যা কিছু সেসবই কাগজকলমের বিষয় এবং প্রতিটি বিষয়ই সরকারি দপ্তরের এখতিয়ার, যেমন এখানে সম্পত্তি গড়ে উঠেছে পরিবেশ মন্ত্রক এঁবং মানসিক জটিলতা বিভাগ।

সর্বদা পিছন দিকে ফেরানো শহরের মুখটি সম্পর্কে বিশিষ্ট নাগরিকগণও সচেতন নন, বরং বক্তৃতার যে কোনো সুযোগ তাঁদের মধ্যেও জন্ম দেয় অতীত চর্চার একটি তীব্র ঝোঁক এবং সিদ্ধান্তটি শেষ পর্যন্ত এরকম হতে বাধ্য 'অতীতকে আত্মস্থ করতে না পারলে আমরা এক পা-ও এগিয়ে যেতে পারব না।' এই সিদ্ধান্তটির পর তারা সভা-সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করে। আর ফিরে পাওয়া যায় দৈনন্দিন জীবন, অতীতের পচা শব। বাহ্যত সে জীবন মৃত নয়, অজস্র মানুষের শ্রম-বিশ্রাম-বিনোদনের এক প্রাত্যহিক জীবন-স্পন্দন শহরটিকে সচল রাখে। কিছুদিন আগে এই শহরের গলিঘুঁজি আর গড়ের মাঠে গুলি করে মারা হয়েছে একদল বিদ্রোহীকে, সম্ভবত তারা একটি ইশতেহারে একথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিল—'ঠাকুরদা, তার ঠাকুরদা আর ঠাকুমার গল্পের মধ্যে বন্দী এই জীবনের থেকে জঘন্য কিছু হয় না, আমরা জন্মেছি, আমাদের নিজেদের জীবন আছে, এবার থেকে আমরা নিজেদের জীবনেই বাঁচতে চাই, অতীতের দলিল, চিঠি আর প্রবন্ধের কাঁপ করতে-করতে সরকারি দপ্তরের মতো একদিন অবসরের ফুলের মালা গলায় দেওয়াটা আমরা ঘেন্না করি।' ক্রোধ, ঘৃণা ইত্যাদি আবেগে একনাগাড়ে দীর্ঘদিন থাকা সম্ভব নয়, তারা থাকতেও পারে নি। ভালোবাসা, স্নেহ আর বিচারপ্রবণতাই শহরের বিদ্রোহীদের একাংশকেও হাত ধরে টেনে দিল স্বাভাবিক জীবনের দিকে। এ কাহিনী গড়ে ওঠে এমন-ই এক ঈষৎ উষ্ণ স্বাভাবিকতায় যা তাপ বিকিরণ করতে-করতে ক্রমশ শীতল হতে শুরু করেছিল

দুই

অমল কমপক্ষে পাঁচটি দপ্তরে হানা দিয়েছিল, বকের মতো বসেছিল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একবার তার একথাও

মনে হয়েছিল রাইটার্সের প্রেস কর্নারের গাঁদিতে সে ক্রমশ ঢুকে যাচ্ছে। বিশাল গাঁদিটি তার পাছা হয়ে যাচ্ছে, সে বোধহয় আর উঠতে পারবে না।

সুবিধে মাত্র এইটুকু যে, অফিসগুলোকে গুটিয়ে আনা হয়েছে ছোট্ট একটি পাড়ায় এবং রাইটার্সে বসে প্রায় সব দপ্তরকেই পাওয়া যায় হাতের কাছে। অবশ্য অন্য একটি বিপদ আছে, শহরের টেলিফোন বস্তুত ব্যবহার করা যায় ইন্টারকম হিসাবে। অর্থাৎ অফিসগুলো মানবশরীরের মতোই প্রতিটি ইন্দ্রিয় আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ সেরে ফেলতে পারে। কিন্তু দুজন মানুষে পরস্পরকে জরুরি সংবাদ আদান-প্রদান করতে গেলে, ঘেমে নেয়ে উঠতে হয়।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সার্ভিস কমিশনের সূত্রে জানা গেল মাত্র ৫৪৬টি কেরানির চাকরির জন্য শহরের এক-দশমাংশ মানুষ আবেদন করেছে। এটি একটি ঘটনা, অন্তত দপ্তরটির কাছে। ৫ কোটি মানুষ এত স্বতন্ত্র-ভাবে দরখাস্ত জমা দিয়েছে, দপ্তরের নিয়ম অনুসারে এত নিস্পৃহভাবে চাকরির জন্য আবেদন করেছে যে হয়তো সেই পাঁচ কোটিই এখানে দরখাস্ত করার পরের দিনই অন্য কোনো দপ্তরের উদ্দেশে পাঠিয়েছে আরও পাঁচ কোটি দরখাস্ত। ফলে এর ঘটনাগত দিকটি সবটাই রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের সার্ভিস কমিশন নামক একটি দপ্তরের আওতায়।

কিছুক্ষণ আগে অমলকে হেঁটে যেতে হয় সার-সার টাইপরাইটারের মাঝখানের ফালিটি দিয়ে, তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। অমল সেই প্রায়ান্ধকার, স্তূপীকৃত কাগজপত্রের কুঠরিটিতে প্রবেশের আগে কিছুটা মানসিক প্রস্তুতি অর্জনের চেষ্টা করেছিল। আর-একবার তাকে ভেবে নিতে হল নিজের ভালো-মন্দ, এও ভাবতে হল মাঝখানে সিঁথিকাটা, বাইফোকাল চশমা সমেত কাটা ধুতনির মানুষটির সঙ্গে খুব রুঢ় আচরণ করা ঠিক হবে না। অথচ কৃত্রিমভাবে হলেও এ জিনিসের নিষ্পত্তি একমাত্র তিক্ত ঝগড়ার মাধ্যমেই সম্ভব।

এ-সো, তোমার সঙ্গে কথা আছে। আচ্ছা, তুমি চোখের সামনে সাদা কাগজটা কি দেখতে পাও? মানে আটটা পাতা কী দিয়ে ভরাট করবে?

এই পর্যন্ত বলে প্রৌঢ় মানুষটি কেমন তলিয়ে গেলেন, চশমা খুলে রাখলেন কাচবসানো টেবিলটিতে, টেবিলটির কাচের তলায় অজস্র চোখের মতো স্থির হয়ে রয়েছে নানা প্রতিষ্ঠানের কার্ড, পিকচার পোস্ট-কার্ড, দু-একজন নামকরা শিল্পীর স্কেচের প্রিন্ট, যার মধ্যে ছিল একটি পেঁচার ছবি। অমল জানে যা বলবার এখন উনিই বলবেন, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কথাবার্তা কোন পথে গড়াবে। অমল ভদ্রলোকের সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে আনল। একমুখ ধোঁয়া পাশ ফিরে ছেড়ে সে পেঁচার স্কেচটি দেখতে লাগল। কুৎসিত একটি পাখিও শিল্পকর্মের বিষয় হয়ে উঠতে পারে, বেশ অদ্ভুত ব্যাপার। স্কেচ-টিতে পেঁচার অস্তিত্ব ঘন হয়ে এসেছে দুটি মাত্র চোখে, তারপর যেন বিস্ফোরণ ঘটেছে।

লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়ই—সংবাদের ক্ষেত্রে আকাল এসেছে?

হ্যাঁ, তা এসেছে।

আমাদের মতো ছোটো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নানা জায়গায় রিপোর্টার পাঠিয়ে নতুন-নতুন খবর খোঁজা প্রায় অসম্ভব।

হুঁ।

তোমাকে বলেছিলাম ব্যাঙ্ক সার্ভিস কমিশনের রিপোর্টটা একটু...

হ্যাঁ, করে দিয়েছি, এই দেখুন, চাকরি না-পাওয়া সাড়ে চার কোটির মধ্যে শেষ পর্যন্ত হয়তো মাত্র আর দশ হাজার বেকার কোথাও-না-কোথাও চাকরি পেয়ে যাবে, চার কোটি চল্লিশ হাজারের একদিন দরখাস্ত করবার বয়স-ও পেরিয়ে যাবে, যদি এর মধ্যে দু কোটি ব্যবসা-ট্যাবসা বা ছোটখাটো কাজ খুঁজে-ও পায় বাকি দু কোটি চল্লিশ হাজার তলিয়ে যাবে দারিদ্র-মৃত্যু আর হতাশার গহ্বরে। আর এসবের মধ্য থেকে জন্মাবে কমপক্ষে পঞ্চাশ জন স্মাগলার, পঁচিশ জন খুনে, আরও পঁচাত্তর জন হয়ে পড়বে রাজনৈতিক দলের মস্তান।

হ্যাঁ দেখেছি, দেখে অবাক লেগেছে, আমি তো তোমাকে জ্যোতিষীগিরি করতে বলি নি, ঘটনাটি স-বিস্তারে লিখতে বলেছি—

যেমন?

ধরো, পাঁচ কোটি দরখাস্ত পূরণে ভুলচুকের ছবিটা কেমন, এর মধ্যে কতজন হরিজন আছে, কী প্রসেসে

দরখাস্তগুলো স্ক্রুটিনি করা হচ্ছে, একাজে সর্বমোট খরচ কত পড়তে পারে—এইসব আর কী।

তাহলে আরও দু'দিন সময় লাগবে।

কাল যে কাগজটি বেরোবে তাতে তিন কলম জায়গা কোন ঘটনা দিয়ে ভরা হবে?

দেখুন, আমার পক্ষে সে সমস্যা নিয়ে ভাবা সম্ভব নয়।

চেষ্টা করো ভাবতে।

দেখুন...

না, না, তোমাকে কাগজের অফিসের গোটা জিনিস-টাই বুঝে নিতে হবে, সংবাদপত্র প্রায় একটি যুদ্ধ-পরিচালনার ব্যাপার,.পার্থক্য শুধু এইটুকু যে এক্ষেত্রে যুদ্ধটা স্থায়ী। শোনো, আজ তোমার আগেকার স্টোরিটা দিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু রেশনের ব্যাপারে ঐ তথ্যগুলো এতদিনে পুরনো হয়ে গিয়েছে।

হ্যাঁ, কিন্তু কোনো কাগজই তো এবিষয়ে লেখে নি, তুমি বরং আরেকটা ইনস্টলমেন্ট বিষয়টা কারেন্ট করে তুলো।

না, সমস্যাটা হল রেশনিং ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে, বাস্তবে কেউ রেশন পাচ্ছে না।

আপাতত তুমি এদুটো কাজ করে ফেলো, পরে দেখা যাবে কী করা যায়। মনে রেখো এই আকালের কথাটা, এখন কোনো কিছুই তুচ্ছ নয়।

এর পরও তারা বেশ কিছুক্ষণ ঐ খুপরিটিতে মুখোমুখি বসে ছিল। সম্পাদক এতদূর কথা বলে ফেলেছেন যে আর কিছুই বলার নেই। অমল ঘরটিতে প্রবেশের আগে যে প্রস্তুতি নিয়েছিল তা অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাওয়ার ফলে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। এখন যেমন সেসব আর নেই, তেমনি সুকোমল গাঙ্গুলি যেভাবে কথা বলছিলেন তাতে অমলের মৃদু আশা হচ্ছিল হয়তো এই অফিসে তাকে নিয়ে ছোটো একটি ঘটনা ঘটতে চলেছে।

বেরিয়ে আসার পর অমলকে প্রথমেই পড়তে হল সুহাসবাবুর পাল্লায়, ইশারায় চেয়ারটা দেখিয়ে সুহাস-বাবু কপিপ কালিতে মুদ্রিত একফালি কাগজ পাশের ঝুড়িটিতে ফেলে দিলেন। 'কাল আসছ?' প্রশ্নটা করলেন ঘাড় গুঁজে, নিউজপ্রিন্টের চারটি ফালি কাগজ পিন দিয়ে গাঁথতে-গাঁথতে, হঠাৎ বেশ দায়িত্বশীল আর স্নেহময় হয়ে উঠলেন, 'চট করে ছেড়ো না, অন্তত আরেকটা ব্যবস্থা না-হওয়া পর্যন্ত, বুঝতেই পারছ আমাদের জীবনের জল-বাতাস হল প্রতিষ্ঠান।' অমল ততক্ষণে একটি বই, কিছু কাগজ আর মাল্টিকার্বার্ড পেনটি পুরে ফেলেছে ঝোলার মধ্যে, 'হুঁ' ধ্বনিটি সে উচ্চারণ করল বিদায়সূচকভাবে।

অফিসটিতে গাড়ির সংখ্যা এমনিতেই বেশি নয়, তদুপরি একজন রিটেইনারকে গাড়ি দেওয়া হবে একথা ভাবাই যায় না। ফলে রাত এগারোটায় এসপ্ল্যানেড থেকে কেশব সেন স্ট্রীট পর্যন্ত তাকে হেঁটেই ফিরতে হবে, তার আশ্চর্য লাগছিল অসম্ভব ব্যস্ততার; কোলা-হলের একটি শহর কী করে মেনে নিল রাত দশটার মধ্যে যানবাহনের হাওয়া হয়ে যাওয়াটা। যদি এ নিয়ে মানুষজন বিক্ষুব্ধ হত, অফিস-কাছারির কাজকর্মে বিশৃঙ্খলার জন্ম দিত, টিয়ার গ্যাস আর পথ অবরোধ ঘটত তাহলে রাত দশটায় বাস তুলে নেওয়ার একটি আইন এবং আইনের প্রস্তাবের তলায় আমলাদের স্বাক্ষরের মতো একটি কাগুজে ব্যাপার ঘটনা হয়ে উঠতে পারত। সেসব কিছুই ঘটে নি, আইনটি পাশ হওয়ার পরের দিন সাড়ে নটার মধ্যে বাড়ি ফিরে যাওয়ার তাড়ায় দু-চারজন মাতালের হাত-পা-ভেঙেছে শুধু। মানুষ চেষ্টা করেছে অফিসের চৌহদ্দির মধ্যেই আড্ডাকে পুরে ফেলতে, চেষ্টা করেছে যোগাযোগের অন্যান্য উপায় টেলিফোন আর চিঠিপত্রকে একটু বেশি ব্যবহার করতে। আবার যেহেতু প্রতিষ্ঠান থেকে চিঠি পাওয়া এবং প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশে চিঠি লেখা ছাড়া অন্য ধরনের লেখাজোখার অভ্যাস তারা দীর্ঘকাল হারিয়ে ফেলেছে, ফলে রবিবার দিনটিতে পার্ক, রেস্তোঁরা, সিনেমাহলে ভিড় খুবই কমে এসেছে, রবি-বার তাদের হাত পাকাতে হচ্ছে চিঠি লেখায়। কিংবা যেতে হচ্ছে শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে, মফঃস্বল থেকে মফঃস্বলে। আর কাজের ছুটি দিনে শ্রমজীবী এবং অফিসজীবী মানুষদের মধ্যে গলা ভেজানোর অভ্যাস যাদের আছে, তারা রোদ থাকতে থাকতেই ছুটে যাচ্ছে শুঁড়িখানায়। সিনেমা হলগুলো বন্ধ করে দিয়েছে রাতের শো, বদলে চালু করেছে দুপুরের একটা শো, কোনো-কোনো হলে এখন নিয়মিত সকালেও ছবি

দেখানো হচ্ছে। অবশ্য ধনীদের কথা আলাদা, তারা ভিডিও নামের একটি যন্ত্রের সাহায্যে ঘরে-বসেই সেরে নিতে পারছে বিনোদনের অভ্যাস।

বর্ষা ঋতুই চলছিল সম্ভবত, তবে বর্ষা মানে রাস্তায় জল ভেঙে চলা ছাড়া অন্য কোনো অনুভূতি তো নেই। এমন নিষ্পত্র শহর পৃথিবীতে আর একটি আছে কিনা সন্দেহ। রাস্তায় বেরিয়ে আসার পর গুমোট কমে নি, অমল দেখেছে আসলে বর্ষা যেমন দু-চার দিনের ব্যাপার, এ শহরে শীতও তেমনি বড়জোর একটি সপ্তাহ। শীতকাল যথার্থ ঐ একটি সপ্তাহে এসে যাওয়ার অনেক আগে এবং পরেও, গুচ্ছে-গুচ্ছে মেয়েরা হেঁটে যায় রঙের ঢেউ তুলে। তাদের বয়স যৌবনকাল ছুঁয়েই হয়তো, কিন্তু তাও যেন ঐ ক্ষণ-স্থায়ী শীতকাল। ঘাম আর অবসাদের সুদীর্ঘ গ্রীষ্ম-কালই যেখানে জীবনের নিরানব্বই ভাগ, সেখানে এই ভ্যাপসা ভাবটি নিয়ে ভাবার কোনো যৌক্তিকতা নেই। বরং এই গ্রীষ্মকে দেশীয় বাস্তবতা বলেই গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে।

সুকোমল গাঙ্গুলি কি কোন কিছুর ইঙ্গিত দিতে চাইছিল, অমলের অফিস কি জেনে গেল যে অমল এখন পৌঁছে গিয়েছে একটি সিদ্ধান্তের কাছে। ভদ্র-লোক কেন বললেন দায়িত্বের কথা, প্রতিষ্ঠানের সংবাদ-সংকটের কথা, এমনভাবেই বা বললেন কেন যাতে বোঝায় অমল এই প্রতিষ্ঠানের একটি জরুরি অঙ্গ। এইসব তাকে ভাবতে হচ্ছিল, তাকে ভাবতে হচ্ছিল, যেমন ভাবতে হচ্ছিল গাঙ্গুলিদার উপমাটির কথা। যুদ্ধের কথা। ভদ্রলোক কথায়-কথায় বড় বেশি উপমা ব্যবহার করেন। একেক দিন লম্বা বক্তৃতা শুরু করে দেন, এমনভাবে, এমন তাড়াহুড়োয়, যেন জীবনের শেষ কথাগুলো বলে ঐ সম্পাদকের চেয়ারটিতেই ঢলে পড়বেন।

তিন

যথেষ্ট দূর থেকেই উর্মিলার মুখ দেখা সম্ভব, প্রথমে অবশ্য মুখটি দেখা যায় না, দেখা যায় শুধু পাল্লাখোলা একটি জানলা। পরে মনে হয় জানলায় কেউ আছে, চুল উড়ছে, উড়ন্ত চুলের মধ্যে মুখের একটি আদল লুকিয়ে আছে। জানলা, চুল—এইসব মিলে একটি পাখির বাসায় যেমন দুটি চোখ, সেই রকম মনে হতে পারে। তবে তা নির্ভর করছে মাঝরাতে ফিরে আসা পরিশ্রান্ত একজন মানুষের অনুভব আর কল্পনাশক্তির উপর, আর মেজাজ-মর্জির উপর। বাড়িটি ঠিক সেই আমলের, যখন স্পেস ব্যবহৃত হত ভিন্নভাবে, ধনীর দালান যখন বাড়তি ছাদ ছড়িয়ে দিত বাড়ির সামনের দিকে, পথচারী মানুষও যাতে দু-দণ্ড বসে যেতে পারে এমন ব্যবস্থা থাকত। হয়তো এ বাড়ির একদিন পশ্চিমা দারোয়ান ছিল। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই ছিল। গাড়িবারান্দা ছিল বলেই জানলায় উর্মিলার মুখটি অমল দেখতে পেল, সে মুখে কোনো আবেগ নেই, শুকনো দুটি চোখ শুধু।

'সুভদ্রার কনফার্মেশন এখনও হয় নি, এখন, জানি তোমার ভালো লাগছে না, তবু'। অমলের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, রাতও অনেক হয়েছে, অথচ তারা দরজায় খিল তুলে সামান্য একটি ফালিকে ঘর করে তুলতে পারছে না। একজন মোহিত দাশ এখনও ফেরেনি, একেক দিন ওভারটাইম সেরে ফিরতে মোহিত একটা-দেড়টা করে ফেলে। এখন শুলেই ঘুম, তা ছাড়া তখন দরজা খুলতে সংকোচও হয়। একটু নিভৃতির জন্য তাদের আজও জেগে থাকতে হচ্ছে। কাঁসের যেন অপেক্ষা, জানে যে একদিন পারবে, একদিন যথেষ্ট নিভৃতি পাওয়া যাবে। উর্মিলা চুপ করে থাকে নি বেশিক্ষণ, সে আবার বলল, "তুমি তো এসবই করতে চেয়েছিলে, এখন ধৈর্য রাখতেই হবে, বরং বাড়ি নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না—"। অমল উর্মিলাকে চুপ করতে বলল, বলল 'শুনতে পাবে।' উর্মিলা বেশ স্থিরভাবেই বলল 'কেউ জেগে নেই।' সে রাতে উর্মিলা শেষ যে কথাটি বলল তা হল : 'এত কিছু করার সামর্থ্য আমাদের নেই। তখন মাস্টারিটা নিলে না লেখাজোখা করবে বলে, তারপর সেসব গেল, এখন আবার—দেখো নিজের ব্যাপারে এরকম কিছু ঠিক করতে গেলে পাঁচজন মানুষের কথা তোমাকে ভাবতেই হবে।'

আমি কি তাদের মেরে ফেলতে চাইছি।

তা নয়।

তা ছাড়া, এখনও কাজটা ছাড়ি নি, ভেবে যাচ্ছি।

ভাবতে কে বারণ করেছে।

তুমি বারণ করার কে?

মানে? কী বলতে চাও?

আমারও তো ঘাড়ের উপর একটা মাথা আছে ; কী জ্বালা!

এ তাদের স্বাভাবিক কথাবার্তা, এর মধ্যে কলহের নামগন্ধ নেই। 'নবসমাচার' অফিসে অমল যতখানি মানিয়ে নেয় এই ফালিটিতে ফিরে এসে সে ততটাই ভেঙে পড়ে, কথার পর কথা বলে এক চূড়ান্ত অ-ব্যবস্থা সৃষ্টি করে, কেমন যেন শিশু হয়ে যায়। বিয়ের অনেক আগেই ঊর্মিলা গ্রহণ করেছিল অমলকে সামলানোর কাজটি। এখন তা অনেকটাই অভ্যাস হয়ে এসেছে। আগের মতো উৎকণ্ঠা-উত্তেজনা আর নেই, সে এখন প্রতিবারই কেবল যুক্তি উপস্থিত করে। যেমন আজ অমলকে শেষ পর্যন্ত স্মরণ করিয়ে দিল একটি পরিবারের কথা। অমল যদি হঠাৎ তার চার বছরের বিরক্তি আর বিতৃষ্ণাকে একটি ঘটনায় প্রাণ দিতে চেষ্টা করে তাহলে তা হবে এই পরিবারটির পক্ষে মৃত্যুবাণ।

'বড্ড ঘুম পাচ্ছে', 'সত্যি, আর কতক্ষণ জেগে থাকা যায়', 'মোহিতের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই', 'সুভদ্রার কনফার্মেশনটা হয়ে গেলেই বাড়ি বদলাব', 'অত সহজ নয়।'

ইচ্ছে করলেই যে চার বছরের এই দম্পতিটি নিজস্ব, প্রশস্ত একটি ঘর পাবে না, সেকথা অমলও জানে। অচিরেই সে পিতা হবে এবং তার সন্তানের জন্মের পর থেকে এই পরিবারের ইতিহাস একটু বদলে যাক, এ হল অমল আর ঊর্মিলার এক গভীর বাসনা। এখনও পর্যন্ত তারা শুধু কল্পনায় একটি প্রশস্ত নতুন ঘরের ছবি দেখে। ভিজে, স্যাঁতসেতে দেওয়াল, সংকীর্ণ পরিসর, আবছা অন্ধকার আর নোনাঘাসের গন্ধের এই ঘরটি তাদের মন থেকে একে-একে মুছে দিয়েছে রঙের সমারোহ। কল্পনার ঘরটি তাদের উপহার দেবে এক সজীব নতুনত্ব, সেখান থেকে তারা জীবনকে দেখতে পাবে, অনুভব করবে আশ্চর্য ঔজ্জ্বল্য, সবকিছু ঝলমল করে উঠবে।

দুর্দশা থেকে সৌভাগ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া শুধু নয়, কারণ সত্যি শহরের কজন মানুষই বা এরকম কল্পনা পুষে রাখতে পারে, এ হল আসলে এক দিনপঞ্জী, যেখানে কল্পনার কিছু অবকাশ থাকারই কথা। যে মানুষটির জন্য প্রতিরাতে অমলদের জেগে থাকতে হয় সেই মোহিত যদি জানত যে হাড়ভাঙা খাটুনির গল্প ছাড়া সত্যি তার জীবনে কোনোদিনই ভিন্ন কোন গল্পের আকস্মিক অবতরণ নেই, তাহলে সে কি সিলিং-এ দড়ি বাঁধত না, দড়িতে ফাঁস লাগাত না। তারা জানে উজ্জ্বলতম দিন বলে বাস্তবে কিছু নেই, কিন্তু একান্ত গোপনে, প্রায় এক গুপ্ত রাজনৈতিক দলের বিশ্বস্ততায় বহন করে চলে, অনুভবে আর অনুরাগে গড়ে তোলা একটি কোমল স্বপ্ন। এই স্বপ্নটিতে সুখ লেগে আছে, অসম্ভব স্পর্শাতুর সেই স্বপ্ন প্রায় তাদের অস্তিত্বের সমার্থক। যেন-বা তারা নেহাত দায়ে পড়ে নিজেদের দু-টুকরো করেছে, খোলশটি তারা উপহার দিয়েছে একঘেয়ে বাস্তবতাকে আর অন্তর্বস্তু সরিয়ে নিয়েছে, লুকিয়ে ফেলেছে।

পরের দিনটি ছিল রবিবার, অমলের জীবিকায় রবিবার একটি ছুটির দিন হিসাবে আজও অনুপস্থিত। নীচে নেমে অন্ধকার, ঠাণ্ডা, শ্যাওলার বন্ধ ঘরটিতে ঢোকার জন্য তাকে পাকা একটি ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। অসম্ভব রোগা আর ফ্যাকাশে একজন মানুষ বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার পর সে ঢোকার সুযোগ পেল। ঐ অন্ধকারে নিজের শরীরও স্পষ্ট দেখা যায় না। আন্দাজে মাথায় জল ঢালতে হয়, ওপর থেকে চিৎকার শোনা যাচ্ছিল 'পারব না, আমি আর পারব না, অনেক সহ্য করেছি আর করব না।' এ জিনিসটা প্রলাপের মতো প্রায়ই বাড়িটির সিঁড়ি থেকে কার্নিশে প্রতিধ্বনিত হয়, সবাই জানে কিছুক্ষণ বাদেই এই চিৎকার থেমে যাবে।

কিছুদিন আগে নিয়ম জারি করে সংবাদ ছেঁটে দেওয়া হচ্ছিল এবং তার ফলে কাগজগুলো যে বিপুল সাদা অংশ উদ্বৃত্ত পেল, সেসবই ভরিয়ে দেওয়া হল নানারকম বিজ্ঞাপনে। বিজ্ঞাপনগুলো ছিল এরকম : দয়া করে আপনার দুলাখ টাকা নিয়ে যান একটি এক-টাকার টিকিট কেটে/পূর্ব কলকাতায় আপনার জন্য আমরা ফ্ল্যাট বানিয়েছি, এখন আপনি এলেই হয়/পরিবার-পরিকল্পনার জন্য আপনাকে আজ থেকে কিছুই করতে হবে না, স্বামী-স্ত্রীর যে-কোনো একজন চলে আসুন সরকারি হাসপাতালে/আজ থেকে কালোবাজারি, জাতপাত, অশিক্ষা, অসাম্য ও ক্রীতদাসপ্রথা নির্মূল করা হল।

প্রতিটি বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার নাগরিকদের ছিল, কিন্তু শহরের কোনো আদালতেই কেউ মামলা রুজু করেন নি। অথচ কিছুদিন আগে, অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের সাঁজোয়া বাহিনী কাগজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে অন্তত একবছর অমল প্রায় প্রতিদিন সরবরাহ করেছে আগ্নেয়াস্ত্রের সংবাদ। শহরটি যখন ব্রিটিশ সিংহের অধীনে ছিল সে সময়কার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন অমল দেখে নি। তার জন্ম স্বাধীনতার পরে, কিন্তু গত কয়েক বছরের মধ্যে সে আগ্নেয়াস্ত্রের এক পরিমণ্ডল, রাজপথে গুলির শব্দ, সমস্তই প্রত্যক্ষ করেছে। যেমন সে দেখেছে তখন শহরটি কী গভীর ভয় ও সন্দেহে আড়ষ্ট হয়ে যায় ; সন্দেহ, ভয় আর আগ্নেয় বিস্ফোরণ ক্ষণস্থায়ী শীতকালের মতোই দ্রুত মিলিয়ে গেল, এসে পড়ে প্রকৃত হিমযুগ। এই হিমযুগে প্রবেশ করার পর সে বুঝতে পেরেছিল অতীতে মূর্খের মতো বন্দুক-বোমার খবর সরবরাহ করে কী ভয়ংকর ক্ষতিকে সে ডেকে এনেছে। সংবাদগুলোও তখন যেন ধেয়ে আসছিল তার দিকে, কী সরল স্বতঃস্ফূর্ততায়, সে সন্দেহ করার কোনো অবকাশ পায় নি। অমল আজও বুঝতে পারে নি যে, ঐ তথ্যগুলো তার হাতে তুলে দিচ্ছিল একটি কঙ্কাল-হাত, তাকে নিয়ন্ত্রণ করছিল মৃত্যু! নিজের জীবনে অনুপস্থিত সাহসকে সে অতিনাটকীয়ভাবে উপস্থিত করে যাচ্ছিল খবরের কাগজে। বোকার মতো অনুভব করছিল রোমাঞ্চ, সাহস আর ভয়। হয়ে উঠছিল একজন ভুল যোদ্ধা। অতি সামান্য, মামুলি রিটেইনারের এই রূপান্তর তখন তার চালচলনেও কেমন এক অস্বাভাবিকতা এনেছিল, মনে আছে সেই ব্যস্ত দিনগুলিতে সুভদ্রা, ঊর্মিলা, বিধুবালা কী ভীতিপ্রদ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত অমলের মুখের দিকে। তাকে অনুরোধ করত ঘুমোতে, বলত যেন সব সময় পকেটে অফিসের চিঠি রাখে, সামান্য শরীর খারাপ হলে তারা জোর করত যাতে অমল সেদিন না বেরয়। অমল লক্ষ্য করেছিল জোর করে, চেষ্টা করে তারা অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফুটিয়ে তুলতে চাইত চোখে-মুখে। সামান্য কারণে, অকারণে অমলের শরীরে হাত রাখত, হয় তারা বিদ্রোহীদের ঘাতক ভেবেছিল অথবা অমল সম্পর্কে তাদের আশঙ্কা হচ্ছিল যে অমল কোনো ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত আছে।

চার

ক শহরটির জনসংখ্যার মধ্যে একটি আশ্চর্য ব্যাপার আছে—ছুটির দিন শহরটি জনসংখ্যার দিক থেকে বেশ হালকা হয়ে আসে। একমাত্র ছুটিছাটার দিনেই বোঝা যায়, না এ শহরে পায়রা আছে, লুকনো জমি আর ফাঁকা জায়গাগুলোও আত্মপ্রকাশ করে ছুটির দিনেই। তেমনি জানা যায় কিছু হতভাগ্য মানুষের কথা যাদের কোনো ছুটি নেই, যাদের কাজ না করার অর্থই হল সেই দিনটিতে ভুখা থাকা। এ শহরে একটি রাজনৈতিক দল আছে, তারা শুধু বন্ধ বা ধর্মঘটের দিনই স্মরণ করে এইসব মজুরদের, কারিগরদের। তারা তখন মানুষ নয়—ধর্মঘট আর বন্ধ বিরোধিতার যুক্তিমাত্র। কাজের দিনে শহরটি ভেসে, উপছে যায় মানুষের স্রোতে। ফলে ছুটির দিনের ফাঁকাভাব সব সময়ই ব্যতিক্রম, ভুতুড়ে। মৃত্যুর কথা মনে হয়। বাস-ট্রাম কমে আসে।

এন. মজুমদারের নামঠিকানা সংগ্রহ করতে অমলকে কোনো বেগ পেতে হয় নি, একটি টেলিফোন ডাইরেক্টরিই এজন্য যথেষ্ট ছিল। বেকবাগান বস্তির পাশেই কিছুটা জায়গা সাফ করে নেওয়া হয়েছে, সেই অংশটির চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা, ঝকঝকে। শহরমাত্রে বিভিন্নভাষাভাষী মানুষের একসঙ্গে থাকার সাধারণ লক্ষণটি এখানে যথেষ্ট পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে উপস্থিত। টেলিফোন ডাইরেক্টরির তালিকাভুক্ত মানুষদের অনেকেই এখানে থাকেন।

নীচে একটি জিপ ধুঁকছিল, ড্রাইভার সিটে বসে ঝিমোচ্ছে। ঝিমুনির কারণ রাতজাগা অতিপরিশ্রম নয়, বরং অতিরিক্ত মদ্যপান হতে পারে। সে যাই হোক, অমল লাল সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল তিনতলায়, এবার তাকে থমকে যেতে হল একটি কোলাপসিবল গেটের সামনে, গেটটি ভিতর থেকে তালাবন্ধ। রবিবার সকাল এগারোটায় এই অতি নিরাপত্তাবোধ তাকে স্তম্ভিত করে দিল। ভাবল শ্রীযুক্ত মজুমদার কি কোনো

বিপদের আশঙ্কা করছেন। ডানদিকের দেওয়ালে ছিল একটি সাদা বোতাম, অমল সেখানে আঙুল ছোঁয়াতেই বাড়িটি ঝমঝম শব্দে বেজে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন চিৎকার করে উঠল একপাল কুকুর।

সেই চিৎকার কোলাপসিবলের দরজার উপর দু জোড়া পা তুলে দিলে অমলকে তিনটি ধাপ নীচে নেমে যেতে হল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে এ জিনিসটাও খেয়াল রাখতে হল যাতে এন. মজুমদারের চোখে তাকে বেশ সপ্রতিভ লাগে। চেষ্টা করছিল ভাবতে যে সে নিজেও কুকুরপ্রেমী, অমল ভয়ে-ভয়ে দু-একবার হাত বাড়াবার চেষ্টা করল।

'দেখুন, আসলে হয়েছে কী, শহরে তো আর চাষ হয় না, ফলে সবটাই নির্ভর করছে প্রকিওরমেন্টের উপর...আপনি একটু বসুন, আমি আসছি।'

এন. মজুমদারের বসার ঘরটি কিছু পুরাকীর্তির নকল, লোকশিল্পের উদাহরণ, ফুড ডিস্ট্রিবিউশন, প্রকিওরমেন্ট, কাল্টিভেশন, ফুড ম্যানেজমেন্ট প্রভৃতি বইয়ে নিখুঁতভাবে সজ্জিত। ভদ্রলোক একনাগাড়ে থাকছিলেন না, বারবারই কী এক রহস্যজনক কারণে তাঁকে উঠে যেতে হচ্ছিল। ফলে কথাবার্তা হচ্ছিল ভীষণ টুকরো-টুকরোভাবে। 'থার্ডওয়ার্ল্ড', 'ইরোশান', 'গ্রীন রেভোলিউশন', 'পলিটিক্স অব ফুড', 'ফুড ফর পিপল' 'আন-ইভন ডিস্ট্রিবিউশন' ও 'পার্মানেন্ট ফেমিন'—এত সব আইডিয়া বেরিয়ে এল শ্রীযুক্ত মজুমদারের মুখ থেকে। এবং শেষে একটি অনুরোধ 'অনুগ্রহ করে একবার দেখিয়ে নিয়ে যাবেন...বুঝতেই পারছেন, আমি আর ফুড ডিপার্টমেন্টে নেই বললাম তো।'

এবার কোথায় যাচ্ছেন?

পরিবেশ দপ্তরে।

ফুড থেকে এনভায়ার্মেন্টে?

এনভায়ার্মেন্ট থেকে স্টীলেও যেতে পারি...

আচ্ছা...সকালের দিকটায় থাকেন তো, আমি ফোনেই আপনাকে শুনিয়ে নিতে চেষ্টা করব।

যদি লাইন পান।

এমন সময় দুটি চায়ের কাপ এসে যাওয়ায় অমলের ওঠা হল না, এন. মজুমদারকে তার আর কিছুই জিজ্ঞাসা করার নেই, তবু আগামী দশ মিনিট বোবা হয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। ফলে, সে বিষয়টিকে দপ্তরের বাইরে নিয়ে আসার চেষ্টা করল, ভাবল এবার তো দুজন মানুষ তাদের জীবিকাগত অস্তিত্ব ভুলে একটু অন্তরঙ্গ, ঢিলেঢালা কথাও বলতে পারে। তা ছাড়া, অমল তো একটু ভয়ই পেয়েছে—সত্যি যদি দুর্ভিক্ষ হঠাৎ বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়ে, সে যেন সত্যি ভিতরে-ভিতরে আঁতকে উঠেছে এমনভাবেই বলে ফেলল, 'কয়েক বছরের মধ্যে যদি রেশনিং ব্যবস্থা ধসে পড়ে তাহলে এ শহরের মানুষ তো শুকিয়ে মারা যাবে।' এন. মজুমদার বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না, বরং মৃদু হাসি হেসে বললেন 'সে আশঙ্কা একেবারেই নেই, গত দুর্ভিক্ষে যা ঘটেছিল এবারও তাই ঘটবে। আমাদের শহর থাকবে সম্পূর্ণ নিরাপদ, যেভাবেই হোক শহরের রেশনিং ব্যবস্থাকে টিঁকিয়ে রাখা হবে। তবে হ্যাঁ, গ্রামের মানুষ শহরে এসে মুখ থুবড়ে মরতে পারে।' 'কী ভয়ংকর!' এই মন্তব্যটি অমলের অজান্তেই উঠে আসে। যার পর মজুমদার বললেন, 'এর আগের বারের ঘটনার কথা ভাবলে কোন্‌টা বেশি ভয়ংকর বলা কঠিন, খবরের কাগজে অবশ্য মৃত্যুর সংখ্যা দিয়েই তা ঠিক করা হয়।'

ভয়ংকর আর নেতিবাচক একটি ঘটনা দৃষ্টির অগোচরে ধীরে গড়ে উঠছে, রহস্যগল্পের মতো তা সম্পূর্ণ ছক অনুযায়ী হয়তো এগোবে না, কারণ অজস্র ও বিপুলসংখ্যক মানুষের যোগদানই শেষ পর্যন্ত ঘটনাটির রূপে কিছু পরিবর্তন আনলেও আনতে পারে। যদিও একটি দুর্ভিক্ষ থেকে আরেকটি দুর্ভিক্ষ পর্যন্ত আসতে ক শহরের প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে, তবু দুর্ভিক্ষের প্রশ্নে শহরটিতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নি। অতীতেও কিছু-কিছু মানুষ আঁচ করতে পেরেছিল এরকম কিছু একটা ঘটতে চলেছে, অমল সে-কাহিনী বাবার মুখেই শুনেছিল। অথচ তারা কেউই এ বিষয়ে মানুষজনকে সতর্ক করে দেয় নি, রহস্যজনক ভয় আর সময়ের শুভ দিকটিকে কল্পনা করে, তাকে দেবতা ভেবে, আশা করেছিল দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর প্রলয় তাদের ছোঁবে না। তারা ঠিক বেঁচে যাবে, আসলে তা ছিল শর্তহীন আত্মসমর্পণ। অন্যদিকে ব্যাপক বিনাশের আশংকা সর্বতোভাবে যুক্তি আর প্রমাণ দিয়ে উপস্থিত করার মতো অবস্থায় না থাকায়, বৃত্তান্তটি হয়ে পড়েছিল দুর্দশার এক রূপকথা। এরকম অগোছালো আবহাওয়ায়, সন্দেহ আর ভয়ের মধ্যে বিশ্বাস, আস্থা এসব টিঁকিয়ে রাখা কঠিন। সত্যের এই আকস্মিকতা, নাটকীয়তার দিকটি বড় করুণ, আবার তাকে অনুসরণ করা, বোঝার চেষ্টা করতে-করতে বিপদ হাড় গুঁড়িয়ে দিয়ে যায়।

এন. মজুমদারের আশ্বাস অমলকে খুব একটা ছুঁতে পারল না। শহরটি নিরাপদ জেনে সে তেমন কোনো স্বস্তি বোধ করছে না, বরং আরও বেশি ভৌতিক লাগছে সবকিছু। ক শহরটিকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ মনে হল, মানচিত্রের যেখানেই তাকে রাখা হোক না কেন, দেখা যাবে শহরটির বাইরে, চতুর্দিকে ছুটে যাচ্ছে নীল আগুন। এই আগুনই আবার আকর্ষণ করছে, টেনে আনছে মানচিত্রের অপরাপর অংশকে ঐ আগুনের বলয়ে। অথচ সে নিজে কী অপরিসীম স্বাভাবিক, প্রতিদিনের মতো বিশ্বাস্য, প্রশস্ত রাস্তায় ছড়িয়ে আছে গভীর ঔদার্য। এতসব কিছুকে ভাস্কর্যে-ভাস্কর্যে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এক শিল্প-ধর্মে। এই গম্ভীর সৌন্দর্যই কি শহরটির দিকে হাত প্রসারিত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়! তা ছাড়া, শহরটি ঝকঝকে করে তোলার অন্তত এক হাজারটি পরিকল্পনা বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন দপ্তরে, টানানো হয়েছে একটি হোর্ডিং, তাতে দেখা যাচ্ছে ক শহরটির বুকের পাশে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে দুটি ডানা। ফলে দুর্ভিক্ষ আবার এত অলীক ভয় হয়ে ওঠে যে, ধারণা হতে পারে এ ধরনের বিপদ নিয়ে যারা আশঙ্কা প্রকাশ করছে তারা মানসিক-রোগগ্রস্ত।

ফিরে এসে অমল সুকোমল গাঙ্গুলিকে ফোনে ধরতে চেষ্টা করল, পোস্টাপিসের ফোন যেন আরও একটু স্বতন্ত্র, প্রায় পনেরো মিনিট চেষ্টা করার পর সবে লাইনটা পেয়েছে, এমন সময় অপরিচিত মানুষের কথাবার্তায় তাকে ঢুকে পড়তে হয় প্রায়। সে আড়ি পাততে চেয়েছিল এমন নয়, বরং সে এবং সুকোমল গাঙ্গুলি কথা বলছে, আবার অন্য দুজন মানুষ কথা বলছে, এই দুটি জিনিস পরস্পরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

'সময়কে মেনে নেওয়া ছাড়া কীই বা উপায়'..., 'তুমি মজুমদারকে পেলে', 'সত্যি আমরা সংশয়াকুল সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি', 'পেয়েছি তবে...' 'নাহলে ভাবুন পত্রিকাটা এভাবে উঠে যায়?', 'আজই লিখে ফেলো, কাল বারোটার মধ্যে এসো', 'সময়ের ভূমিকা নিয়ে...' 'সমস্যা হল' 'খুবই কঠিন সময়ের...' 'লেখাটা তো লিখে ফেলো, পরে নাহয়' 'আমার কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে, পঞ্চান্ন চলছে, আর পারব না নতুন করে', 'সুকোমলদা, শুনুন, রেশনিং ব্যবস্থার পয়েন্ট নয়, ফেমিনের আশঙ্কা করা হচ্ছে, শুনছেন, হ্যালো' লাইন কেটে গেল কিন্তু অপরিচিত দুজন মানুষের সময় নিয়ে কথাবার্তা তখন আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল যদিও অমল ফোন রেখে দেয়।

বেকবাগান পোস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে আসার পর কিছুক্ষণ কেটে যায় কোন্ দিকে যাবে সেই ভাবনায়। চট করে মনস্থির করতে পারছিল না, যেভাবে হোক তাকে আজকের মধ্যে কাজটা শেষ করতে হবে। যদিও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না কাজটা কী, সুকোমল গাঙ্গুলি এমন একটি লেখা পেলেই সন্তুষ্ট হবে যা বর্ণনামূলক, আঁটোসাঁটো, একটা কিছু বক্তব্যও থাকা দরকার, তবে বক্তব্যটি বর্ণনার মধ্যে যেন আত্মগোপন করে থাকে। আর এক্ষেত্রে বক্তব্যটি তো অমলের মস্তিষ্কেও নেই, বক্তব্য এমন চতুরভাবে আত্মগোপন করেছে যে আজকের দিনটির মধ্যে তাকে খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য। ফলে অনুপুঙ্খ বর্ণনা, খাদ্যদপ্তরের কয়েকটি পরিভাষা এবং খাদ্য সংগ্রহের সমস্যাগত দিকটি এমনভাবে তুলে ধরতে হবে যাতে বোঝা যায় খাদ্যসমস্যা বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া একান্ত দরকার। তবে তা এন. মজুমদার-কথিত দুর্ভিক্ষের ঠিক কোনো পদধ্বনি নয়। বরং ৩৫-৩৬ বছর আগে যে মহাদুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তারপর থেকে এই ৭৮ সাল পর্যন্ত, প্রতি বছরই খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন কাগজে নিয়মিত লেখা বেরিয়েছে। এমনকি এই-সমস্ত লেখাকে সংহত করে নিয়ে এলে দেখা যাবে মোট আর মূল লেখা আসলে ৪টি থেকে ৫টি। বাকি লেখাগুলো যেন প্রতিটি দিনে উপস্থিত, স্থায়ী দুর্ভিক্ষের হালকা ছায়ামাত্র। অমলকে ঠিক এরকমই একটি ছায়া রচনা করতে হবে।

[ক্রমশ

জাহাজী গল্প

অমৃতময় মুখোপাধ্যায়

অবসর-পাওয়া, ঢিমেতালে চলা রোজকার সংসার। শীতের দিনে বাড়ির সামনের জমিটায়—সেটাকে বাগান বললে অত্যুক্তি হবে—সকালবেলায় এসে বসি। তখনো পথটা কুয়াশায় ঢেকে থাকে—কেবল পথে-চলা লোকেদের কথাগুলো যেন বেশি জোর হয়ে ভেসে আসে। তাকিয়ে মনে হয় যেন একটা জাপানি ছবি দেখছি—আধুনিক জাপানের রঙচঙে পোস্টকার্ড নয়, সেকালের প্রথায় তুলির কয়েকটা আঁচড়ের আভাসে আঁকা ছবি। তারপর রোদের তেজ বাড়লে কুয়াশাটা ফিকে হয়ে গিয়ে পথটা বেরিয়ে পড়ে—প্রথমে যে অংশটায় দুপাশে গাছ নেই সেইটাই পরিষ্কার হয়। তখন নজরে পড়ে মেয়েরা লম্বা সারি দিয়ে দলবেঁধে চলেছে জঙ্গলের ধার থেকে কাঠ কুড়োতে। পুরুষমানুষও থাকে মাঝে মাঝে, তাদের হাতে ছোট কুড়ুল—বনের ভিতর ঢুকে কাঠ কাটবে বলে। উলটোদিক থেকে বাজারের দিকেও আসে কিছু লোক। মেয়েরা নিয়ে চলে দুটো লাউ বা কুমড়ো, এক-ঝুড়ি বেগুন বা ঢ্যাঁড়স। পুরুষরা নিয়ে যায় বাঁকে করে চাল, গম, মকাই, বালতি করে দুধ। এদের বোঝাগুলো ভারি বলে পথে চলতে চলতেই কথা বলে নেয়—হয়তো একটু জোরে চেঁচিয়ে। মেয়েরা পরিচিত কারুর সঙ্গে কথা বলে পথের মাঝে থেমে, কেউ বা পথের ধারে বসে কথা বলতে বলতে জিরিয়ে নেয়।

সকালের মিঠে রোদে বসে চা খেতে খেতে এইসব দেখি। একটু বাদে বাজারের সঙ্গে মফস্বল সংস্করণের খবরের কাগজ আসে। বড় খবরগুলো বেতারের কৃপায় আগেই জানা থাকে, তাই চুটকি খবরগুলো ধীরে ধীরে পড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে যেন হজম করি।

একটা রেলের ইস্টিশান আছে, তাই এটাকে শহর বলে দাবি করা হয়—নয়তো একটা পাকা রাস্তার দুধারে যে কটা দোকান আছে সেরকমটা যে-কোনো বর্ধিষ্ণু গ্রামে দেখা যায়।

তাই জায়গাটাকে মনে হয় না-গ্রাম না-শহর।

চাকরিতে ঢোকার সময় যেমন ছিল, বিশ বছরের উপর চাকরি করে ফিরে এসেও দেখি সেইরকমই আছে। না এসেছে বিজলি লাইন, না হয়েছে পেট্রল পাম্প। সিনেমা বা মোটরগাড়ি চোখে পড়ে না।

ইস্টিশান থেকে বেরিয়ে গোরুর গাড়ি না নিলে

শ্রীচরণ ভরসা। অবশ্য আগে থেকে বলে রাখলে রঘু সিং-এর একাটা আসে আরোহী নিতে।

প্রথম যখন চাকরিতে অবসর নিয়ে এখানে এলাম তখন ভাবনা ছিল সময় কাটবে কী করে। অনেকগুলি পেনসন-পাওয়া অখণ্ড অবসরের লোকদের দেখে মনে ভয় জন্মেছিল। কর্মঠ শিক্ষিত লোকগুলো কিরকম ঘরকন্নার কাজে গৃহিণীর উপর গিন্নিপনা করে, চেয়ারে জবুথবু হয়ে বসে যায়। তাদের দিনগুলো তাদের আর অন্যদের কাছেও যেন একটা বোঝা হয়ে থাকে। কার্যক্ষেত্রে দেখলাম, অবসর নিয়ে যেন কাজ আমার আরো বেড়ে গেল। যে কাজগুলো সময়সাপেক্ষ বলে চাকুরে মানুষকে রেহাই দেওয়া হত সেগুলো বিনাদ্বিধায় এবার আমার ঘাড়ে চাপানো হয়। ফলে অবসরেরই অভাব, কাজের নয়।

একটা জিনিস অবশ্য হচ্ছে, যেটা আগে নানা কারণে সম্ভব হত না—সেটা হল রোজ সন্ধ্যায় দিনের হিসেব লেখা। লণ্ঠন জেলে জমাখরচ লিখতে লিখতে অনেক সময় পুরোনো জীবনের জমাখরচের কথাও মনে আসে। তবে হিসেব করে দেখি না, কারণ এতদূর থেকে পিছনে তাকালে আলেখ্যটার ভারসাম্য বদলে যায়—ক্যামেরার লেন্স বদলানোর মতো—ওয়াইড অ্যাংগল থেকে টিলি-ফোটোর বদলের মতো। আগে যেগুলোকে মস্ত বড় জিনিস মনে হয়েছিল সেগুলোর অনেক কিছুই তুচ্ছ হয়ে দাঁড়ায়, আবার অনেক নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ঘটনা এক লহমার জন্য সব খুঁটিনাটি সহ জীবন্ত হয়ে দাঁড়ায়।

সেদিন সকালবেলা খবরের কাগজটা দিয়ে রোদটাকে আড়াল করে খবরগুলোকে চাখছি, এমন সময় কানে এল রাস্তার দিক থেকে এগিয়ে আসতে আসতে কে বলছে, 'সেই হাড়কাটা ডাক্তার গেল কোথায়?'

কথাটা মগজে ঢুকতে একটু সময় লাগল, কারণ জাহাজী জীবনের ঐ নামকরণটা অনেকদিন হারিয়ে গিয়েছিল। ওর উৎপত্তি সেই যুগে যখন ইংরাজি হটাবার উৎসাহে সদ্য-স্বাধীন ভারতবর্ষে পরিভাষা তৈরি হচ্ছে। জাহাজে অফিসারদের ওয়ার্ডরুম বা বসবার ঘরে তাই নিয়ে সন্ধ্যাবেলা আলোচনা হয়। জাহাজের ইলেকট্রিক্যাল অফিসারকে সকলেই সংক্ষেপে ডাকে 'এল ও' বলে। আমাদের 'এল ও' লেফটেনেন্ট জীবনলাল হিন্দির উগ্র পক্ষপাতী। তাকে একজন বললেন, হিন্দি করে তোমায় পোতপাল জীবনলাল বিজলীওয়ালা বলা মুশকিল—বড্ড বড়। আরেকজন বললেন, তাহলে ডাক্তারের সার্জেন লেফটানেন্টকে বরং বেশ ছোটভাবে 'শল্যপাল' বলা যায়। আমার কী দুর্মতি হয়েছিল, ঠাট্টা করে বলেছিলাম, 'সহজ ভাষা চাও? তা, সেযুগে ইংরেজ নাবিকরা ডাক্তারকে স-বোস বলত, সেটাকে 'হাড়কাটা' বলা যায়। সেই থেকে বেশ কয়েকদিন এটা আমার ডাকনাম দাঁড়িয়েছিল।

এতদিন বাদে ঐ বিশেষণ শুনে কাগজটা সরিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। পাকা চুল-দাড়ি, সব কমছাট, চোখ দুটো ছোট ছোট, জ্বলজ্বল করছে, রেখাপড়া গাল, কপাল রোদে পুড়েও এখনো ফরসা। অনেকদিন বাদে দেখা বলে যদি বা না চিনতে পারতাম ঐ বাজখাঁই গলাটা ভুল হবার নয়। আমার অনেকদিন আগেই জাহাজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সান্যাল মশাই চাইবাসায় বসবাস করছিলেন। আগেই কিছু জমি কিনেছিলেন চাষাবাদ করবেন বলে। যতদিন উনি চাকরি করতেন ততদিন ওঁর মা জমির দেখাশুনা করতেন। আশা করেছিলেন ছেলে ফিরলে তিনি অব্যাহতি পাবেন। কিন্তু সান্যালমশাই ওখানে এসে ক্রমশ ওখানকার নানারকম জনহিতকর অথচ ভোট-পাওয়া-যায়-না এরকম কতকগুলো কাজে জড়িয়ে পড়েন। সেই কাজে এখানে ওখানে ছোটাছুটিও করেন, সে খবরও লোকমুখে শুনেছিলাম। যে খবরটা দিয়েছিল সে বলেছিল, 'কাঁধে একটা ঝোলা, পিঠে একটা ছোট বোঁচকা। কড়া রোদে বা মুষলধারার বৃষ্টিতে পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমালটাকে নিয়ে মাথায় জড়ায়। দেখলে বিশ্বাস করা যায় না যে এই লোকটাই একদিন ইংলন্ডের রাজকীয় নৌবাহিনীর অফিসার ছিল।'

সান্যালমশাই আমার পা রাখার মোড়াটা টেনে নিয়ে বসে বললেন, 'এ পথে যাচ্ছিলাম। ইস্টিশানের নামটা দেখে মনে হল যে তুমি তো এখানেই থাক; তাই নেমে পড়লাম। খুঁজে পেতে কষ্ট হয় নি।'

জিগ্যেস করলাম, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

বললেন, 'অনেক জায়গায় যেতে হবে। তা ছাড়াও এখানে ওখানে ইচ্ছে হলে নেমে পড়ি। আমার সংসার তো সঙ্গেই।'

প্রশ্ন করলাম, 'কবে বেরুলেন? আপনার অনুপস্থিতিতে মাকে কে দেখবে?'

বললেন, 'মাঘী পূর্ণিমার পরদিন। মায়ের জন্য কিছু আতপচাল, ডাল আর ঘি দিয়ে এলুম। বললুম, এরপর হয়তো এমন দিন আসবে আর ঘি দেবার সামর্থ্য থাকবে না—এইবেলা খেয়ে নাও। মা তো নিরামিষাশী, তাই বিড়ম্বনা বিশেষ নেই। আজকাল খাওয়াটা সহজ হয়ে গেছে। পাঁউরুটি আর দুধে—শীতকালে অধিকাংশ রাতে আর হ্যাংগামা নেই, একটু কাঠকুটো জেলে দুধটা গরম করে রুটি ডুবিয়ে খেয়ে নাও। দাঁত না থাকলেও কষ্ট নেই।'

দুপুরবেলা খাওয়ার পর পুরোনো বন্ধুরা কে কোথায় আছে, কী করছে সেই কথা হচ্ছিল। অতীতে ফোজে থেকেছে, এরকম দুজনায় দেখা হলে এ আলোচনাটা হামেশাই হয়। কথাপ্রসঙ্গে সান্যালমশাই বললেন, 'আরে জানলে, লাড্ডুর সঙ্গে দেখা আসানসোল ইস্টিশানের প্ল্যাটফর্মে।' কিছুটা আশ্চর্য হয়ে জিগ্যেস করলাম, 'লাড্ডু আবার আসানসোলে কী করছে?' ওরফে লাড্ডু, আসলে লাজপৎ রায় দুগ্গাল—দিল্লীর লোক। পেশায় ইনজিনীয়র। লোকটা বেঁটে-মোটা, মাথাভরা টাক আর মুখ নাড়লে গলায় ত্রিবলির জায়গায় তিনটে চর্বিভরা থলি—যেন নড়ে উঠত। ও সুবিধে পেলেই কোচের উপর পা তুলে বসত—তখন ওকে দেখাত আহ্লাদি পুতুল বা চিনেমাটির ম্যান্ডারিনের মতো। ঐ পা তোলার জন্য অনেকে তাকে ঠাট্টা করেছে, বিরক্তিও প্রকাশ করেছে কিন্তু লাড্ডু ভ্রূক্ষেপ করত না, বলত, 'থক গিয়া জনাব, থক গিয়া।' সেই কথা দুজনেরই বোধহয় একসঙ্গে মনে পড়ে গেল। সান্যালমশাই বললেন, 'এখন শুনলাম লাড্ডুর মতো বসাই হল প্রায় চালু ব্যবস্থা। চেয়ারে সোজা হয়ে কম লোকই বসে।'

'অবশ্য জাহাজই তো এদের ঘরবাড়ি, একটু আরাম করে বসলে দোষ কী? ওরা তো ফরাস তাকিয়া চাইছে না।'

সান্যাল একটু দমে গেলেন, 'আমরা কিন্তু ঐরকমটা ভাবতে পারি না। আমাদের সময়ে সাহেবরা তো সাহেব ছিলই, দেশী যে দু-চারজন ছিল তারাও সজ্ঞানে বা অজ্ঞানেও ঠিক সাহেবদের মতোই ব্যবহার করত।'

আমি জিগ্যেস করলাম (যদিও উত্তরটা আংশিক জানা ছিল), 'ঐসব উগ্র সাহেবদের মধ্যে আপনার মতো সাত্ত্বিক লোক জুটল কী করে?'

সান্যালমশাই যে সাত্ত্বিক, সে লোক ছিলেন, সেকথা কেউ প্রশ্ন করতে পারত না। মদ সিগারেট তো দূরের কথা, মুখ থেকে গালাগাল পর্যন্ত বার হত না। জাহাজে নিজের ক্যাবিনে রোজ সকালে পুজো করতেন। অকূল সমুদ্রে মেঘের জন্য সূর্য দেখতে না পেলে জাহাজ কোন্‌দিকে মুখ করে চলেছে জেনে নিয়ে সেই অনুপাতে বসতেন।

সান্যালমশাই একটু হেসে বললেন, 'সে মজার ব্যাপার। জানেন তো, ভাগ্য টানে। ছিলাম মধ্যপ্রদেশে ওষুধের কারখানার ফার্মাসিস্ট—প্রাণের শখ ছিল প্রোফেসার হব, ছাত্ররা সম্ভ্রমভরে তাকাবে। তাই সেই পাড়াগাঁয়ে বসে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম নেভিতে ইস্কুল মাস্টার চায়। মাইনেও খারাপ নয়। দিলাম দরখাস্ত করে। ইন্টারভিউ দিলাম। তারপর চিঠি এল যে যোগ দিলে আমায় চাঁফ পোর্ট অফিসার করে বহাল করা হবে। সঙ্গে রেলের কাগজ। আমাদের একটিমাত্র আত্মীয় ছিল ফৌজে। সে ডাক্তার হয়ে সবে যোগ দিয়েছে—বলত কয়েক-হাজার টাকা মাইনে পায়। আমার মাইনের অংকটা সেরকম কিছু নয়। বাড়িতে সে নিয়ে আলোচনা হল। মামা বলল, "ধেত, এই বয়সে কাউকে অত মাইনে দেয় না কি? ম্যাজিস্টেটের চেয়েও বেশি। ওসব ওদের বাড়িয়ে বলা।' বাবা বললেন, 'যখন বলছে পদবীর সামনে 'চাঁফ', আর শেষে 'অফিসার' বলেই দিচ্ছে, তখন চাকরিটা নিতান্ত বাজে হবে না।' শেষ পর্যন্ত কারখানায় ইস্তফা-চিঠি দিয়ে বাক্সবিছানা নিয়ে বম্বে রওনা হলাম। অফিসারদের কোট টাই নিশ্চয়ই পরতে হয়, তাই চাঁদনি থেকে একটা সুট আর একটা টাই নিয়েছিলাম। টাই-এর সবটাই প্রায় কোটের তলায় থাকবে, তাই সস্তা দেখেই কিনেছিলাম।

সেই সাজ পরে বম্বের ভিকটোরিয়া টার্মিনাস ইস্টিশানে নেমে একটা কুলির মাথায় বাক্স চড়িয়ে প্রায় খালি প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে কুলির কথামত আর. টি. ও.-র দপ্তরে হাজির হলাম। সেখানে নেভির সাদা পোশাকে এক গোরা সাহেব দাঁড়িয়ে ছিল—ইয়া লম্বাচওড়া—ডান হাতের কাপড়ের উপর দুটো নোঙ্গর

X-এর মতো করে সেলাই করা। কাছে গিয়ে বেশ সম্ভ্রম করে বললাম, 'মাপ করবেন, আমি, ইয়ে, নেভিতে যোগ দিতে এসেছি'—বলে আমার কাগজটা মেলে ধরলাম। সাহেব আমার আপাদমস্তক দেখে কাগজটা দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে বললেন, 'সানিয়েল হর্ন, ব্যারাক্‌স্ যাবে?' কথাটা প্রশ্ন বা সিদ্ধান্ত বুঝতে পারলাম না, তাই খুব বিনীতভাবে বললাম, 'আজ্ঞে স্যার।'

লোকটা গম্ভীরভাবে বললে, 'আমায় স্যার বলবে না। পোর্ট অফিসার বা চাঁফ বলতে পার।' একটু লজ্জা পেয়ে বললাম, 'আজ্ঞে স্যার, মানে, চাঁফ।' হঠাৎ চৈতন্য হল যে তাহলে কদিন বাদে আমিও ঐরকম নোঙ্গর-জড়ানো সাজই পরব। বেশ আত্মপ্রসাদ হল। সে বলে চলল, 'তোমার বাস চলে গেছে। পরেরটা ছাড়তে আধঘণ্টা দেরি আছে।' তারপর যেন গোপন কিছু বলছে এমনভাবে বললে, 'ইয়োর নট ইজ অরি।' বুঝতে না পেরে বললাম, 'ওয়াট?' সে এবার বেশ চেঁচিয়েই বললে, 'তোমার টাইয়ের ফাঁসটা ঠিক নেই। ওয়েটিং-রুমের আয়নায় ঠিক করে এসো।' টাই-বাঁধা তো শিখি নি কখনও। ওয়েটিংরুমের আয়নার সামনে যতই বাঁধি, সাহেবদের ছবিতে যেমন সিঙ্গাড়ার মতো ফাঁস, তা কিছুতেই হয় না। এদিকে হাতের ঘাম লেগে টাইয়ের রঙ উঠছে, সেটা আঙুল থেকে শার্টের কলারে লাগছে। শিগ্রী অবস্থা। একজন কালো বেঁটে লোক অনেকক্ষণ থেকে আমার দিকে বসে বসে দেখছিল। সে এসে বললে, বেঁধে দেব?' তারপর চট করে বেঁধে আমায় হাত ধুতে পাঠিয়ে দিলে। সেই থেকেই আবদাল্লার সঙ্গে আমার পরিচয়।'

আমি অবাক্ হয়ে জিগেস করলাম, 'আমাদের নেভাল পুলিশের আবদাল্লা?' সান্যালমশাই বললেন, 'হ্যাঁ, তখনো ও পুলিশে যায়নি। ছিল স্টোকার—কয়লা-জ্বালানো জাহাজের যুগের লোক ও। শুনেছ তো ওর কাছে সেযুগের গল্প?'

চাচা আবদাল্লাকে চেনে না, আমাদের সময়ে নেভিতে এমন লোক বোধহয় ছিল না। আমি যখন দেখেছি তখন সে বুড়ো হয়ে পেনশন পেয়ে গেছে—নিজস্ব দাঁত একটাও নেই, চশমা খুললে কিছু দেখতে পায় না। একটু চললেই হাঁফ ধরে বলে আমার সিক্‌বে-তে (জাহাজের দাওয়াখানা) আসত—সব রোগী দেখা সারা হয়ে যাবার পর। ওষুধ নিত, গল্প করত, অন্যান্য জাহাজের খবর দিত। আবদাল্লাকে কেউ কোথাও আটকাত না। নেভির সর্বময় কর্তারা, বম্বের পুলিশের বড় সাহেবরা থেকে নবাগত রংরুট পর্যন্ত সকলে তাকে কেবল চিনত তা নয়, খাতির করত। সারাদিন সে কারুর না কারুর উপকার করছে। আর সন্ধে হলে একবোতল নেভির রাম আর একজগ বরফজল নিয়ে বারের এককোণে একটা টেবিলে বসে আপনমনে খেয়ে যেত আর সকলের আলোচনা শুনত। নেহাত ওকে সোজা প্রশ্ন না করলে কথাও বলত না। তারপর সময় হয়ে গেলে উঠে গেট পার হয়ে নিজের ডেরায় চলে যেত।

সান্যালমশাই বলে চলেন, 'বাস যাকে বললে, গিয়ে দেখি সেটা হল তেরপলঢাকা ঢাউস মিলিটারি ট্রাক—তখন ঐ তিনটনের লরিগুলোকেই দৈত্যের মতো বড় মনে হত। তাতে সাদা কালো হলদে ব্রাউন নানা জাতের নাবিক সব—পোশাক-পরা আর সঙ্গে একটা করে বড় পাশবালিশের খোলের ভিতর পোরা জিনিসপত্র—সেই প্রথম কিটব্যাগ দেখলাম। ব্যারাকসে গাড়ি থামতেই লোকগুলো গটগট করে নেমে পড়ল। শেষ সাহেবটা নামবার সময় 'আরো কোথাও যাবে নাকি দোস্ত?' বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই চলে গেল। নেমে কুলি গোছের কাউকে না পেয়ে সেই আর্য ফ্যাক্টরির "বেস্ট কোয়ালিটি স্টীল ট্রাংক" নিজেই বয়ে নিয়ে চললাম। সামনেই উঁচু পাঁচিলের মধ্যে বসানো যেন দুর্গের গেট। একটু যেতে যেতেই হাত মনে হচ্ছিল খসে যাচ্ছে, কিন্তু নিরুপায়। সেই থেকে হালকা হাতে চলা রপ্ত করেছি। এখন পথেঘাটে লোককে মালপত্র নিয়ে বিব্রত দেখলে অনুকম্পা হয়।

সেদিন কাসল ব্যারাকসে ঢোকবার সময় জানতামও না, ভাবিও নি যে, এটা একটা বিশেষ জায়গা। তবে ঢুকে মনে হল এ যেন অন্য রাজ্যে এসে পড়লাম। একএকবার বিউগল বাজে আর কতগুলো লোক দৌড়ায়—সকলেই যেন ব্যস্ত। তারপর ক্রমশ ঐ রুটিনে অভ্যাস হয়ে গেল। আজকাল তো ছেলেগুলো ভালো খেতে পায়, কাজকর্ম ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে শেখবার ফুরসত পায়। তখন খাবার দেখে তো আমার মতো বঙ্গসন্তানের কান্না আসত; আর কী অবিশ্বাস্য রকমের

কড়া শাসন। দেশীদের মধ্যে তো বেশির ভাগ ছিল পশ্চিম পাঞ্জাব, কংকন আর চাটগাঁয়ের মুসলমান। দিনরাত কোথা দিয়ে কেটে যেত ভাববার অবসরও ছিল না। সেই ভোর থেকে আরম্ভ হত—পিটি, প্যারেড, বন্দুক নিয়ে ড্রিল, কাটলাস নিয়ে ড্রিল, দড়ি-বাঁধা, দাঁড়টানা, নৌকা চালানো, আলো দিয়ে সংকেত করা, পাঁচিল টপকানো, সাঁতার দেওয়া, জাহাজের প্রত্যেক অংশের নাম, কিভাবে বিছানা পাততে হয়, কাপড় পাট করতে হয়, বুট পালিশ করতে হয়, বাঁশি বাজাতে (নেভির ভাষায় "পাইপ করা") হয়,—সবকিছুর বাঁধা প্রথা—আর এতটুকু এদিক ওদিক হয়েছে তো গালা-গালি ছাড়াও কিল চড় থাপ্পড়। ভোরবেলা মাঝে মাঝে লরি বোঝাই করে শহরের বাইরে গিয়ে চাঁদমারিতে গুলি চালানো, আবার বিকেলে ফিরে মাঠে ফুটবল, হকি, ভলিবল, বক্সিং। সন্ধে হতে না হতেই রাতের খাওয়ার পালা খতম। গোড়ায় গোড়ায় কান্না আসত, এ কোথায় এলাম—অবশ্য ভাববারও অবসর থাকত না। বিছানায় গা ঠেকানো মাত্রই মড়া।

তারপর ধীরে ধীরে ধাতস্থ হয়ে গেল—দৌড়ে দৌড়ে চলা, চলতে চলতে স্যালুট করা, কোন বাঁশির কী অর্থ, বিউগেলে কী সুর বাজলে থমকে দাঁড়াতে হবে, কোন সুরে চলতে হবে। এখন মনে হয়, আমার পক্ষে সবচেয়ে বড় জিনিস যা হয়েছিল সেটা হল বিনা প্রশ্নে কথা শোনার বাধ্যতা আর একটা আত্মপ্রত্যয় যে আমি যা বলছি আমার লোকেরা যথাসাধ্য সেটা করবেই। এটা আমাদের মাথায় বসে গিয়েছিল যে ভুল করেছ কি সবান্ধবে মরেছ। ক্যাপটেন থেকে সবচেয়ে আনকোরা নতুন নাবিক—কারুর গাফিলতি হলেই গেলে। হয় অন্যকে মারতে হবে নয়ত নিজে মরবে—একলা তুমি নও, পুরো জাহাজ—তাই মনোযোগের শেষ বিন্দুপর্যন্ত প্রতিমুহূর্তে ব্যবহার করতেই হবে। আজকালকার যুদ্ধ তার তুলনায় অনেক বেশি যান্ত্রিক হয়ে গেছে। এখন আর "লুক-আউট"কে চোখে দূরবীন এঁটে থাকতে হয় না, "রাডার" দেখিয়ে দেয়। যন্তরেই অঙ্ক কষে বলে যায় কী অ্যাংগেলে কত রেনজে গোলা মারলে ঠিক লাগবে। কিন্তু জান? ঐ শিক্ষার গুণে পুরানো নেভির লোকেরা অনেকেই করে খাচ্ছে। পবিত্রকে মনে পড়ে? তোমার বাড়িতেই দেখা হয়েছিল। আমাকে দেখেই পায়ে হাত দিয়ে মাস্টারমশাই বলে পেন্নাম করলে আর আমি অপ্রস্তুত, চিনতেই পারছিলাম না।'

মনে পড়ল। পবিত্রর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা বম্বের কাছে একটা জেলেদের গ্রামে। আমি গিয়েছিলাম ক্যামেরা কাঁধে বেড়াতে, আর সে বসে বসে ছবি আঁক-ছিল। পরিচয়ে আমি নেভির লোক জানতে পেরে খুব উৎসাহভরে ভাব করে। জানাশোনা হবার পর সে প্রায়ই বলত যে তার উন্নতির উৎস নেভিতে শেখা ডিসিপ্লিন। বাড়ি থেকে পালিয়ে কুলির কাজ, রেস্টুরেন্টে চাকরের কাজ ইত্যাদি করার পর নেভিতে নাম লিখিয়েছিল। যুদ্ধ থেমে যেতে ছাঁটাই হয়ে যায়। এরপর আবার লেখা-পড়া করে।

লোকটা তখন বম্বের এক নামী প্রতিষ্ঠানে ভালো কাজ করে। ফ্ল্যাট কিনেছিল এমন জায়গায় যে বম্বে বন্দরে নৌবহরের জাহাজগুলো তার পাঁচতলার জানলা থেকে দেখা যেত। বাড়িতে থাকলে জাহাজে সূর্যাস্তের বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে জানলায় গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জাহাজের নিশানের দিকে তাকিয়ে নেভির কায়-দায় সেলাম করত। যেন সে এখনও নেভির লোক।

যুদ্ধজাহাজের নিয়ম—সূর্যোদয়ের সময়ে নিশান তোলা হয় আর সূর্যাস্তের সময় নামিয়ে নেওয়া হয়। এই দুই সময়ে বাঁশি বা বিউগেলে সংকেত করা হয় আর কাছাকাছি যে যেখানে থাকে নিশানের দিকে মুখ ফেরায় আর স্যালুট করে।

আমি খোঁজ করলাম, 'এখন সে কোথায়? আপনার সঙ্গে যোগাযোগ আছে?'

সান্যালমশাই বললেন, 'চিত্তপ্রসাদ বলেছিল, ইউ-রোপে নিজস্ব একটা কারবার চালাচ্ছে। নেভাল মিউ-টিনির সময় চিত্ত গাদা-গাদা স্কেচ করেছিল—হাজার-খানেক হবে। সেগুলো কেনবার জন্য পবিত্র মোটারকম অফার দিয়েছিল কিন্তু চিত্ত বেচতে রাজি হয় নি।'

আমি আশ্চর্য হয়ে জিগেস করি, 'আর্টিস্ট চিত্ত-প্রসাদের কথা বলছেন? তাকে আবার আপনি চিনলেন কী করে?' সান্যালমশাই হাসেন, 'আঁধেরির কাছে একটা ঘরে চিত্ত খুব পুতুল নাচাত। এক চেকোস্লো-ভাক সাহেব আমাকে ঠিকানা খুঁজে দেবার জন্য সাথে নিয়ে গিয়েছিল।'

এমনি করে নানা কথায় দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে যায়।

সারাদিন যে পশ্চিমে হাওয়া শুকনো পাতাগুলোকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেলে মাটিতে পেতে দিচ্ছিল, বিকেলের পর থেকে তার বেগ বাড়িয়ে পড়া পাতাগুলোকে যেন অদৃশ্য এক বিরাট ঝাঁটা দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। আকাশের ছেঁড়া মেঘগুলো ক্রমশ একজোট হয়ে গেল আর তারপর গোড়ায় ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে সন্ধের সঙ্গে ক্রমশ চেপে এল।

দরজা বন্ধ করে ফায়ারপ্লেসে কয়েকটা কাঠ জেবলে দুই বন্ধুতে সমুদ্রে ঝড়জলের স্মৃতি রোমন্থন করি।

একবার, সান্যালমশাই যখন আন্দামানে ছিলেন, তখন ছুটিতে বাড়ি ফেরবার জন্য আমাদের জাহাজে আরোহী হয়েছিলেন—যাকে নেভির ভাষায় বলে "টেকিং প্যাসেজ"। সেবারেই বঙ্গোপসাগরে আমরা দারুণ এক ঝড়ের মধ্যে পড়ি। স্বভাবতই সেকথা ওঠে।

পোর্ট ব্লেয়ার ছাড়ার কিছু পরেই এল বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া, তার খানিক বাদে একচোট শিলাবৃষ্টি। জাহাজের লোহার ডেকের উপর তার দ্রুত টকাটক শব্দে খোলের ভিতর থেকে মনে হল যেন অনেকগুলো উড়ো-জাহাজ একসঙ্গে মেশিনগান দাগছে। সেটা থামার একটু বাদে সূর্যদেব একবার উঁকি মেরে বেশ পাকা-পাকিভাবে মেঘের আড়ালে লুকোলেন।

ক্রমে হাওয়া জোর আর ঢেউগুলো বড় হতে থাকে। জাহাজ যেন দুলে দুলে গড়াতে গিয়ে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর সমুদ্র তার উপর বার বার জল দিয়ে তাকে ধুয়ে সাফ করে দিতে চাইছে।

জাহাজের খোলের ভিতর যেখানে যা কাত হয়ে পড়ে যেতে বা গড়িয়ে যেতে পারে সেগুলোকে শক্ত করে বেঁধে ফেলা হল। নতুন নাবিক যারা সম্প্রতি জাহাজে এসেছে তারা গা-বমি চাপবার বৃথা চেষ্টায় মুখ ফ্যাকাশে করে কাজ করছিল আর মাঝে মাঝে বেসিনের কাছে ছুটছিল। খাওয়া খাবার পেটের ভিতর থাকতে ঘোর আপত্তি জানিয়ে পাকস্থলির সব কটা কোণে উঁকি মেরে ধাক্কা দিয়ে মুখের দিক থেকে বার হতে চায়। বেচারিরা আমার কাছে সিক্-বেতে লাইন দেয় ওষুধ চাইতে আর পাকা জাহাজী যারা, ঝানু লোক, তারা সামনে দিয়ে যেতে আসতে তাদের টিটকিরি দিয়ে টিপ্পনি কাটছিল।

জাহাজ আরো দুলতে লাগল। খোলা জায়গায় দাঁড়ানো যায় না। কোনোরকমে রেলিং আঁকড়ে চলাও দায়। তাই মোটা দড়ি টেনে বেঁধে দেওয়া হল যাতে পা হড়কালে বা ঢেউয়ের দাপটে পড়ে যাবার জোগাড় হলে আঁকড়ে ধরতে পারবে। এবার পাকা পোর্ট অফিসার-দেরও মুখ গম্ভীর। যে যার জাহাজের নিজের অংশের হেফাজতে ব্যস্ত—অর্ধেক লোক তো গা-বমি আর জাহাজের দুলুনিতে কাজের বাইরে।

এমন সময়ে সান্যালমশাই কোনরকমে এসে বললেন, 'কিছু সী-সিকনেসের ওষুধ দিন—নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে রাখব। বেশিক্ষণ খাড়া থাকতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।' তারপর কোনোরকমে কতগুলো বড়ি পকেটে ভরতে ভরতে জাহাজের দুলুনির সঙ্গে তাল রেখে সেই যে টলতে টলতে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানা নিলেন, উঠলেন একেবারে বিশাখাপত্তনের কাছে গিয়ে। তখন তাঁর চোখমুখের যা চেহারা হয়েছিল—যেন ভারি রোগ থেকে উঠেছেন। কিন্তু সে তো তিনদিন পরের কথা।

সী-সিকনেসে আমি কোনদিন কষ্ট পাই না। তবু আমিও যে তখন খুব সুস্থ বোধ করছিলাম, তা নয়। মাথাটা ভারি আর বুকের উপর চাপ লাগছিল—যেন কী রকম একটু ধোঁয়াটে জগতে আছি। সেটা খানিকটা প্রত্যেকটা দরজা জানালা ক্লিপ দিয়ে আঁটা বন্ধ আব-হাওয়ার জন্য—এই ভেবে কোনোরকমে দোদুল্যমান লোহার মই বেয়ে উপরে ব্রিজে চলে গেলাম। সেখানে চারপাশ দেখা যাবে আর অন্তত কিছুটা খোলা হাওয়া পাওয়া যাবে।

এই ব্রিজ জায়গাটা জাহাজের বেশ উপরতলায় মাস্তুলের সামনে। এইখান থেকেই জাহাজ চালাবার সব হুকুম দেওয়া হয়। ইংরাজিতে ব্রিজ মানে যে সেতু, তার সঙ্গে এর কোনরকম মিল নেই। এটা একটা ঘর। উপরের অংশ জানলা দেওয়া, যাতে চারিপাশ দেখা যায়। মধ্যিখানে দুটো বেঁটে থাম—একটায় চুম্বক-দেওয়া কম্পাস, অন্যটায় জাইরো কম্পাস—বিজলীতে চলে আর দিকনির্ণয় নাকি ওই চুম্বকের চেয়ে ভালো করে। লোহার দেওয়ালের ধারে ধারে কথা বলবার ব্যবস্থা—কোনোটা ইঞ্জিন-ঘরের সঙ্গে, কোনোটা তোপ

ঘর, টর্পেডোঘর, ক্যাপটেনের শোবার ঘর ইত্যাদি নানা জায়গায়। আর তার মাঝে মাঝে কতগুলো যন্ত্রের মুখ (ডায়াল), যার কাঁটা বা চেহারা থেকে জাহাজের গতি, তলায় কতখানি জল ইত্যাদি দরকারি তথ্য বোঝা যায়।

ব্রিজে পেঁৗছে যা দেখলাম সেটা সামুদ্রিক জীবনের একান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতা—ডাঙার লোকেদের ভাগ্যে জোটে না। অগাধ সমুদ্রে যেদিকে তাকাও দিকচক্রবাল পর্যন্ত ঘনশ্যাম আস্তরণ—তার উপর ফোলা-ফোলা পালকের মতো পুঞ্জীভূত আরো কালো মেঘ জমে আর ঐ মেঘের ছায়া পড়ে সমুদ্রও মসীকৃষ্ণ হয়ে গেছে। ভয় কাটিয়ে উঠতে পারলে একটা অনির্বচনীয় আনন্দে মন ভরে যায়। প্রকৃতির এ রূপ যে না দেখেছে ডাঙায় বসে তাদের বোঝানো যায় না।

ঢেউগুলো দৈত্যের মতো এসে জাহাজের নাকের ডগার উপর দিয়ে খোলা ডেকগুলো ভাসিয়ে দিচ্ছে। না, দৈত্য বললে ঠিক বোঝানো হয় না—বরং যেন বিরাট কালচে-নীলচে-সবুজে দেওয়াল কতগুলোকে পর পর সাজিয়ে কোন অদৃশ্য দৈত্যের হাত জাহাজের দিকে ঠেলে আনছে। কাছে এলে, ভাঙবার ঠিক আগের মুহূর্তে মনে হয় যেন সেই গাঢ় সবুজটা একটু ফিকে হয়ে যায় আর তার উপর থেকে ফিতে পাড়ের মতন একটা করে গাঢ় নীলচে আর একটা করে সাদা সরু ফিতে যেন পর পর গড়িয়ে ডুরে শাড়ির মতো দেখায়, আর ঢেউয়ের চূড়া-বরাবর যেন বরফঢাকা পাহাড়ের সারি, তার থেকেই যেন কেউ ফিতেগুলো গড়িয়েছে। তার পরমুহূর্তে দেবতার হাতের করতালের ঝনঝনার মতো প্রচণ্ড একটা শব্দ করে লোহার ডেকের উপর আছড়ে পড়ে।

ক্যাপটেনের মুখ গম্ভীর। বাঁধা পথ ছেড়ে জাহাজকে ঝড়ের দিকেই মুখ করিয়েছে—যাতে পাশ থেকে ঢেউয়ের ধাক্কায় কাত হয়ে উলটে না যায়। আমাদের জাহাজটা গত মহাযুদ্ধের সময় তৈরি—আণবিক বোমার আগেকার যুগে—তাই আজকালকার যুদ্ধজাহাজের মতো রন্ধ্রহীন নয়। জলের ছাঁট এসে পায়ের তলায় কাঠের জালির ফাঁক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। আড়াল থেকে মুখ বাড়ালেই জলের দমকা ছিটে শত শত ছুঁচের মতো মুখে বেঁধে আর বাইরের দিকে পা বাড়ালেই সাগরের নোনাজল বর্ষাতি, জামা সব ভেদ করে ঢুকে সারা বুক ভিজিয়ে পিঠের শিরদাঁড়া বরাবর ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে যায় আর ঐ নোনাজলের ছিটে চোখে লেগে চোখ করকর করে।

সেখানে যে ক'জন লোক সকলেই কাজের জন্য বাধ্য হয়ে রয়েছে। আমি কেবল দর্শক। জামা-কাপড় ভিজলেও এখানে থাকতে থাকতে মাথার চাপ-ভাব কেটে গিয়ে পরিষ্কার হল আর প্রকৃতির রুদ্ররূপ যতই দেখি ততই যেন নতুন মনে হয় আর ভয়ে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি। এমনি ভাবে ক'ঘণ্টা কেটে গেল হুঁশ নেই। হঠাৎ মনে পড়ল যে সময় উতরে গেছে, খাওয়া হয়নি। ক্যাপটেনও ওখান থেকে একবারও নড়েনি। তখন জাহাজের ভিতরে নীচের দিকে পা বাড়ালাম।

নীচে যেতেই ভ্যাপসা গরম হাওয়া আর তার সঙ্গে বমির একটা টক গন্ধ নাকে ঠেকলো। মেস ডেকে (যেখানে নাবিকরা থাকে) দেখলাম জনজীবন বিপর্যস্ত। সাধারণ কাজ, চেঁচামেচি, রসিকতা সব থেমে গেছে। অধিকাংশ নাবিকই টেবিল, বেঞ্চি যেখানে পেয়েছে কুঁকড়ে শুয়ে পড়েছে—মুখে অবসাদের ছায়া। উপরের ডেক থেকে, লোহার জোড়ের মধ্যের ফুটো দিয়ে বা দরজা খোলার সময় এক ঝলক ঢুকে এসে সিঁড়ির ফুটো বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে জাহাজময় থৈ থৈ করছে। মেসডেকে সেই জল জাহাজের দোলানির সঙ্গে গেলাস ধোয়ার মতো ঘরের চারপাশে গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে আর দেওয়ালের তলার অংশে ভিজিয়ে দিয়ে যেন কোথায় কি পাওয়া যায় তার তল্লাস করতে আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

যাদের বসবার সামর্থ্য আছে তারাও নিঝুম হয়ে বসে শুনছে—জাহাজের খোলের লোহার পাতগুলো ঢেউএর ধাক্কা লেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে—যেন জাহাজটারই বুক কাঁপছে আর লোহার উপর লোহা ঘষার আওয়াজ হচ্ছে ক্যাঁ-অ্যা-চ্, কোঁ-ও-চ্। লোকগুলোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য জয় করতেই যেন তাদের সব শক্তি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। কেবল পোর্টহোলের বন্ধকরা ক্লিপগুলোর মধ্যে একটার প্যাঁচ ঝাঁকুনিতে ঢিলে হয়ে যাওয়ায় যখন কয়েক বালতি জল হুড়ুত করে ঢুকে সব ভিজিয়ে দিয়ে গেল, তখন সবচেয়ে কাছে বসে থাকা লোকটা প্যাঁচটা আঁটতে আঁটতে

যে লোকটা আগে বন্ধ করেছিল তার চৌদ্দ পুরুষকে বেশ শ্রবণীয়ভাবে উদ্ধার করলে।

খাবারঘরে ঢুকে বুঝলাম যে খাওয়াটাও মন আর শরীর—দুটোরই শক্তিপরীক্ষা। জমির সঙ্গে মোটা পিতলের হুক দিয়ে আটকানো চেয়ারে বসে টেবিলের এদিক থেকে ওদিকে গড়াচ্ছে—এরকম প্লেট থেকে খাওয়া বেশ কসরতের ব্যাপার। মাঝে মাঝে জাহাজ হঠাৎ বেশি কাত হলে হাতে-ধরা গেলাস থেকে জল চলকে পড়ে, আগে থেকে ভেজা জামাকাপড় আরো ভিজিয়ে দিচ্ছে।

হাওয়া খেলবার আর ধোঁয়া বের হবার চিমনি দিয়েও জল ঢুকে গেছে বলে রান্না করা যায়নি—কেবল স্যান্ডউইচ রাখা আছে।

এ ঘরেও জল এসেছে—খানিকটা ওয়াটার কুলার কাত হয়ে উথলে পড়ায় আর কিছুটা বোধহয় প্যানট্রিতে বালতি উলটে গিয়ে। কারণ জলে দেখলাম সিগারেটের পোড়া অংশ আর ছেঁড়া কাগজের সঙ্গে বোতলের ছিপি আর পেঁয়াজের খোসাও ভাসছে। এক কোণে গুটিয়ে-রাখা কার্পেটের তলার অংশটাও ভিজে সপসপ করছে।

স্যান্ডউইচে এক কামড় দিয়েই বুঝলাম যে গলা দিয়ে কিছু নামবে না—খানিকটা জল খেয়ে ব্রিজে ফিরে গেলাম।

সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে যেন এক অদ্ভুত ছাই রঙের পরিবেশে নিঃসঙ্গ পথিক এই জাহাজ। ঢেউগুলোর কোনোটা যখন ঠেলে জাহাজকে তুলছে, তখন প্রোপেলার বা চালাবার পাখা জল থেকে বেরিয়ে পড়ে শূন্যে ঘুরছে। সেই জলের বাধাহীন ঘুরন্ত পাখা মনে হচ্ছে জাহাজ থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায়—এমনভাবে সারা জাহাজকে নাড়া দিচ্ছে। তারপর পাখাটা জলে ঠেকার সঙ্গে কাঁপুনি থামছে কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কোনো জলের উপত্যকায় জাহাজ নামল—লম্বা দুসারি পর্বতপ্রমাণ জলের মধ্যে—আর যেন উদ্ধার নেই, এমন ভাবে ঢেউ ঝাঁপিয়ে পড়ে কিন্তু জাহাজ ঠিকই জল কেটে চলে। ঢেউ ডেকের উপর, সব কিছুর উপর জলের আবর্ত আর ফেনা সৃষ্টি করে গড়িয়ে যায়।

এবার ডেকের উপরের জিনিস একে একে ভাঙতে শুরু করে। কয়েকটা বড় ঢেউ কাটিয়ে দেখা গেল ডিঙিটা ভেঙেছে। তার ঢাকনা তিরপল আর দাঁড়গুলো আগেই গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডিঙিটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ড্যাভিটের উপর টাঙানো বোটও ভাঙতে লাগল। ভাঙার আওয়াজ ঢেউয়ের আওয়াজে শোনা যায় না ; তাই নিঃশব্দ ছবির মতো লাগে। এক-একটা অংশ ভেঙে ডেকের উপর আছড়ে পড়ে ক্ষণকালের জন্য একটা ফেনিল আবর্তের মধ্যবিন্দু হল ; তারপরের ঢেউটা এসেই সেটাকে টেনে নিয়ে সমুদ্রে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল।

পর পর কটা বড় ঢেউ আসার পর দেখলাম ব্রিজের তলায় একপাশে যে বিমান-বিধ্বংসী কামানের ঘেরাটোপ ছিল সেটা দুমড়ে গেছে—যেন খালি বিসকুটের টিনের উপর কেউ জোরে ঘুঁসি মেরেছে। এইরকম একটু বাদে-বাদে একটা করে লোকসান দেখে দেখে যখন শরীর মন অবশ হয়ে এসেছে তখন মনে হল যেন ঢেউয়ের জোর একটু কমেছে। সেটা মনের ভুল কি না, কতক্ষণ এমনভাবে কেটেছে—কিছুই জানি না। আরো কিছুক্ষণ বাদে বোঝা গেল যে বোধহয় নয়, সত্যিই ঝড়ের বেগ কমেছে।

ভোরবেলা যখন আলোর রেখা দেখা দিল তখন আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ, আর সমুদ্রভরা ঢেউয়ের মাথার ফেনাগুলো অসংখ্য চলন্ত সাদা ঘোড়ার ঘাড়ের চুলের মতো দুলে-দুলে ফুলে-ফুলে চলেছে।

সারা জাহাজ যেন স্বস্তির নিশ্বেস ফেলে ঘুমুতে গেল। ভোরবেলা রোজকার মতো কাজের বাঁশি বাজল না। তারপর কয়েক ঘণ্টা জিরিয়ে আবার সব সাফ করা, মরচেগুলো তুলে রঙ দেওয়া, ভাঙা জিনিসগুলো সারাবার চেষ্টা আরম্ভ হয়ে গেল।

আমাদের এইসব কথার মধ্যে গৃহিণী কখন রান্না সেরে এসে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি সব শুনে প্রশ্ন করলেন, 'এরকম ভীষণ বড় ঝড়ে পড়েছিলে তা তো বল নি।'

সান্যালমশাই হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার মতো তো ঘায়েল হয় নি, তাই সেটাকে বড় ভাবে নি।'

আমি বললাম, 'ডাঙায় যারা রইল তাদের শুধু শুধু ভাবিয়ে লাভ কী?'

সান্যালমশাই আরো হাসতে লাগলেন। 'ডাঙার

লোকেরা কিন্তু আপনাদের ভাবতে কম চেষ্টা করে নি।' ব্যাপারটা মনে পড়তে আমিও হাসিতে যোগ দিলাম।

ঘটনাটা এই ঝড়ের পরের অংশ। যখন ন্যাড়া ডেক নিয়ে বিশাখাপত্তনে পেঁছিলাম তখন অনেক ছোট বড় মেজ কর্তারা দেখতে এলেন। সকলেই জাহাজ রক্ষা পাওয়ার জন্য নিজের নিজের বিভাগের বাহবা দিলেন। কেউ বললেন, অসামান্য নাবিকগিরি ; কেউ বললেন, ইনজিনিয়ারদের কৃতিত্ব ; কেউ বললেন, জাহাজ যাতে না ডোবে তার জন্য চমৎকার ব্যবস্থা ইত্যাদি। হিসাবে দেখা গেল লোকসান লাখ টাকার বেশি—কিন্তু এই-টুকুর উপর দিয়ে রক্ষা পাওয়া গেছে বলে সকলে খুশি। কিন্তু সে রিপোর্ট দাখিল হতে অডিট ডিপার্ট-মেন্ট ঘোর আপত্তি জানাল। তাদের দফাওয়ারি আপত্তির মধ্যে একটা ছিল—এরকম লোকসান আগে কতবার হয়েছে জানাও। আমরা যখন বললাম যে সেটা জানা নেই এবং এটা দৈব ঘটনা, এর জন্য কেউ দায়ী নয়, তখন ফাইলে "নামঞ্জুর" লিখে পাঠালে এবং কারণ দিলে যে বঙ্গোপসাগর ও যুদ্ধের জাহাজ—দুটিই বহু-দিনের, আর অন্তত দুশো বছর ঐ পথে জাহাজ বছরের এই সময়েও চলছে ; তবে হঠাৎ কী কারণে এরকম হল সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা দরকার।

যদি দায়ী পক্ষকে ধরা যায় তো তার কাছ থেকে একটা লিখিত মুচলেকা চাই যে ভবিষ্যতে এরকম ঘটতে দেবে না। আমরা তাতে রাজি হলাম।

তারপর নৌকা ভাঙার ব্যাপারেও আমাদের গাফি-লতির প্রমাণ ওরা দেখাল। লিখল যে সমস্ত মালপত্র ভিতরে তোলা হল আর নৌকাগুলোকে বাইরে ফেলে রাখা হল—এটা কেমনধারা।

যখন আমরা উত্তর দিলাম যে জাহাজের ডিজাইনই ঐরকম, তখন সেটা বিশ্বাসই করতে চায় নি। তারা লিখলে যে এতদিনকার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইংলন্ডের নৌবহর এরকম কাঁচা কাজ করতেই পারে না। তৈরির সময়কার প্ল্যান ইত্যাদি পাঠিয়ে দিতে তারা বললে যে, এরকম বড় ভুলটা এবার থেকে জাহাজ তৈরির সময় শুধরে নেওয়া হবে—এই অঙ্গীকারে এবারের মতো দোষ ক্ষমা করা হবে। নৌকাগুলো যে ডেকের উপর রাখা হয় যাতে জাহাজডুবি হলে ঐগুলোকে তাড়াতাড়ি ভাসানো যাবে, সেকথা বোঝাতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।

শেষপর্যন্ত যিনি ঐসব আপত্তি জানাচ্ছিলেন তাঁকে দিল্লীর আফিস থেকে সরজমিনে তদন্ত করতে পাঠানো হল। জাহাজে এসে সব বুঝে তিনি খুব খুশি। আমি গিয়েছিলাম দিল্লী ফেরার সময় তাঁকে ইস্টিশানে পেঁছে দিতে। সেখানে তিনি একটু লজ্জিতভাবে বললেন, 'জান ডাক্তারসাহেব, ছবিতে ছাড়া জাহাজ তো আগে দেখি নি। সমুদ্রও যে কীরকম, তাও সিনেমা দেখে ঠিক বুঝতে পারতাম না। আমরা তো ডাঙার লোক। এবার সব পরিষ্কার হয়ে গেছে।'

সত্যিই তিনি তারপর কোনো প্রশ্ন না করে সবটা মঞ্জুর করে দিয়েছিলেন।

সেই থেকে "ডাঙার লোক"দের উপরে আমাদের অনুকম্পার শেষ নেই।

[ক্রমশ

গুরুজীর সঙ্গে চীনে

শ্যামাদাস চক্রবর্তী

ওয়েলকাম রভি, উই হ্যাভ্‌ন্‌ট্‌ সীন দ সান ফর দ লাস্ট থ্রী ডেজ।

পেইচিঙ বিমানবন্দরে অবতরণের পর চীনের পক্ষ থেকে যে সাদর অভ্যর্থনা পেলেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর তার মধ্যে এক চীনবাসীর এই মৃদু হৃদ্য উচ্চারণটি চারপাশের উত্তেজনার ভিড়ে গুরুজীর অভিনিবেশ কতটা আকর্ষণ করতে পেরেছিল তা তাঁর তাৎক্ষণিক সস্মিত প্রতিক্রিয়া থেকে অনুমান করা সহজ ছিল না। কিন্তু ঐ অপ্রত্যাশিত উক্তির চমক কাটতে না কাটতেই তার গূঢ় ব্যঞ্জনাটি যেন গুরুজীর সমগ্র চীন সফরের প্রতীকী তাৎপর্য আমার মর্মমূলে গেঁথে দিয়ে গেল। সরকারি আমন্ত্রণে প্রায় তিন সপ্তাহের এক সাংস্কৃতিক সফরে পণ্ডিতজী এই প্রথম এলেন চীনে।

তিরাশি সালের জুলাই মাসে দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রারম্ভে কোনো এক সন্ধ্যায় নিষ্প্রদীপ কক্ষে বসে আপন মনে দেশ রাগে সেতার বাজাচ্ছি। এমন সময় আমার একান্ত প্রিয় গুরুভাই দীপক চৌধুরী চুপিসাড়ে ঘরে ঢুকে উল্লসিত আলিঙ্গন-সহকারে সেই শুভসংবাদটি পরিবেশন করল যার জন্য আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। আমাদের গুরু পণ্ডিত রবিশঙ্কর টেলিফোনে জানিয়েছেন যে তাঁর চীন সফরে সহগামী হওয়ার জন্য তিনি আমাকে নির্বাচিত করেছেন। তাঁর যন্ত্রটির তত্ত্বা-বধানের ভার অর্পণ করেছেন, আর দিয়েছেন আসরে তানপুরা ছাড়বার কাঙ্ক্ষিত দায়িত্ব।

উনিশে জুলাই কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে এক মল্লার-মন্দ্রিত প্রাক্‌প্রাবৃট্‌ অনুষ্ঠানের অবসরে গুরুজী আমায় প্রশ্ন করলেন, শ্যামাদাস, চীনে যাচ্ছ শুনে খুব মজা লাগছে না? একসাইটমেন্ট হচ্ছে না? আমি বললাম, খুবই হচ্ছে। ভাবতেই থ্রিল হচ্ছে। গুরুজী হেসে বললেন, আমিও খুব একসাইটেড হচ্ছি।

চীনদেশে যাবার সুযোগ এমন অনায়াসে পেলে আমার মতো যে-কোনো সাধারণ ভারতীয়েরই নিজেকে দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী বলে মনে করার কথা। কিন্তু বিচিত্র অভিনব পরিবেশে গুরুজীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের যে সুযোগ এই সফর আমায় এনে দিল তাও আমার কাছে কম মূল্যবান ছিল না। আজ পঁচিশ বছর হল তিনি আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু নানান কারণে তাঁর সঙ্গে আমার যোগসূত্রটি মাঝ-

খানে দীর্ঘদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সম্প্রতি কয়েক বছর হল আবার তিনি আমাকে কাছে টেনে নিয়েছেন। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষার গুরুমুখী ঐতিহ্যের খবর যাঁরা রাখেন তাঁদের নিশ্চয় বলে দিতে হবে না যে গুরুর নিবিড় সাহচর্য শিষ্যের প্রশিক্ষণে কতখানি সহায়ক হয়। অতএব এই সফরকে আমি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং সেবার অজস্র সুযোগে সমৃদ্ধ আমার শিক্ষাক্রমেরই এক বিস্তৃতিরূপে গণ্য করেছি।

শুনেছিলাম যে চীন সফরে গুরুজীকে বেশ কিছু লেকচার ডেমনস্ট্রেশন দিতে হবে। বছর ষোলো আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর কানাডার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আকস্মিকভাবে আমার যোগাযোগ হওয়ায় সেখানে আমিও কিছু অনুষ্ঠান করার এবং লেকচার ডেমনস্ট্রেশনের সুযোগ পেয়েছিলাম। গুরুজী আমাকে এমন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে এই বিষয়ে মার্কিন সফরের কল্যাণে আমার কিছু পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকায় আমি তাঁর কাজে লাগতেও পারি। আমাকে নির্বাচিত করার পিছনে এটিও হয়তো একটি কারণ।

গণ-প্রজাতন্ত্রী চীন সরকারের আমন্ত্রণে এই সফর। পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন ভারত সরকার। এর জন্য উদ্যোগ আয়োজন চলছিল কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরেই। বিরাশি সালেই চীনা দূতাবাসের পক্ষ থেকে ভারত সরকারের প্রতিনিধির মারফত গুরুজীর কাছে প্রস্তাবটি এসেছিল। পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী অনুসারে ব্যস্ত থাকার দরুন তখন উনি সময়াভাবে প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে পারেন নি। সেইটাই এই তিরাশির আগস্ট-সেপটেম্বরে এসে সারতে পারলেন।

প্রাথমিক কিছু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও বন্ধুজনের সাহায্যে আর শুভানুধ্যায়ীদের চেষ্টায় পাসপোর্ট, ভিসা প্রভৃতি যোগাড় হয়ে গেল। তবে সরকারি আমন্ত্রণে আয়োজিত বলে এই সফরে বিদেশী মুদ্রা নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে যে কোনো কড়াকড়ি নেই, এটা আগে থেকে জানা ছিল না বলে সঙ্গে বেশি মুদ্রা নিতে পারি নি। অবশ্য গুরুজী সর্বদাই খোঁজ নিতেন যে আমাদের আর্থিক সংস্থানে কুলোচ্ছে কিনা, প্রয়োজনমত সাহায্য করতে চাইতেন। গোড়ার দিকে দরকার হত না, আমরা তাই নিতে চাইতাম না। কিন্তু পরের দিকে নিতাম, নিতে হত।

এবার সফরসূচীর কথায় আসি। আমাদের যাত্রা শুরু হচ্ছে দিল্লী থেকে। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে প্রথমে দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে থাইল্যান্ডের ব্যাঙ্কক হয়ে পরে উত্তর-পূর্বাভিমুখে যাত্রা করে চীনের দক্ষিণ দ্বারপ্রান্তে অবস্থিত ব্রিটিশ-শাসনাধীন হঙকঙে প্রথম বিরতি। তারপর সেখান থেকে চীনা বিমানপথে সোজা উত্তর দিকে গিয়ে চৈনিক রাজধানী পেইচিং হল দ্বিতীয় বিশ্রামস্থল। এখানে আর এর আশেপাশে আছে দিন ছয়েকের জন্য বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠান এবং পর্যটনের আয়োজন। সেখান থেকে বিমানযোগে দক্ষিণ-পশ্চিমে যাত্রা করে সছওয়ান প্রদেশের রাজধানী ছঙতু শহরকে কেন্দ্র করে দিন তিনেকের কর্মসূচী। তারপর আকাশ-পথেই প্রায় আড়াআড়িভাবে সোজা পূর্বদিকে যাত্রা করে সাংহাই বন্দরে চারদিনের বিরতি। সেখান থেকে আবার দক্ষিণ-পশ্চিমে বিমানযাত্রার অন্তে হঙকঙের কাছে শহর ক্যান্টনে দিন তিনেকের কার্যক্রম। ক্যান্টনকে চীনারা বলেন কোয়াঙতুঙ। এখান থেকে হঙকঙ বিমানে মাত্র আধঘণ্টার পথ। ফেরার পথে হঙকঙে প্রায় একটি দিন কাটিয়ে আবার ব্যাঙ্কক, কলকাতা হয়ে যার যার গন্তব্যস্থলে প্রত্যাবর্তন। মোটামুটিভাবে এই ছিল আমাদের সফর-সূচী। চীনদেশের মানচিত্রের উপর এই-সব জায়গা যদি সরলরেখা দিয়ে সংযুক্ত করা যায় তাহলে আমাদের যাত্রাপথের চেহারাটা দাঁড়ায় অনেকটা রোমক বর্ণমালার জেড অক্ষরটির মতো।

আমি শুনেছিলাম যে দিল্লী পর্যন্ত আমাকে ট্রেনেই যেতে হবে। তাই চব্বিশে আগস্ট কালকা মেলে টিকেট কেটে রেখেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ গুরুজীর ঘনিষ্ঠ সহচর জলসাঘর সংস্থার রবীন পালের বাড়ি থেকে সংবাদ পেলাম যে, গুরুজী ট্রাংককলে জানিয়েছেন—আমি যেন এয়ার ইন্ডিয়ার অফিস থেকে আমার চীনযাত্রার এয়ার টিকেটটি সংগ্রহ করে নিই। শুনে ভাবলাম, কী ব্যাপার, দিল্লী থেকেই তো টিকেটটা নিতে পারতাম, এখান থেকে নিতে বলা হচ্ছে কেন?

যাই হোক, নির্দেশমত টিকেটটি সংগ্রহ করে বুঝে-লাম ব্যাপার আসলে কী। টিকেটে দেখি আমার ফ্লাইট বুক করা হয়েছে যথাক্রমে কলকাতা থেকে দিল্লী, দিল্লী থেকে হঙকঙ, হঙকঙ থেকে পেইচিঙ। আবার অনুরূপভাবে ফিরতি পথে বুকিং হল পেইচিঙ থেকে ছঙদু, ছঙদু থেকে সাংহাই, সাংহাই থেকে ক্যান্টন,—সেখান থেকে হঙকঙ হয়ে ফের কলকাতা আর দিল্লী। বলা বাহুল্য, এরপর ট্রেনের যাত্রা বাতিল করে দিয়ে আকাশপথেই দিল্লী গেলাম। আমাদের সফরের অপর সহগামী তবলাবাদক ঈশ্বরলাল মিশ্রের বাড়ি বেনারসে। তাই তার টিকেটে যাত্রাপথের শুরু আর শেষও বেনারসে, আমার শুরু যেমন কলকাতায়।

অশোভন দেখাতে পারে—এই আশঙ্কায় আমি গুরুজীকে এই ব্যাপারে সরাসরি কোনো প্রশ্ন করি নি। তবু পরে কথাবার্তায় যেটুকু শুনেছিলাম তাতে মনে হয়েছিল যে এই পুরো সফরের বিমানযাত্রার ব্যয়-ভার ভারত সরকারই বহন করছেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে নিই। দিল্লী থেকে হঙকঙ পর্যন্ত বা ফেরার পথে হঙকঙ থেকে দিল্লী পর্যন্ত এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটে টিকেটে যা বন্দোবস্ত ছিল তাতে গুরুজী গেলেন প্রথম শ্রেণীতে, আমি আর ঈশ্বরলাল গেলাম সর্বসাধারণের সঙ্গে ইকনমি ক্লাসে। চীনভূখণ্ডের ফ্লাইটে কিন্তু এরকম পৃথক ব্যবস্থা হয় নি। পেইচিঙ থেকে ছঙদু, সেখান থেকে সাংহাই, সাংহাই থেকে ক্যান্টন এবং ক্যান্টন থেকে হঙকঙ যাবার পথে আমরা তিনজনেই প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করেছি। উচ্চশ্রেণীতে এই যাত্রার দরুন দুটি ভাড়ার ব্যবধানজনিত বাড়তি খরচটি কে জোগালেন, তা অবশ্য আমার জানা নেই। আমার যেন মনে হল নতুন করে বোধহয় প্রথম শ্রেণীতে টিকেট-গুলি কাটা হল। এক্ষেত্রে আমি যেটা বলতে চাই তা হল টিকেটে শ্রেণীবৈষম্য নিয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র অভি-যোগ ছিল না, থাকার কোনো প্রশ্নই আসতে পারে না। আমি শুধু এই কারণে ঘটনাটির উল্লেখ করলাম যে দুদেশের ব্যবস্থাপনায় দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পার্থক্য হয়তো এতে প্রতিফলিত। তা ছাড়া, আমার কাছে সম-শ্রেণীতে ভ্রমণের একমাত্র তাৎপর্য বা আকর্ষণ ছিল এই যে গুরুজীর একেবারে পাশাপাশি বসে যাবার সুযোগ পাব। বস্তুতপক্ষে পেইচিঙ থেকে ছঙদু যাওয়ার পথে গুরুজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপনের দীর্ঘ অবকাশ যে লাভ করেছিলাম তা সম্ভব হয়েছিল এই বন্দোবস্তের কল্যাণেই।

চীন সফরের আনুপূর্বিক বিবরণ আরম্ভ করার আগে এই সফরের সংগতিয়া হিসাবে সহযোগী ঈশ্বর-লালের সম্পর্কে গুটিকতক কথা বলে নিই। ঈশ্বর-লালের ডাক নাম লালু। গুরুজী তাকে লালু বলেই ডাকতেন। অনুজতুল্য বলে আমিও ওকে ঐ নামেই ডাকতাম। এর আগে আমি ওকে কখনো দেখি নি। গুরুজীও এই প্রথম ওকে নিয়ে বিদেশে বেরলেন। তাই বলে ঈশ্বরলাল যে এসব ব্যাপারে একেবারে অন-ভিজ্ঞ, তা মনে করা ঠিক হবে না। আমি শুনেছিলাম, সে বেনারসের মিশ্রপরিবারের সন্তান, প্রতিভাবান তবলাবাদক এবং সর্বোপরি গুরুজীর স্নেহধন্য প্রখ্যাত তবলীয়া স্বর্গত আনোখেলালজীর একদাশিষ্য। পর-বর্তী কালে শান্তাপ্রসাদজীর কাছেও তালিম পেয়েছে। বেহালাবাদক এন রাজন এবং বেনারসের কণ্ঠশিল্পী প্রভৃতি কলাকারদের সঙ্গে ও এরি মধ্যে রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশে ঘুরে এসেছে।

তবে বর্তমান সফরটি যে লালুর জীবনে বিশেষ-ভাবে স্মরণীয় সেকথা ও আমার বা অন্যান্যদের কাছেও স্বীকার করেছে। গুরুজীর সঙ্গে ও এই প্রথম আসরে আনুষ্ঠানিকভাবে বাজাতে চলেছে, আর তাও ভারত-বর্ষের বাইরে এবং চীনদেশে। গুরুজী ওকে কীভাবে বেছে নিলেন? গুরুজী তো মাঝে মাঝে বেনারসে গিয়ে থাকেন। লালুর বাড়িও সেখানে। গুরুজী ওকে সেখানেই দেখেছেন। কখনও-সখনও অন্য তবলচীর সঙ্গে ওঁর বাড়িতে এসে ও এক-আধবার ওঁর বাজনার সঙ্গে ঠেকাও দিয়েছে। তবে কোনো আসরে বসে গুরুজীর সঙ্গে সংগত করার সুযোগ এর আগে ওর হয় নি। লালুর বাজনার হাত দেখে গুরুজীর খুব ভালো লেগে গেল, উনি ওকে এই সফরের জন্য নির্বা-চিত করলেন। বলা বাহুল্য পরে দেখা গেল যে এই নির্বাচন খুবই সার্থক হয়েছে।

চীনভ্রমণকালে গুরুজীকে লালুর ভূয়সী প্রশংসা করতে শুনেছি। আসরে লালুর পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি ওকে ভারতের শ্রেষ্ঠ ড্রাম-প্লেয়ারদের একজন বলে উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া, আমাকেও এমনিতে বলেছেন, চিন্তা করে দেখো, ভালো করে লক্ষ কোরো ছেলেটির মাথা কী পরিষ্কার, কত বুদ্ধিমান ছেলে।

গুরুজী নিজে যখন এমন কথা বলছেন তখন তা

নিয়ে আমাদের কোনো সংশয় থাকার কথাই নয়। কিন্তু যেহেতু উনি লক্ষ করতে বলেছেন, তাই পরীক্ষা করার জন্য নয়—বরং ও কতটা বুঝছে সেটা দেখার জন্য আমি এরপর প্রত্যেক চরণে ওকে লক্ষ করেছি। দেখেছি —সত্যিই ওর সাংগীতিক বুদ্ধিমত্তা প্রশংসনীয়। এক-বারের বেশি দুবার ওকে বড়ো একটা বলতে হয় নি কোনো জিনিস, সংগে সংগে ধরে নিয়ে তা বাজিয়ে দিয়েছে। গুরুজী তো লয়তালের সমুদ্রবিশেষ, লয়-কারির প্রায় প্রবাদপুরুষ। কত বাঘা-বাঘা তবলা-বাদককে ওঁর কাছে বসে শিখতে দেখা গেছে। ওঁর তাৎক্ষণিক লয়কারির জবাবে বা তার সংগে সংগতি রেখে উপযুক্ত সাথসংগত করার মতো প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং নৈপুণ্য সব তবলচীর মধ্যে পাওয়া যায় না। তার উপর লালু এই প্রথম তাঁর সংগে আসরে বাজাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য ক্ষমতা আর কেরামতি ওর। গুরুজী যা যা বলছেন তা টকটক করে ধরে ফেলছে আর সংগে সংগে বাজিয়ে দিচ্ছে। ওর হাতও সুন্দর, খুবই মিষ্টি। তবে গুরুজী ওকে একবার উপদেশ দিয়েছিলেন যে 'না ধিন ধিন না' এই বোলটি যেন ও একটু দ্রুতলয়ে বাজানো অভ্যাস করে।

লালুর বাদননৈপুণ্য তো দেখেছিলাম অনেক পরে, আসরে ওর অনুষ্ঠান শোনার সুযোগ পেয়ে। কিন্তু ওর বাজনা কেমন উতরোয় তার চেয়ে সঙ্গী হিসাবে ও কেমন হবে—এ নিয়ে আগেভাগেই আমার কিঞ্চিৎ দুশ্চিন্তা ছিল। কারণটা অবশ্যই ব্যক্তিগত, শুনে অনেকেই হয়তো হাসবেন। তবু বলি, সভয়েই কথাটা নিবেদন করি। শিল্পীদের মধ্যে অনেকেরই অল্পবিস্তর পানদোষাদি থাকে। আর তবলীয়াদের মধ্যে কারুর কারুর দেখেছি পানোন্মত্ত অবস্থায় মুখের কোনো লাগাম থাকে না। অবশ্য জানতাম যে গুরুজী যখন সংগে করে নিয়ে যাচ্ছেন তখন তেমন চরিত্রের লোককে উনি নিশ্চয়ই নেবেন না। তবু এই ভয়টা পেয়েছিলাম যে, কে বলতে পারে, গুরুজী হয়তো একঘরে থাকলেন, আমি আর তবলচী থাকলাম আর-এক ঘরে। সেক্ষেত্রে সহবাসীটি যদি ঐ ধরনের আপত্তিজনক স্বভাবের লোক হয় তাহলে আমার পক্ষে শুধু যে অসুবিধাই হত তাই নয়, আমি তখন ব্যক্তিগতভাবে অশান্তির কারণও হয়ে উঠতে পারতাম।

কিন্তু লালুকে দেখে, তার সংগে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে আমি আশ্বস্ত হলাম যে আমার আশংকা একেবারেই অমূলক। আমাদের দুজনকে অবশ্য বরাবরই আলাদা আলাদা ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ওর যা সুন্দর স্বভাব দেখলাম তাতে বুঝলাম ওর সান্নিধ্য, ওর আচার-আচরণ কখনোই অপ্রীতিকর হয়ে উঠত না। লালু শুধু বড়ো মাপের শিল্পীই নয়, ওর স্বভাবের মধ্যেও একটি শুদ্ধসংযতভাব, নম্রতা, অমায়িকতা, শালীনতাবোধ বিদ্যমান। খুবই সাত্ত্বিক প্রকৃতির ছেলে ও, রোজ পুজো করত, পুজো না করে খেত না। আমি ওর থেকে বছর সাতেকের বড়ো জেনে আমাকে সর্বদা দাদা বলেই ডাকত এবং মান্য করত। আমিও ওকে লালুভাই বলে ডাকতাম। কখনও কখনও শাসনও করেছি। একদিন পেটে কী একটা ব্যথা হয়েছে বলে ও ডাক্তারের কাছে গেছে শুনে আমি ওকে মৃদু ভর্ৎসনা করলাম, আমার কাছে গুরুজী এত ওষুধ দিয়ে রেখে-ছেন, তুমি ডাক্তারের কাছে কেন গেলে? আমায় বললে তো পারতে। তখন ও মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, দাদা, মাফ কিজিয়েগা, ফিন এইসা নেহি হোগা।

গুরুজীও লালুকে খুব স্নেহ করতেন, তবে ওকে নিয়ে নির্মল পরিহাস করতেও ছাড়তেন না। লালু ছিল একটু ঘুমকাতুরে। গুরুজী সেটা লক্ষ করেছিলেন। সস্নেহ-প্রশ্রয়-মেশানো স্বরে আমাকে বলেছিলেন, ঠিক দেখো না একেবারে আল্লারাখার মতো। একটু ঘুমোতে, আরাম করতে ভালোবাসে। আবার আমি হয়তো গুরু-জীকে নিয়ে দুপুরের দিকে কোনো জায়গা থেকে ঘুরে এলাম। লালু তখন একঘুম দিয়ে উঠল। গুরুজী ওকে একটু ঠাট্টা করে বলতেন, কেয়া লালু, মার দিয়া এক ঘণ্টা? শুনে লালু লজ্জা পেত।

ছেলেটিকে আমার এমনিতেই এত ভালো লেগেছিল। একেক দিন ও ঘরে বসে বাজাত, চাইত আমি যেন হাতে তাল দিই। আমি বসে তাল দিতাম। ওরও ভালো লাগত, আমারও বেশ লাগত। মাঝে মাঝে চা বানিয়ে আমায় ডেকে খাওয়াত বা আমিও চা করে ওকে ডাকতাম। একটা সহজ প্রাণের সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল।

এই চায়ের প্রসংগে একটা কথা বলি। চীনারা যূথীগন্ধে-ভরা জেসমিন চাঁ খুব খায়। গুরুজীও এই

সুরভিত পানীয়টি অত্যন্ত ভালো বাসতেন। কিন্তু আমাদের আবার ভাঁড়ে চা খাওয়া অভ্যেস তো। এমনি শখ করে এক-আধবার জ'ুই-চা খেতে ভালোই লাগত বটে, কিন্তু ওতে চায়ের নেশা ঠিক মিটত না। একটু ব্ল্যাক টী না হলে আমার চলত না। হোটেলে ব্রেক-ফাস্টের সময় বা অন্য সময়েও ব্ল্যাক টীর প্যাকেট, দুধ, চিনি—সব দিয়ে যেত। আমরা আবার তার থেকে খানিকটা কেটে নিয়ে ফ্লীজে রেখে দিতাম। পরে নিজেরা বানিয়ে খেতাম। এইভাবে সময়-অসময়ে চায়ের তেষ্টা মেটাতাম।

চা বানানোর জন্য গরম জলের অভাব হত না, কেননা প্রত্যেক হোটেলেই ওরা ফোটানো জল খেতে বলত এবং প্রত্যেক ঘরে দুটি করে জলভরা ফ্লাস্ক রেখে যেত। তার একটি খাওয়ার জন্য, অন্যটি এমনি গরম জল হিসাবে ব্যবহারের জন্য। সত্যি বলতে কী, এত ভালো ফ্লাস্কও কখনো দেখি নি। একটা ফ্লাস্কের জল যে কতক্ষণ পর্যন্ত অমন সুন্দর গরম অবস্থায় রাখা যায় তা এই ফ্লাস্কগুলির ক্ষমতা না দেখলে বুঝতে পারতাম না। যেমন ধরা যাক, এক জায়গায় বিকেল চারটের সময় ফোটানো জল ফ্লাস্কে ভরে দিয়ে গেল। আর তারপরেই আমরা বেরিয়ে গেলাম এবং নানা জায়গা ঘুরে পুরো একদিন পরে ফিরলাম। সেদিন রাত দশটার সময় চা খাব বলে ফ্লাস্ক খুলে দেখি জল তখনো যেন টগবগ করে ফুটছে। একেবারে ধোঁয়া বেরচ্ছে গা থেকে। গুরুজীকে বলেছিলাম, আর কিছু না হোক, একটা ফ্লাস্ক অন্তত কিনে নিয়ে চলুন। এরকম জিনিস আর কোথায়ও পাবেন না। গুরুজী নিজেও সেকথা স্বীকার করেছেন, অবাক কাণ্ড দেখো, কখন জল দিয়ে গেছে, অথচ এখনো পর্যন্ত তা বয়েল করছে।

কোন্ কথা থেকে কোন্ কথায় গিয়ে পড়লাম। ভিতরে বসে রোমন্থন করছে যে মানুষটি, বাধানো সড়ক ছেড়ে মাঝে-মাঝে একটু-আধটু এদিক ওদিকে ঘুরে আসার স্বাধীনতা ছাড়তে সে নারাজ। তাই সংলগ্নতা-কামী পাঠককে আগেভাগেই সাবধান করে দিচ্ছি যে স্মৃতির অনুষংগ অনিবার্যভাবে এসে পড়লে ঘটনার পারম্পর্য রক্ষা করা হয়তো সবসময় সম্ভব হয়ে উঠবে না। আসল কথা গুছিয়ে সুন্দর করে লেখার ক্ষমতা বা অভ্যাস আমার নেই। যা ছিল একান্ত আপনার তাকে সকলের সংগে ভাগ করে নেবার তাগিদে লেখনী ধরেছি। যেমনটি দেখেছি, শুনেছি, অনুভব করেছি তার স্বাদ পাঠকদের চিত্তে সরাসরি সঞ্চারিত করে দিতে চাই। কিন্তু সেইসংগে এটাও বুঝি যে আমার এই আটপৌরে ভাষা আর শ্লথবন্ধ ভঙ্গি সম্বল করে সেটি করতে চাওয়া দুরাশা মাত্র। সারাটা জীবন তো কাটল মা-সরস্বতীর বীণারঞ্জিত অপর হস্তটির প্রসাদ ভিক্ষা করে, সেতারের গত, তান, তোড়া আর তবলার বোল শিক্ষা করে। সুরে লয়ে প্রকাশ করাটা আমার কাছে যত সহজ, ভাষায় ঠিক তার বিপরীত। সংগীতের ভাষা যৎকিঞ্চিৎ জানা থাকলেও ভাষার সংগীত একে-বারেই নাগালের বাইরে।

আসলে এই সফরে আমি সমস্ত ইন্দ্রিয়-মনকে সর্বদা সজাগ রেখে চেষ্টা করতাম প্রতিটি অভিজ্ঞতার রস আহরণ করে মৌচাকে জমিয়ে রাখতে, যাতে পরে অবসর পেলে প্রিয়জনের সংগে সেই মধুর স্বাদ আবার ফিরে পেতে পারি। এই উদ্দেশ্যে আমি সব অভিজ্ঞতার সারমর্ম তৎক্ষণাৎ বা অব্যবহিত পরে-পরেই একটি ছোট্ট ডায়েরিতে যথাসম্ভব লিখে রাখতাম। পরে আবার একটু ফুরসত পেলেই, বিশেষ করে শুতে যাবার আগে, রাত বারোটা একটা পর্যন্ত জেগে বেঠে ঐ ডায়েরির সাহায্যে এবং স্মৃতি আর অন্যান্য কাগজপত্রের উপর নির্ভর করে আর-একটি বড়ো ডায়েরিতে বিশদভাবে দিনপঞ্জী লিখে রাখতাম। সফর-সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজ, সংবাদপত্রের কাটিং, ভাষণের অনুবাদের কপি ইত্যাদি সযত্নে রক্ষা করতাম। পরে এগুলি কাজে লেগেছে। অবশ্য আর-একটি কথাও স্বীকার করব। কলকাতায় ফিরে এসে গোটা সফর নিয়ে একটি ছোট-খাট রিপোর্টের খসড়া বানিয়ে আমার জনৈক উৎসাহী বন্ধু তথা শিষ্য হিরণ্ময় চক্রবর্তীকে দেখাই। সে কিন্তু অত সংক্ষিপ্ত বিবরণে সন্তুষ্ট হতে পারল না। বেশ কয়েকটি দফায় চীন-সফর নিয়ে সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে-করে আমার কাছ থেকে যেসব তথ্য আদায় করে ছাড়ল তার অনেকগুলিই হয়তো এই পদ্ধতিতে আহ-রিত না হলে কিছুকাল পরে তালগোল পাকিয়ে ছত্রা-কার হয়ে যেত অথবা একেবারে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেত। কথার পিঠে কথা হিসেবে অনেক ঘটনা, অনুষংগ আর অনুভবই এইভাবে উদ্ধার করে সে টেপ-

রেকর্ডে সংরক্ষণ করে রেখেছে। এইসমস্ত মালমশলার সাহায্যেই এখন লিখতে বসেছি।

এই সফরে কোথায় কী ঘটেছিল, কে কী বলল, গুরুজী কোন্ আসরে কী রাগ কতক্ষণ বাজালেন ইত্যাদি যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়ের তথ্য আর বিবরণ আমার কাছে যতটা সংরক্ষিত আছে এমনটি বোধহয় স্বয়ং গুরুজীর কাছেও নেই। তাই কলকাতায় ফিরে সাংবাদিকদের সঙ্গে চীন-সফর নিয়ে যে সাক্ষাৎকারটি উনি করেছিলেন তাতে প্রয়োজনমত ওঁকে সাহায্য করার জন্য আমিও আমার ভান্ডার নিয়ে প্রস্তুত ছিলাম। এত সব টুকরো-টুকরো ঘটনা আর অনুভূতির স্মৃতি জমা হয়ে গিয়েছে যে আর-পাঁচজনের সঙ্গে তা ভাগ করে নিয়ে হালকা হতে চাই।

আর নয়, এবার ফিরে আসি যাত্রারম্ভের কথায়। 'দুর্গা দুর্গা' বলে তো চব্বিশে আগস্ট ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের সান্ধ্য ফ্লাইটে দিল্লী রওনা হলাম। দমদম বিমানবন্দরে বিদায় জানাতে এসেছিল আমার স্ত্রী এবং পরিবারের কয়েকজন, দীপকভাই, আমার নিকট প্রতিবেশীর স্ত্রী ও শিশুপুত্র আর হিরণ্ময়। ঝরনার মতো সরল, সাবলীল ঐ শিশুটির একটি সংগীতময় প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, জেঠুবাবা, তুমি যে প্লেনে করে যাবে, উড়তে জান তো? আমার মন যে কল্পনার ডানায় ভর দিয়ে অনেক আগেই অসীম আকাশে পাড়ি জমিয়েছে, তা ওকে বোঝাই কী করে?

সফরে সঙ্গে জিনিসপত্র বেশি কিছু নিই নি। হালকা কিছু শীতবস্ত্র, আসরের উপযোগী দু-এক প্রস্থ পোশাক, একজোড়া শার্ট আর ট্রাউজার্স, ক্যামেরা, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য খুচরো জিনিস, ডায়েরি ইত্যাদি। গুরুজী বলে রেখেছিলেন যতদূর সম্ভব লঘুভার হয়েই যেন বেরই, যাতে ওঁর সঙ্গে যে বাড়তি মাল থাকবে তার দায় খানিকটা অন্তত বহন করতে পারি। একটি সুটকেশ আর একটি হাতব্যাগেই আমার সব জিনিস ধরে গিয়েছিল। আপাতত অবশ্য আমার সবচেয়ে বেশি মাথাব্যথা ছিল ঐ হাতব্যাগে করে মহামূল্যবান সামগ্রীটি কলকাতা থেকে গুরুজীর কাছে পৌঁছে দিতে নিয়ে যাচ্ছি তারই জন্য। জিনিসটি হল উদয়শঙ্কর ট্রুপে গুরুজী যখন ছিলেন সেই সময়ে ওঁর বাজানো আবহসংগীতাদির দুষ্প্রাপ্য টেপ। তখন উনি পরিচিত ছিলেন রবীন্দ্রশঙ্কর নামে। দিল্লী যাবার দিন দুয়েক আগে আনন্দশঙ্করের কাছ থেকে ঐ টেপগুলি সংগ্রহ করতে হয়েছিল। দিল্লীতে গুরুজীর জিম্মায় এটি সঁপে দিয়ে তবেই নিশ্চিন্ত হতে পারলাম।

পঁচিশে আগস্ট দিল্লী বেতার আর দূরদর্শন আমাদের এই সফরের সংবাদ প্রচার করল। ঐ দিনই সন্ধ্যায় দিল্লীর চীনা দূতাবাস আমাদের আপ্যায়িত করেছিল। চীনে গিয়ে কীরকম জলবায়ুর মধ্যে পড়তে হতে পারে, এ সম্পর্কে এই ভোজসভায় আমাদের কিছু পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে দেশে যখন গিয়ে পড়লাম তখন ঐসব পরামর্শ বা অভিমত কোনো কাজেই লাগে নি। আমরা শুনে গিয়েছিলাম যে অমুক অমুক জায়গায় বেশ ঠান্ডার মধ্যে পড়তে হতে পারে। কার্যত কিন্তু আমরা প্রায় সর্বত্রই দারুণ গরম আবহাওয়াই পেয়েছি। হোটেল, গাড়ি বা অডিটোরিয়াম—সর্বত্রই শীতাতপনিয়ন্ত্রণের সুব্যবস্থা ছিল বলে অসুবিধায় পড়তে হয় নি। একটি প্রেক্ষাগৃহ অবশ্য শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ছিল না, সেখানে পাখার বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল। তবে রাস্তায় বা পার্কে কখনও-সখনও হাঁটতে বেরলে গরমটা বেশ টের পেতাম' এমনকি গরমে গায়ে ঘামাচিও বেরিয়ে যায়। কোনো কোনো দোকানে ঢোকার মুখেই একটি করে সুদৃশ্য হাতপাখা ধরিয়ে দিত হাতে। প্রথমটা একটু অবাক হয়ে গেলেও দোকানের ভিতরে গেলে ভ্যাপসা গরম টের পেয়ে বুঝতাম, কেন এই উপহার। চীনের অন্তর্দেশীয় বিমানযাত্রাতেও এইরকম গরমে কষ্ট পেতে হয়েছে। সেখানেও হাতপাখার আশ্রয় নিতে হত। তবে প্লেন একবার উঁচুতে উঠে গেলে আর গরম লাগত না। এইরকম পাখা স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ দু-চারটি সঙ্গে করে নিয়েও এসেছি।

যাই হোক, চীন সম্বন্ধে নানাপ্রকার আগাম উপদেশ আর পরামর্শ শুনে এইভাবে প্রস্তুত হয়ে অবশেষে ছাব্বিশে আগস্ট রাত আটটায় এয়ার ইন্ডিয়ার জাম্বো বোয়িং বিমানে চেপে দিল্লীর পালাম বিমানবন্দর থেকে যাত্রা তো শুরু করলাম। পথে একমাত্র বিরতি ব্যাংককে। পালাম থেকে ব্যাংকক যেতে সময় লাগল প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা। অবশ্য ব্যাংককে যখন পৌঁছলাম ভারতীয় সময় তখন রাত বারোটা বেজে চল্লিশ মিনিট হলেও স্থানীয় সময় রাত সোয়া দুটো, কারণ আমরা চলেছি পশ্চিম থেকে পূবে। ব্যাংককে ঘণ্টাখানেকের যাত্রাবিরতি। আমরা আর প্লেন থেকে নামি নি। ব্যাংকক থেকে হঙকঙে পৌঁছতে প্রায় সোয়া দুঘণ্টা লেগে গেল। অর্থাৎ দিল্লী থেকে হঙকঙ যেতে বিরতিসমেত মোট পৌনে সাতঘণ্টা সময় লাগল।

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে আপাতত হঙকঙ পর্যন্তই যাত্রা, এরপর আমাদের বাকী সফরটুকু সারতে হবে চীনা বিমানব্যবস্থায়। অবশ্য ফেরার পথে হঙকঙ থেকে আবার এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট ধরব। সমগ্র সফরের বিমানযাত্রার অভিজ্ঞতার কথা মনে রেখে এই প্রসঙ্গে স্বীকার করতেই হবে যে এয়ার ইন্ডিয়ার ব্যবস্থাপনাই শ্রেষ্ঠ। তাদের আদর অভ্যর্থনা আতিথেয়তা প্রভৃতির সঙ্গে ওদেশীয় ব্যবস্থার কোনো তুলনা চলে না। আমরা যেটুকু দেখেছি তাতে অন্তত তাই মনে হয়েছে। ওরা অবশ্য ঘনঘন জলপানে বা ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করেছে। কিন্তু ওদের বিমানের ভিতরকার ব্যবস্থা মোটেই আরামপ্রদ বা স্বস্তিকর নয়। যেমন গরম, তেমনি কোলাহলপূর্ণ। পক্ষান্তরে এয়ার ইন্ডিয়ার ব্যবস্থা আধুনিক এবং আন্তর্জাতিক মানের। তা ছাড়া, ওদেশের বিমানে ভোজন ভিন্ন অন্যান্য আতিথেয়তা বা আদরযত্নের তেমন কোনো আয়োজন নেই। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের ক্যাপ্টেন কিন্তু নিজে এসে বারেবারে প্রত্যেক যাত্রীর কাছে হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছেন, খোঁজ নিয়েছেন খাবারদাবার ঠিক ছিল কি না, কোনরকম অসুবিধা হচ্ছে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই যে আপনজনের মতো প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার, এটি আমার অত্যন্ত মধুর লেগেছে। হয়তো আসলে এসবই নিছক সৌজন্যমূলক বাহ্য শিষ্টাচার, কিন্তু তবু তফাতটা চোখে পড়ার মতো।

আগেই বলেছি যে এয়ার ইন্ডিয়ার এই ফ্লাইটে গুরুজী বসেছিলেন সামনের দিকে, ফার্স্ট ক্লাসে, আমি আর লালুভাই ছিলাম ইকনমি ক্লাসে। আমি বসেছিলাম গুরুজীর সেতারটি সঙ্গে নিয়ে। গুরুজী বইটই পড়ছিলেন। 'পরিবর্তন' পত্রিকার যে সংখ্যাটিতে নিখিলদার একটি লেখা বেরিয়েছে, দমদমে দীপক গুরুজীর জন্য সেটি কিনে রেখেছিল। ঐ একটি কপিই নাকি ওখানকার স্টলে পড়ে ছিল। হঙকঙের পথে এখন আমি ঐ পত্রিকাটি একটি কাগজের মধ্যে ভাঁজ করে প্লেনের অফিসারদের মারফত গুরুজীর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। নিজে গিয়ে দিয়ে আসতে পারি নি। কেননা দেখলাম দুটি শ্রেণীর মাঝখানে একটা শিকল লাগানো রয়েছে। হয়তো যেতে দিতে আপত্তি করবে। অবশ্য দূর থেকেই আকারে ইঙ্গিতে গুরুজীর সঙ্গে ভাববিনিময় হয়েছে। আমরা যে বসলাম গুরুজী দূর থেকে লক্ষ করছেন বসেছি কিনা। হাত নাড়ছেন, ইশারা করে খেয়ে নিতে বলছেন, দেখিয়ে দিচ্ছেন যে এখুনি খাবার পরিবেশন করবে। অর্থাৎ আমরা কেমন আছি সেদিকে সর্বদাই খেয়াল রাখছেন এবং দূর থেকে যথাসম্ভব নজর রাখছেন। বারবার ওঁর হাত নেড়ে অনুরোধ করা দেখে মনে হল যেন প্লেনের অফিসারদেরও উনি বলে দিচ্ছেন যে আমরা এইখানে বসে আছি, ওঁরা যেন একটু দেখাশোনা করেন। আমাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ লালুভাই যে নিরামিষাশী সেকথাও মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন ওঁদের।

প্লেন হঙকঙ অভিমুখে চলতে থাকুক। এই ফাঁকে বরং গুরুজীর সেতারটির বহনব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলে নিই। বলাই বাহুল্য, সেতারটির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার গুরুত্ব আমাদের কাছে ছিল অপরিসীম। আমি সঙ্গে থাকলে যন্ত্রটির দায়িত্ব বরাবর আমার উপরেই ন্যস্ত হয়ে থাকে। স্বভাবতই আমি এ ব্যাপারে খুব উদ্বিগ্ন আর সতর্ক থাকতাম পাছে যন্ত্রের এতটুকু ক্ষতি হয়ে যায়, কেননা তাহলে যে সমস্ত সফরটাই মাটি হয়ে যাবে। গুরুজী আমার অতি সাবধানতা আর উদ্বেগপরায়ণতা দেখে মাঝে-মাঝে ঠাট্টাও করেছেন—তুমি দেখছি ঠিক নদুদার মতোই বড়ো বেশি চিন্তা কর। ও যন্ত্র ঠিকই চলে যাবে, অত চিন্তা কোরো না। নদুদা মানে নদেরচাঁদ মল্লিক, যিনি গুরুজীর বন্ধু এবং গুরুজীর যন্ত্রের উদ্ভাবন, চিকিৎসা ইত্যাদির সব ভার যাঁর শৌখিন কারিগরি প্রতিভার উপরেই দীর্ঘকাল যাবৎ ন্যস্ত।

যাই হোক, গুরুজীর সেতার সম্বন্ধে কোনো সাবধানতাকেই আমি বাহুল্য বলে মনে করতে পারি নি। সেতারটিতে পরপর দুটি ঢাকনা পরানো থাকত। প্রথমে থাকত একটি নরম রেশমি কাপড়ের আবরণ। তার উপরে চাপানো হত আর-একটি জলনিরোধক কাপড়ের

ঢাকনা। অবশ্য ওয়াটারপ্রুফ ঢাকনা বলতে প্রচলিত বর্ষাতির মতো মোটা কোনো কাপড় দিয়ে তৈরি কিছু নয়। আকস্মিক বৃষ্টিবাদলার হাত থেকে যন্ত্রটিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে কেনা এক বিশেষ ধরনের জলনিরোধক কাপড়, অতীব মিহি আর কোমল। তার রঙটি ডাঁপ বটল গ্রীন বা বরং বলা চলে শ্যাওলার রঙে কালো রঙ মেশালে যেরকম রঙ হয়, কি একটু ছাই রঙও যেন মেশানো আছে মনে হত। দেখতে খুবই চিত্তাকর্ষক।

এই সেতার নিয়ে যাবার জন্য সবসময় প্লেনে একটি আলাদা সীট বুক করা হত। আর সেই সীটটি সর্বদাই হত জানালার ধারের সীট যাতে একদিক থেকে অন্তত যাত্রীদের যাতায়াতজনিত আঘাতের কোনো আশঙ্কা না থাকে। সেতারটি ঠিক কীভাবে বয়ে নিয়ে বেড়াতাম বা প্লেনে আর অন্যান্য যানবাহনে কেমনভাবে যন্ত্রটিকে রক্ষা করতাম, তা বলি। আমার নিজের সেতার আগে যেভাবে বয়ে নিয়ে যেতাম এখন তো আর কোনো সেতারই সেভাবে বহন করা নিরাপদ হবে না। আগে আমি সেতারটি নিতাম ডানহাতে, খানিকটা রাইফেল বয়ে নিয়ে যাবার কায়দায়। এমনভাবে নিতাম যাতে লাউ দুটোই যেন আমার দিকে থাকে এবং তবলিটা (অর্থাৎ লাউয়ের উপরে বসানো তন্তসংলগ্ন কাঠের সমতল ছাউনি) থাকে বাইরের দিকে। তা এখন তো কলকাতার পথঘাটের বা স্টেশনগুলির যা হাল হয়েছে তাতে অমনভাবে বয়ে নিতে গেলে সেতারের দুটি লাউই ধাক্কার চোটে ভেঙে যাবার আশঙ্কা। সেইজন্য এখন আমি সেতারটি রাইফেলের ঢঙেই বহন করি বটে, তবে কাত করে নয়। গার্ড অব অনার দেওয়ার সময় যেমন রাইফেলটি বুকের উপর খাড়াভাবে রাখা হয়, আমিও ঠিক সেইভাবে সেতারটি বুকের উপরে যন্ত্র করে ধরে রেখে দিই। তবে এইভাবে সেতার বইবার সবচেয়ে বড় ঝুঁকি এই যে, সব জায়গার মাথার উপরকার আচ্ছাদন বা সিলিং তো সমান উঁচু নয়। উপরের দিকে যথেষ্ট পরিমাণে ক্লিয়ারেন্স আছে কিনা সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি না রাখলে ঝপ করে মাথার দিকে ধাক্কা লেগে যেতে পারে। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে আমার এই বাস্তব অভিজ্ঞতাই হয়েছে। এটা বুঝেছেন বলেই বোধহয় গুরুজী আমার হাতে তাঁর যন্ত্রের দায়িত্বটি অর্পণ করেছিলেন। এ ব্যাপারে সর্বদাই দুটি জায়গায় আমার লক্ষ থাকত—একটা হল আমার পা কোথায় পড়ছে, আর একটা হল সেতারের শীর্ষদেশ কোনো কঠিন বস্তুর সংস্পর্শে ধাক্কা খাচ্ছে কিনা। রাইফেলের ঢঙেই বুকে খাড়াভাবে বয়ে নিতাম বটে, কিন্তু নজর থাকত ঐ দুটির দিকে। কেননা পদক্ষেপে সতর্কতার অভাবে কোন কারণে পা হড়কে পড়ে গেলেও বিপদ, আবার লাউয়ের গায়ে ঠোকর লাগলেও ক্ষতি। বিশেষত প্লেনের ডিম্বাকৃতি নিচু দরজা দিয়ে ওঠানামার সময়ে সেতারটিকে ঈষৎ কাত করে না নিলে উপর দিকটায় চোট লাগবেই।

সীটে বসার সময় প্লেনের মেঝের উপরে সীটের ওপরকার ছোট কুশনটি পেতে তার উপরে সেতারের বড় লাউটি বসিয়ে দিতাম। তারপর সেতারটি সীটের গায়ে হেলিয়ে দিয়ে সীটবেল্ট দিয়ে বেঁধে দিতাম। মাথার দিককার লাউটি সীটের ব্যাকসাইডে ঠেকানো থাকত। প্রথম প্রথম আমি সীটবেল্টটি কষে বাঁধতে ভয় পেতাম পাছে তারটারের বা চিকারির কোন ক্ষতি হয়ে যায়। কিন্তু গুরুজী বললেন, ভয়ের কিছু নেই, আর-একটু কষে বাঁধো। ঠিক কতটা আঁট করে বাঁধতে হবে তা আবার পরখ করে দেখে বলেও দিতেন গোড়ায় গোড়ায়। বলতে কি, এই আদাজটি নিজের ভরসায় না রেখে প্রথম প্রথম আমিই ওঁর কাঁধেই এই দায়িত্বটি চাপিয়ে দিতাম। ওঁর কাছ থেকে দেখে দেখে শিখে নিলুম যে ঠিক কতটা কষে বাঁধা চলে। একটু আশঙ্কা অবশ্য রয়েই গিয়েছিল যে এত সাবধানতা সত্ত্বেও প্লেনটা যখন রানওয়ের উপর নামবে তখন ঝাঁকুনির চোটে সেতারে কোনো আঘাত না লাগে। কিন্তু গুরুজী আমাকে খুব অভয় দিলেন, আমি সারা দুনিয়া ঘুরছি এইভাবে নিয়ে, কিচ্ছু হবে না, দেখো। ভিতরে নাড়াচাড়া কোরো না, ভয় পেও না। শেষ পর্যন্ত দেখলাম যে গুরুজীর কথাই ঠিক।

মোটরগাড়িতে করে কোথাও যাবার সময় অবশ্য সেতারটি অন্যরকমভাবে নিতে হত। গুরুজী দুয়েকবার আমাকে বলেছেন সেতার নিয়ে সামনের সীটে বসতে। ঐ সীটে বসলে ঐখানে অনেকটা জায়গা থাকে তো। আর লাউটা পায়ের উপর রেখে তাহলে বেশ যাওয়া যেত। কিন্তু এতে একটা সমস্যা রয়ে যায়। এই ব্যবস্থায় বড়ো লাউটা পায়ের উপর রাখতে পারতাম

ঠিকই, কিন্তু পুরো সেতারটা তো কাঁধের উপরে ঠিক জায়গায় পড়ত না। ফলে ছোটো লাউটার গায়ে হাত দিয়ে ধরে থাকতে হত, যেটা খুবই অস্বস্তিকর। এর কারণ হল ওদের দেশের, শুধু ওদের কেন, পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের সীট ঠিক আমাদের দেশের মতো নয়। আমাদের এখানে সামনে পিছনে একই মাপের সীট। আর চীনের গাড়িতে পেছনের সীটটা ভারতের সীটের অনুরূপ হলেও সামনের সীটটা মাঝখান থেকে কাটা। ফলে গাড়ির দুলুনিতে লাউয়ের ডাঁটিটা গাড়িয়ে পড়ে যেতে পারত, সেতারটা শক্ত করে চেপে রাখতে পারতাম না, তরফের কান ভেঙে যেতে পারত। তাই গুরুজীকে বুঝিয়ে বললাম যে, ওভাবে ঠিক হয় না, আমার অসুবিধা, তাই আমি পেছনের সীটে বসে কোলের ওপর শুইয়ে যেভাবে নেব সেভাবে নিতে চাই। তারপর থেকে গুরুজী বললেন, বেশ তো, তুমি যেভাবে পার সেভাবে নাও। সাধারণত গুরুজী আর আমরা আলাদা আলাদা গাড়িতে যেতাম। তবে এক-আধবার একসঙ্গেও গিয়েছি। তখন গুরুজী আর আমি সেতারটি ধরেছি একসঙ্গে, আর লালু বসেছে সামনে।

সেতারবহন প্রসঙ্গে এত কথা বললাম শুধু এই কারণে নয় যে যন্ত্রটির নিরাপত্তার উপর সফরের সাফল্য এক অর্থে নির্ভরশীল ছিল। আসলে এই বাদ্যযন্ত্রটির প্রতি গুরুজীর যে কী-পরিমাণ মমতা, যত্ন, এমনকি শ্রদ্ধামিশ্রিত ভক্তি—তা নিজের চোখে দেখেছি বলেই এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বটি আমার কাছে এত মহান, পবিত্র এক কর্তব্যের রূপ নিয়েছে। বাদকমাত্রেই বাদ্যযন্ত্রের যত্ন নেবেন, এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু গুরুজীর কাছে যন্ত্র তো শুধু দারু আর ধাতুর সমন্বয়ে রচিত এক উপকরণমাত্র নয়। তাঁর দৃষ্টিতে যন্ত্র যেন সাক্ষাৎ সংগীতেরই প্রতিমূর্তি, অর্চনীয় এক প্রতিমা। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ছে, বছর কয়েক আগে গুরুজীর সঙ্গে বর্ধমানে গেছি। উঠেছি সার্কিট হাউসে। সেখানেও আমি তল্পিবাহক। বিশেষত যন্ত্রের দায়িত্ব আমারই উপর, এমনকি অনুষ্ঠানের আগে নতুন তার পরিয়ে সব ঠিক আছে কিনা দেখে দেওয়া ইস্তক। অনুষ্ঠানান্তে তখন বাড়ি ফেরার পালা। আমি গুরুজীর জিনিসপত্র একে একে গুছিয়ে তুলছি। ধোপাবাড়ির কাচানো ওঁর কিছু অব্যবহৃত কাপড়জামা সুটকেশে সমস্ত গুছিয়ে দিলাম। এবার পরপর যেসব কাজ করতে হবে আমার তো জানাই। কাপড়জামা গুছিয়েছি, সুটকেশ প্যাকিং হয়ে গেছে। এবার যেই সেতারটা ধরতে গেছি উনি হাত চেপে ধরলেন। ধরে বললেন, বেটা, হাতটা ধুয়ে এসো। এইগুলো একটু খেয়াল করবে তো? এই বলতেই আমি একটু চমকে ওঁর মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। ওঁর কথার মর্ম বুঝতে পেরে, কী বলব—ভক্তিতে শ্রদ্ধায় একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। আমি সঙ্গে সঙ্গে বাথরুমে গিয়ে হাত ধুয়ে এলাম। সেদিন বুঝেছিলাম উনি যন্ত্রকে কী চোখে দেখেন, তার সম্পর্কে ওঁর শুচিতার দাবি কত আপসহীনভাবে কঠোর। অথচ আমরা কজনই বা বাদ্যযন্ত্রকে জড়-পদার্থের অতিরিক্ত মর্যাদা দিই?

সেতার নিয়েই যত সমস্যা ছিল, তানপুরা নিয়ে আদৌ নয়। তানপুরাটি থাকত একটি বাক্সের মধ্যে। একটি জয়পুরী ছাপা কাপড়ে জড়িয়ে এমনভাবে শুইয়ে রাখা হত যাতে বাক্সের গায়ে দোলা লাগলেও তানপুরায় কোনো চোট না লাগে।

যন্ত্রপ্রসঙ্গে আপাতত এখানেই ইতি টানি। ঘন ঘন প্রসঙ্গান্তরের দরুন যাত্রাবর্ণনা ব্যাহত হওয়ায় কেউ কেউ নিশ্চয় বিরক্ত বোধ করছেন। কিন্তু অত ব্যস্ত হওয়াই বা কেন? একবার সফরের বাঁধা গতিবেগে শামিল হয়ে গেলে একের পর এক ঘটনা আর পরিস্থিতির ঘাড়ে চেপে রুদ্ধশ্বাসে তো ছুটে চলতেই হবে, তার আগে বরং একটু দম নিয়ে নিলে মন্দ কী? আলাপ ছেড়ে গত-তান-তোড়ায় প্রবেশ করলে লয় তো ক্রমে বাড়িয়েই চলতে হবে। তখন আর সুরের ভেলায় চেপে লঘু উৎফুল্লতায় ভেসে বেড়াবার অবকাশ কতটুকুই বা পাব?

[ক্রমশ

স্কেচ ঃ গণেশ পাইন

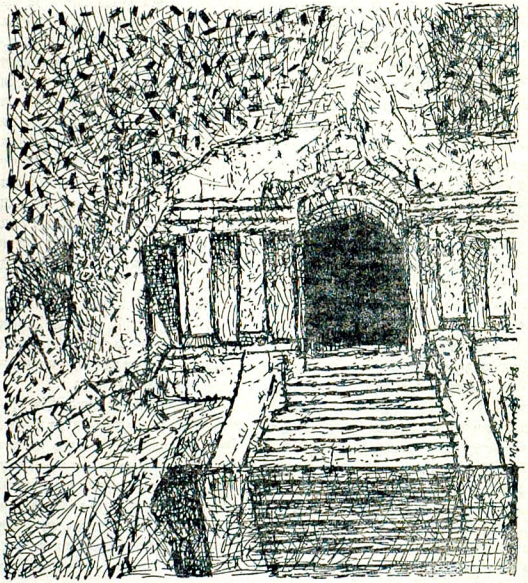

সোপান

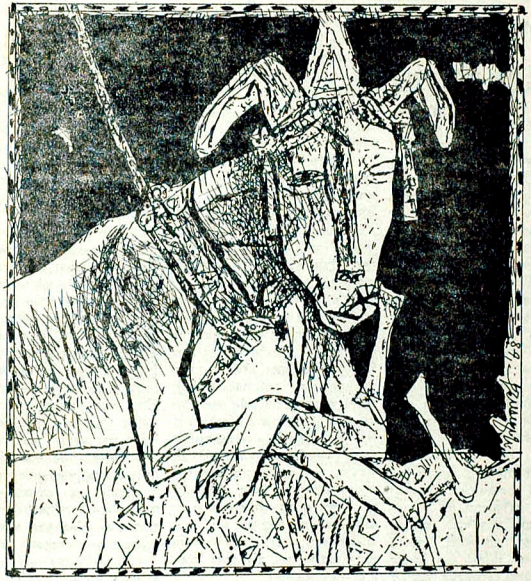

সারমেয়

শিল্পীর জন্ম ১১ই জুন, ১৯৩৭ কলকাতায়। ১৯৫৯ সালে গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস থেকে স্নাতক হয়ে সোসাইটি অব কনটেমপোরারি আর্টিস্টস (কলকাতা)-এ যোগদান করেন ১৯৬৩ সালে। গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস, আকাদেমি অব ফাইন আর্টস, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিড়লা অ্যাকাদেমি অব আর্ট অ্যান্ড কালচার প্রভৃতি শিল্পসংস্থার দ্বারা পুরস্কৃত হন। ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্ট (নয়া দিল্লী), আকাদেমি অব ফাইন আর্টস (কলকাতা), সুর্য গ্যালেরি (পশ্চিম জারমানি), বিড়লা আকাদেমি অব আর্ট অ্যান্ড কালচার প্রভৃতি সংস্থায় এবং অনেকের ব্যক্তিগত সংগ্রহে তাঁর ছবি সংগৃহীত আছে। ১৯৫৭ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত এগারোটি প্রদর্শনী দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং বিদেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গীতাঞ্জলি পর্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত

রবীন্দ্রনাথের জীবনে সংগীত রচনার যে সময়টি সর্বাপেক্ষা সার্থকতায় উত্তীর্ণ হয়েছে সেটি বোধহয় 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' এবং 'গীতালি' রচনার কাল। এই যুগে তিনি যেসব গান রচনা করেছেন, পরিণতির দিক থেকে সেগুলি সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং এই যুগের গানগুলি যতটা সর্বজনীন সমাদর লাভ করেছে, অন্য কোনো যুগে তেমনটি হয় নি। তার কারণ, এই সময় বয়স, রচনা, সাহিত্য, সংগঠন, সুরারোপ,—সর্বদিক থেকেই তিনি একটি বিশিষ্ট প্রাজ্ঞস্তরে পৌঁছেছেন, যে স্তরে অবস্থানকালে স্রষ্টা নূতনকে স্বীকার করে নেন অথচ পুরাতনকে আরও গভীর করে উপলব্ধি করেন। এই যুগের গানগুলির মধ্যে কবিগুরু সেই উপলব্ধির পরিচয় এবং স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

এর আগে রবীন্দ্রনাথ বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন 'মায়ার খেলা' প্রভৃতি গীতিনাট্যের গানগুলিতে। তখন তিনি ছিলেন পুরোপুরি রোমান্টিক। কাব্যের মোহময় মাদকতায় তাঁর গানগুলি আচ্ছন্ন ছিল। সেটি ছিল একটি প্রবল আকর্ষণ, এবং আর-একটি আকর্ষণ ছিল কাব্যের মধ্যে রাগসংগীতের প্রতিফলন। তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে খুবই প্রসারলাভ করেছে। বহু প্রোফেশনাল ওস্তাদও রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেন বেশ ওস্তাদি করে। এতে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ভাবমূর্তি অনেক সময় প্রবলভাবে ব্যাহত হত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কখনো আপত্তি উত্থাপন করেন নি ; কারণ তিনি সেই যুগে তাঁর গানের সর্বজনগ্রাহ্যতাকে অস্বীকার করতে চান নি। এর পিছনে একটা যুগের প্রচলিত ধারা এবং রীতিপদ্ধতির সাক্ষ্য আছে, যাকে বলে ট্র্যাডিশন। সেটির প্রতি কবি স্বভাবসৌজন্যবশত অস্বীকৃতি প্রদর্শন করেন নি। এক সময় তিনি অতুলপ্রসাদকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—"পরশু একটা নতুন গান রচনা করিয়া রাখিয়াছি—যদি পছন্দ করেন কীর্তনের সুরে বসাইয়া কাহাকেও দিয়া গাওয়াইয়া লইতে পারেন।" নানা কারণে তিনি তখন নিরতিশয় ক্লান্ত ছিলেন। তাই সুরের নির্দেশ দিয়ে অতুলপ্রসাদের ওপরেই তার কম্পোজিশনের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, যদিচ সুরের আইডিয়াটুকু দিতে ভোলেন নি। এইটাও বিগত যুগের একটা প্রথাগত নিদর্শনমাত্র।

'বাল্মীকিপ্রতিভা' অথবা 'মায়ার খেলা'-র যে পরিকল্পনা ছিল, তারই আর-একটা বৈচিত্র্যপূর্ণ মডিফিকেশন ঘটল কবিগুরুর সুপরিণত বয়সে, যখন তিনি সৃষ্টি করলেন নৃত্যের আঙ্গিকে আখ্যান রচনা। কখনো কখনো একটি আখ্যানবস্তুকে তিনি পাঠ করে যেতেন এবং সেটি রূপায়িত হত মূক নৃত্যাভিনয়ে ; তার সঙ্গে থাকত গানের সংযোগ। এইসব সৃষ্টিতেও তিনি বহু পুরাতন রচনা থেকে গান নির্বাচন করতেন, আবার নতুন করেও রচনা করতেন। দ্বিতীয় সৃষ্টিতে টেকনিকের বদল ঘটেছিল। এইসব গানে রাগসংগীতের ধারায় আর্টিস্টের স্বকীয়তা প্রয়োগ করবার সুযোগ তিনি রাখেন নি। এইখানেও রবীন্দ্রনাথ অতি বিশিষ্ট কম্পোজার, কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি বাঙলার সংগীতজগতে একজন বিচ্ছিন্ন পার্সোনালিটি। এই পর্যায়ের শেষ ভাগেই দেখা দিল তাঁর নৃত্যনাট্যপরিকল্পনা। কিন্তু এইসব সৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে গানের পরিধিতে আসে না, কারণ এদের একটা মস্ত অংশ জুড়ে আছে অভিনয় এবং নৃত্য। গান এসব ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক সংযোজন, যদিচ তারও বিশেষ মুখ্য ভূমিকা বর্তমান।

এই শেষ পর্যায়ে যেটা কবির সাংগীতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল এই যে, এই যুগে তিনি একজন বিচ্ছিন্ন সংগীতস্রষ্টা, যিনি অতিমাত্রায় ইনডিভিজুয়ালিসটিক এবং সর্বতোভাবে আত্মকেন্দ্রিক। কলকাতায় বা পদ্মার অঞ্চলে বাস করার সময় তিনি বাঙলার সংগীতশিল্পকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ছিলেন চলমান রাগসংগীতের অনুরাগী এবং অনুসারী। শেষ জীবনে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর তিনি ক্রমশই আশ্রমের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে তাঁর সৃষ্টিকে মানিয়ে নিতে চাইলেন। তাঁর গান গাইবার প্রধান মাধ্যম ছিল আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রী এবং অপরাপর সহযোগীরা। অনেক সময় তাদের জন্যে তাঁকে সহজভাবে এবং বিশেষ ছন্দে গান রচনা করতে হত। তাঁর বিরাট সৃজনশীল মন এই সৃষ্টির মধ্যে একটা বিশিষ্ট টেকনিকের সন্ধান পেল। এই রচনাধারায় তিনি তানের কাজ বা বিস্তারধর্মিতার কাজ প্রায়ই বাদ দিয়েছেন, কিন্তু পূর্ণতা প্রদান করেছেন সুরের সহজাত লালিত্যে, মীড়ে এবং ছন্দে। এই সময়ে তিনি নিজেকে একেবারে একান্তে অর্পণ করেছিলেন। তিনি গান রচনা করে আশ্রমবাসীদের শেখাতেন ; সেই পরিবেশে উৎসবাদিতে তাঁদের কণ্ঠে গান শুনে আনন্দিত হতেন এবং তার বেশি কামনা আর তাঁর ছিল না। তথাপি, তিনি মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন আশ্রমবাসীদের নিয়ে, দিনকতকের জন্যে সংগীতানুষ্ঠান করে যেতেন কলকাতার বিশিষ্ট জনসমাজে। এইসব অনুষ্ঠানে কিছু গান কলকাতায় জনপ্রিয় হত এবং সেগুলি গেয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করতেন কলকাতার কোনো কোনো শিল্পী। এর ফলে রবীন্দ্রনাথের নবপর্যায়ের বহু গানও কলকাতায় বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। এর জন্যে কলকাতার কোনো কোনো শিল্পীকে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবার কৃতিত্ব অনেকে প্রদান করে থাকেন ; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা সেইরকমের নয়। আসলে, রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল ধরেই প্রবাস জীবন যাপন করেছেন। কিন্তু পদ্মাতীরে বাসের সময় তাঁর বয়স অল্প ছিল ; তিনি প্রায়ই কলকাতায় আসতেন এবং বহু সভায়, সমাজে, অনুষ্ঠানে গান করতেন। অতএব, তাঁর ব্যক্তিত্বটা কলকাতায় তখনও বহুল পরিমাণেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রৌঢ় বয়সে তিনি সেই কেন্দ্রবিন্দু থেকেই সরে গেলেন এবং তাঁর গানের ধারাটাও স্বতন্ত্রভাবে বিকাশলাভ করতে লাগল শান্তিনিকেতনকে বেষ্টন করে। এই সময়ে কেবলমাত্র বিশেষ কারণে মাঝে মাঝে তিনি কলকাতায় এসে অনুষ্ঠানের ইচ্ছা প্রকাশ করতেন ; অথবা অনেকে তাঁকে অনুরোধও জানাতেন। তখন তাঁর বেশ কিছু সদ্যোরচিত গান কলকাতায় জনপ্রিয়তা অর্জন করত। কলকাতার অনেক গায়ক-গায়িকা সেইসব গান থেকেই প্রেরণা পেয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজেই মাঝে মাঝে কলকাতায় এসে তাঁর গানের অনুষ্ঠান না করে গেলে তাঁর শেষ পর্যায়ের গানগুলি এত গভীরভাবে নব্যযুগের শিল্পীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হত কিনা সন্দেহ। এমনকি, তাঁর জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এই ঘটনাই ঘটে এসেছিল। কলকাতায় তাঁর শেষ বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানের পর বহু গান কলকাতার গায়কসমাজে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং সেগুলির একাধিক রেকর্ডও কয়েক বছরের মধ্যেই প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল।

যাই হোক, মূল প্রসঙ্গেই ফিরি। রবীন্দ্রজীবনের প্রথম পর্যায়ের গান এবং শেষ পর্যায়ের গান সম্বন্ধে উল্লেখ করেছি তাঁর মধ্যবয়সের সংগীতরচনার গুরুত্বটিকে অবধারণ করবার জন্যে। তাঁর যৌবনের গানে যে রোমান্টিকতার উচ্ছ্বাস ছিল তা বহুল পরিমাণে স্থিতিলাভ করেছে গীতাঞ্জলির যুগে, কিন্তু চিরন্তন সৌন্দর্যের উপলব্ধি প্রগাঢ় হয়েছে। এই যুগের গানে তিনি কনভেনশনাল হলেও বিশেষভাবে ওরিজিনাল, এবং পরের যুগের ইঙ্গিতও তাঁর বেশ কয়েকটি গান থেকে পাওয়া যায়। এগুলোর রচনায় তিনি রাগসংগীতকেই অবলম্বন করেছেন ; এই দিক দিয়ে তাঁকে চিরাচরিত রীতির অনুবর্তী বলা যায়। প্রায় প্রতিটি গানেই তিনি চারটি কলিকে যথাযথভাবে রক্ষা করেছেন, কিন্তু বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, তাঁর রচনাগুলিতে রাগসংগীত কাব্যের মধ্যে আশ্রয়লাভ করেছে, নিবিড়ভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে, কোনো ক্ষেত্রেই রাগসংগীত কাব্যকে অতিক্রম করবার উপায় খুঁজে পায় নি। এর ফলে যে সংগীত সৃষ্টি হয়েছে তাতে মেলডির চমৎকার বিকাশ আমাদের অভিভূত করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রচলিত কাব্যসংগীতে এই জিনিসটা ঘটে নি, কারণ কম্পোজারদের পরিকল্পনার মধ্যে কাব্য এবং রাগসংগীত উভয়েরই এইরকম ধারায় মিলিত হয়ে ওঠবার চেষ্টা ছিল না। সেসব রচনায় কাব্যের যথেষ্ট স্বীকৃতি ছিল এটা ঠিক, কিন্তু তান বিস্তারে তা আরও সাজেস্টিভ হয়ে উঠুক, এমনকি বৈঠকি গানের আসরেও তা গৌরবান্বিত হোক,—এইটাই ছিল তাঁদের কাম্য। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা ছিল ভিন্নতর ; তিনি তাঁর গানে রাগের আরোপ করেছিলেন, কিন্তু তা কাব্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়ে একটা সেলফ-সাফিসিয়েন্ট মেলডিতে বিকশিত হয়ে উঠুক—তিনি এই রূপায়নটাই চেয়েছিলেন। প্রচলিত প্রচেষ্টায় তান বিস্তারে যে সাজেস্টিভনেস সম্ভব হয়, সেটা তিনি একটি বিশেষ কাব্যসাহিত্যের ভাষায় এবং সুরের মনোহারিত্বে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সঞ্চারীসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের দক্ষতা অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগে, তাঁকে বাদ দিলে, প্রচলিত অপরাপর বাঙলা গানে সঞ্চারীর সৃষ্টি খুব সামান্যই দেখা যায় ; অধিকাংশ গানে স্থায়ীর পর একাধিক অন্তরাই দেখা যেত। যাঁরা গাইতেন, তাঁরা বিস্তারের মধ্যে সঞ্চারীর সামান্য অবকাশ রাখতেন। রবীন্দ্রনাথ সঞ্চারীকে একটি প্রধান সংযোজক অঙ্গ হিসাবে দেখেছিলেন এবং সঞ্চারীর পরেই আভোগের পরিবর্তনে একটা অসামান্য তৎপরতা তাঁর রচনায় পরিলক্ষিত হয়। এটি অত্যন্ত পরিণতভাবে প্রযুক্ত হয়েছে এই গীতাঞ্জলির যুগের সংগীতসৃষ্টিতে। পরবর্তী কালে সঞ্চারীতে তিনি আরও বহু অভিনবত্ব সম্পাদন করেছিলেন। তা ছাড়া, গানের ভাষা, লালিত্য, গাম্ভীর্য এবং রমণীয়তা গায়ক-গায়িকাদের সর্বতোভাবেই আকৃষ্ট করেছে। তাঁরা নিশ্চিতভাবেই এর আগে,—"বিশ্ব যখন নিদ্রামগন গগন অন্ধকার" বা "সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগি নি"—এই ধরনের গানের সঙ্গে পরিচিত হন নি। এই গানগুলিতে এমন একটা মিস্টিক স্পর্শ আছে যা আমাদের অবচেতন মনকে দোলা দেয়, অভিভূত করে। এই যুগের বহু গানের মধ্যে মাত্র কয়েকটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গানের উল্লেখ করছি।

গীতাঞ্জলি

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে ; কত অজানারে জানাইলে তুমি ; লেগেছে অমল ধবল পালে ; মেঘের পরে মেঘ জমেছে ; অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে ; রূপসাগরে ডুব দিয়েছি ; জীবন যখন শুকায়ে যায় ; বিশ্ব যখন নিদ্রামগন ; সে যে পাশে এসে বসেছিল ; সভা যখন ভাঙবে তখন ; এই করেছ ভালো নিঠুর ; সীমার মাঝে অসীম তুমি।

গীতিমাল্য

রাত্রি এসে যেথায় মেশে ; ওগো শেফালি বনের মনের কামনা ; যদি প্রেম দিলে না প্রাণে ; রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি ; দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে ; কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না ; এই লভিনু সঙ্গ তব।

গীতালি

বাধা দিলে বাধবে লড়াই ; আগুনের পরশমণি ; মোর হৃদয়ের বিজন গোপন ঘরে ; ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার।

আমাদের বাল্যকালে এই গানগুলি প্রায় মুখে মুখেই শোনা যেত ; এমনকি সংগীতশিক্ষার্থীরা পর্যন্ত এইসব গান দিয়ে তাদের শিক্ষার বনিয়াদ গড়ে তুলত। সেটা ছিল বাঙলা গানের যুগ ; শিশুবয়স থেকে হিন্দীভাষার গান তখন ছেলেমেয়েদের শেখানো হত না। বড়োদের মধ্যে যাঁরা এসব গান গাইতেন তাঁরা এদের রবিবাবুর গান বলে উল্লেখ করতেন। পূর্বেই বলেছি, যেসব গানে রাগসংগীতের স্পর্শ থাকত সেসব গানে গায়ক-গায়িকারা যথেষ্ট স্বকীয়তা যুক্ত করবার স্বাধীনতা গ্রহণ করতেন। শেষ পর্যন্ত যাঁদের কথা মনে পড়ে তাঁদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী ছিলেন প্রধান। কিন্তু জনকয়েক আত্মীয় বা বন্ধু তাঁকে সাবধান করে দিয়ে বলেন,

কবি এই ধরনের গায়কী পছন্দ করেন না ; যার ফলে জ্ঞানবাবু শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের গান আর গাইতেন না। কবির দিক থেকে কিন্তু এরকম কোনো প্রস্তাব উত্থাপনের অবকাশ ঘটে নি এবং তরুণ-বয়স্ক বা পূর্ণবয়স্ক জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ কখনও রবীন্দ্রনাথকে গান শোনাবার সুযোগও পান নি। একবারমাত্র বালক বয়সে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ পাথুরেঘাটার ঘোষ পরিবারের গৃহে রবীন্দ্রনাথকে গান শুনিয়েছিলেন এবং কবি তাঁর প্রশংসা করেছিলেন ; কিন্তু তখন তিনি খুবই ছোটো। এ খবর আমার মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয়ের কাছ থেকে শোনা। তবে, পরবর্তী কালে যখন গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে গানের ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথের যোগসাধন হয়, তখন তিনি পাকাপাকিভাবে যাতে তাঁর গানের সুর যথাযথভাবে রক্ষিত হয়, সেইরকম বন্দোবস্ত করেছিলেন। তথাপি, এই সময়েও কেউ কেউ তাঁর পূর্বযুগের গান কিছুটা তানবিস্তারসহযোগে তাঁকে শোনাতেন, তাতে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন নি ; কারণ তিনি জানতেন যে তাঁদের পক্ষে ওই রীতিটাই একান্তভাবে স্বভাবসিদ্ধ। তবে, দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে তাঁর প্রবল মতভেদ ঘটেছিল। তার কারণটা কিন্তু অন্যরকম। যে গানে তানবিস্তার কবির মতে একেবারে বেমানান সেক্ষেত্রে তিনি এইরকম প্রয়াস কোনোক্রমেই অনুমোদন করেন নি।

কবির স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত আর্টকে উপলব্ধি করা সাধারণ গায়ক-গায়িকাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না ; কারণ সাক্ষাতে তাঁর গান শোনবার সুযোগ দুর্লভ ছিল। পাঁচজনের মুখে বহু গান পরিবর্তিত হত, বিকৃতও হত ; তা সত্ত্বেও গীতাঞ্জলির গানগুলিতে সুরের যে কাঠামো পাওয়া সম্ভব হত সেইটি এবং ভাষার অসাধারণত্ব শিল্পীমাত্রেরই চিত্তহরণ করছে। তাই তাঁরা স্বকীয় রীতিনীতিসহযোগে বেছে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের এই পর্যায়ের সংগীত।

এই ব্যাপারে একটা ব্যাপার আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে—সেটা হচ্ছে রাগসংগীতের রূপকারিতায় রবীন্দ্রনাথের অভিনবত্ব। প্রাচীন রীতির অনুসরণে হিন্দীভাঙা গান একদা রবীন্দ্রনাথ অনেক রচনা করেছিলেন ; সেগুলি সাধারণভাবে প্রযুক্ত, যদিচ প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁর বিশেষ চিন্তার পরিচয় বহন করে। এসব গানও বাঙলার ওস্তাদেরা খুবই সমাদরে গাইতেন ; কিন্তু গীতাঞ্জলির যুগে রাগসংগীতকে কাব্যের উপযুক্ত মেলডি হিসাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, যেখানে রবীন্দ্রনাথ রাগধর্মী সংগীতের ক্ষেত্রেও একজন অনন্যসাধারণ কম্পোজারের স্বীকৃতি লাভ করেছেন। ওস্তাদেরা সেই মেলডিকে যদি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম না হয়ে থাকেন, তবে সেটা ঘটেছে তাঁদের অন্যতর সৌন্দর্যবোধের জন্যে ; অর্থাৎ তানবিস্তারই যে একমাত্র গানকে সংগীত করে তোলে, এই ধারণার জন্যে। কেউ কেউ আবার রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে অন্য সুরে অন্য তালেও গাইতেন, গ্রহণ করতেন শুধু কাব্যসম্পদকে ; কিন্তু শ্রোতাদের কাছে তাঁরা আদৌ ছাপ রাখতে পারেন নি, যার ফলে তাঁদের রীতি কিছুমাত্র অগ্রসর হতে পারে নি।

আসল ব্যাপারটা কিন্তু বাঙলায় গায়ক-সমাজে রবীন্দ্রসংগীতের স্বীকৃতি। 'রবিবাবুর গান' চিরকালই সমাদৃত হয়েছে, কিন্তু গীতাঞ্জলির যুগের গানগুলি সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছিল। এমনকি পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী, যিনি বাঙালী ছিলেন না, তিনিও প্রগাঢ় যত্নে দেবনাগরী অক্ষরে তাঁর পরিচিত স্বরলিপিতে গীতাঞ্জলির গানগুলি উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন ভারতের সব দেশের গায়ক-গায়িকাদের জন্যে।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

নাটক

অভিনয়ের থিয়েটার থেকে জীবনের থিয়েটার

"মাই ডিনার উইথ আন্দ্রেই" ছবিতে মুখ্যচরিত্র ওরফে অভিনেতা আন্দ্রেই গ্রেগরির একটি সংলাপে একসময়ে বেশ ভাবতে হয়েছিল আমাদের। মূলত কথোপকথন-ধর্মী এই ছবিটিতে আন্দ্রেই গ্রেগরি কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওঁরই ঘনিষ্ঠ নাট্যকার বন্ধু ওয়ালিকে জানাচ্ছেন তাঁর জীবনের এক বিচিত্র দলিলের কথা। একটি আন্তর্জাতিক নাট্য-গবেষণাগার থেকে আন্দ্রেইর কাছে যখন এসেছিল কোনো নির্দিষ্ট-সময়-মাফিক বিশেষ কিছু প্রশিক্ষণ দেবার আমন্ত্রণ, হাসতে হাসতেই তিনি ত্বরিতগতিতে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন মারাত্মক এক প্রস্তাব। এখানেই বলে রাখা ভালো, নিউইয়র্কের অধিবাসী এই আন্দ্রেই গ্রেগরির বাজার তখন বড়ই রমরমা—'অ্যালিস্ ইন্ ওয়ান্ডারল্যান্ড'-এর মঞ্চরূপ এবং 'ম্যানহাটান প্রোজেক্ট্' নামক ব্যাপক কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে।

আন্দ্রেই গ্রেগরির প্রস্তাবের ধাঁচটি ছিল এইরকম : তিনি বেছে নিতে চান জনাবিশেক ইহুদী রমণী, যাঁরা প্রত্যেকেই হার্প বা ট্রামপেট বাজানোতে খুবই দক্ষ। আর শুধু তাই নয়—এঁদের প্রত্যেকেই হবেন হয় কোনো অভিনেত্রী, কিন্তু বর্তমানে যিনি নাট্যাভিনয়ের থেকে নিজস্ব তাগিদে খুঁজছেন ছাড়পত্র। অথবা এঁরা থিয়েটারকে আবাল্য ভালোবাসেন প্রাণপণ, অথচ এ পর্যন্ত এখনও এমন কোনো নাটকের অভিনয় দেখেন নি যা এঁদেরকে পরিতৃপ্তি দিয়েছে।

ছবিটির থেকে আমরা এও জানতে পারি—অবশেষে আন্দ্রেই গ্রেগরি পোল্যান্ডের এক জনবিরল অরণ্যে দীর্ঘ এক মাস ধরে গড়ে তুলেছিলেন ব্যাপক সেই অনুষ্ঠান। সঙ্গী হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন জনাবিশেক রমণী, তাঁরা অবশ্য প্রত্যেকেই ইহুদী নন। আর, সবাই হার্প বা ট্রামপেট বাজাতে না জানলেও, প্রত্যেকেই কোনো না কোনো বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে থাকেন। আন্দ্রেইর বিবরণ অনুযায়ী, জনবিরল সেই অরণ্যটিতে একমাত্র বাসিন্দা বলতে ছিলেন এক সাধক, আর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-থাকা কিছু বুনো শুয়োর। একমাসের জন্য ওঁরা সঞ্চয় করে রেখেছিলেন টুকিটাকি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আর খাবারদাবার। কর্মযজ্ঞ শুরু হত সূর্যাস্তের পর, নানারকম মুভমেন্টের মধ্য দিয়ে, যার সবটুকুই গড়ে উঠছিল শুধুমাত্র ইমপ্রোভাইজেশনের মাধ্যমে। আর যেহেতু নৃত্য আর সংগীত পোলিশ ট্র্যাডিশনের অন্যতম অঙ্গ, তাই এই মুভমেন্টডিসকভারির সঙ্গে থাকত, প্রত্যেকের নিজস্ব সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় ঐতিহ্যবাহী কোনো গান গাওয়া আর তার সঙ্গে তারই নিজস্ব ঘরানার নাচ। সমস্ত রাত কেটে গিয়ে, যখন সূর্য উঠত, বেলা বাড়তে থাকত, একটি কাঠের গুঁড়ির ওপর খাবারদাবার খেয়ে নিয়ে সেদিনকার মতো বিশ্রাম। সূর্যাস্তের পর আবার শুরু সেই দীর্ঘ কর্মযজ্ঞের।

খতিয়ে দেখতে বসলেই বোঝা যায়, বিরাশি সালের মাঝামাঝি, পূর্বে উল্লিখিত ফিল্ম-মারফত আন্দ্রেই গ্রেগরির ঐ প্রস্তাব যখন আমাদের কর্ণগোচর হয়, তখন আমরা একেবারে আমূল নড়ে উঠি না! কেননা, তাবৎ ইউরোপ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কোনো অংশে শুরু হয়ে গেছে নাট্যক্রিয়ার এক গঠন-জগৎ। নাটক বলতে শুধুমাত্র যে অভিনীত কোনো বিষয়বস্তু বুঝি না, তা সে মঞ্চেই হোক আর মাটিতেই হোক—আন্দ্রেইর প্রস্তাব আমাদের সেই বোধটুকুকে ছুঁয়ে যায়। ইদানীং তাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে, 'ওয়ার্কশপ' নামের শব্দটি যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে গেঁথে বসছে বিচক্ষণ সমস্ত নাট্যদলগুলির কাছে, এক অপরিহার্য অবলম্বন হিসেবে। ভারতবর্ষের নানান জায়গাতেও শুরু হয়ে গেছে তার ব্যাপক বিস্তার। প্রশ্ন তো জাগতেই পারে, তবে কি শুধুমাত্র রিহার্সাল আর নিয়মিত অভিনয়ের আদলেই ধরে রাখা যাচ্ছে না সমগ্র থিয়েটারের অবয়বখানি?

আর এরই ভাবনা-চিন্তায় পথ খোঁজা হচ্ছে বিভিন্ন দিকে। হদিশ মিলছে এক অভিযাত্রার। একমাত্র 'ওয়ার্কশপ' করাই যে সেই অভিযাত্রার একমাত্র সরল-সিধে পথ, তা বলছি না মোটেই। এমনকি 'ওয়ার্কশপ' শব্দটির ব্যঞ্জনা নিয়েও সন্দেহ আছে। কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গেই একজন খ্যাতিমান নাট্য-পরিচালক—যিনি একটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকে দলের কর্ণধার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক—'ওয়ার্কশপ' শব্দটির ব্যবহার নিয়ে আপত্তি তুলেছিলেন। তাঁর আপত্তি ছিল, 'ওয়ার্কশপ' শব্দটির মধ্যে যে কারখানাঘরের রূঢ় অর্থ লুকিয়ে থাকে, নাট্যশিল্পে এই শব্দের অনুপ্রবেশ মানেই, নাটক এখন হয়ে দাঁড়াবে ছাঁচে-ঢালাই কোনো নির্দিষ্ট একটি পদ্ধতিতে তৈরি পণ্যের বাজার!

শব্দটি নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, এ তো অস্বীকার করা যায় না, বিভিন্ন বিচিত্র দিকে নাট্যগঠনযজ্ঞের যে আলোড়ন শুরু হয়েছে 'ওয়ার্কশপ' নামের অনুষ্ঠানগুলি তার হদিশ দেয় অবশ্যই। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে 'ওয়ার্কশপ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তাও নয়। 'প্রোগ্রাম', 'ওয়ার্ক-সেশন'—এই সমস্ত অভিধাই অনেক বৈজ্ঞানিক সন্দেহ নেই। আন্দ্রেইও ব্যবহার করেন নি 'ওয়ার্কশপ' শব্দটি।

এরই প্রাসঙ্গিকতায় মনে পড়ে যায় অন্য আর-একটি উদাহরণ। ইতালির এত্রুস্কান্-ঐতিহ্যবাহী রাজ্যগুলির অন্যতম শহর ভলতেরার ফাউস্তো পলুকিনোত্তা তাঁরই ফরাসি সহযোগী ফ্রাঁসোয়া কানের সঙ্গে যে প্যারা-থিয়েট্রিকাল অ্যাক্টিভিটির অনুষ্ঠান-সংগঠনের জন্য অবিরল পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, তারই একটি অন্যতম উদাহরণ হল 'গ্যাদারিং ইন নাইট' নামের ক্রিয়াকাণ্ডটি। এখানেই বলে রাখা দরকার, আন্দ্রেই যদিও তাঁর কর্মযজ্ঞে বেছেছিলেন তেমনই সঙ্গীদের, যাঁরা কোনো-না-কোনোভাবে জড়িয়ে আছেন 'থিয়েটার' শব্দটির সঙ্গে, কিন্তু ভলতেরার প্রস্তাবে তেমন কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। তাই অনায়াসেই সেখানে নানান মাত্রার মানুষের যোগাযোগ ঘটে। একজন থিয়েটার-কর্মীর পাশে একজন শ্রমিক, বা একজন কেরানির পাশে দাঁড়ান কোনো মন-চিকিৎসক।

'গ্যাদারিং ইন নাইট'এ এঁরা জড়ো হন রাত্রে। ফাউস্তো, ফ্রানিও বা ভলতেরার অন্য কর্মীরা আগের থেকেই একটি বড়ো ঘরে (ইতালীয় পরিভাষায় 'সালা') নিজস্ব কোনো শারীর ভঙ্গিতে অপেক্ষায় থাকেন। আর এ-সমস্ত শারীর ভঙ্গিই যেন মুভমেন্ট শুরুর আগের মুহূর্ত হিসেবে উদ্ভাসিত হয়। যাঁরা যোগ দেন তাঁরা একে একে ঢোকেন সেই ঘরটিতে, নিজের অবস্থান-অংশটি খুঁজে নেন। ক্রমে ভলতেরার কর্মীরা ধীরে ধীরে নড়াচড়া করতে শুরু করেন। ধারাবাহিকতায় সেই মুভমেন্ট সঞ্চারিত হয় যোগদাতাদের মধ্যেও। তাঁরাও যোগ দেন সেই প্রবাহে। বিরাট এক স্রোত গড়িয়ে চলে।

এ কোনো বিশেষ কিছু রচনার ভিত্তিভূমিকে ধরে অভিনয় নয়। দর্শক আর অভিনেতার ভেদাভেদও নেই এঁদের মধ্যে। পরিবর্তে আছে শুধুই এক সঞ্চরণশীল মহা-জীবন। যে যাঁর সামাজিক জীবনকাহিনী (শারীরিক ও মানসিক) নিয়ে যোগ দিয়েছেন এই প্রবাহে, এবং তাকে অতিক্রম করেই জন্ম দিচ্ছেন গভীরতর অর্থে এক নিজস্ব জীবনের। আর এই-সমস্ত রচনাই কোনো ভাবনা-চিন্তা করে নয়, স্বতঃস্ফূর্ত এর গঠন। একই সঙ্গে, স্বতঃস্ফূর্ত এই জীবনীশক্তির চৌম্বক-আকর্ষণে অন্য আর-একজন তাঁর জীবনীশক্তি নিয়ে মাখামাখি হন। পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাত, অন্য আর-এক মাত্রা নিয়ে আসে সেই সঞ্চরণশীল মহা-জীবনপ্রবাহে। আর ঐ মহা-জীবনপ্রবাহই আদত কথা এই অনুষ্ঠানটিতে। প্রত্যেককে ঘিরে যা সঞ্চারিত হচ্ছে, যা মূলত প্রত্যেকেরই রচনা, অথচ কারুর ভূমিকাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিচ্ছে না। আর এ-সমস্ত কিছুই ঘটে চলেছে শারীরিক অঙ্গসঞ্চালনের মধ্য দিয়ে, কেননা সমস্ত অনুষ্ঠানটিরই একটি পূর্বশর্ত হচ্ছে নিঃশব্দতা, উচ্চারিত শব্দ সেখানে অনুপস্থিত।

এই ধরনের উদাহরণ আরও নানান পরিধিতে ঘটে চলেছে। আদতে তাবৎ বিশ্ব জুড়ে চলেছে নাট্যজগতের এইরকমই গঠনযজ্ঞের ইঙ্গিত। এটি ঠিকই যে, ভারতবর্ষে এর বীজ-রোপণ-পর্ব সদ্য শুরু হয়েছে, কিন্তু আড়ালে-আবডালে যে ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনার বিস্তার চোখে পড়ে নানান লোক-অনুষ্ঠানের আদলে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আর এই

সুবাদেই একটি ঘটনার কথা খেয়ালে আসে।

বেশ কিছুকাল আগে সুইটজারল্যান্ডের এক তরুণ লোক-অনুষ্ঠান-অনুসন্ধানী মনস্ক পশ্চিম বাঙলায় এসেছিলেন তাঁর কাজের তাগিদে। তিনি অবশ্য নিজেও জড়িয়ে আছেন সুইটজারল্যান্ডেরই এক প্রতিষ্ঠিত থিয়েটার-সংগঠনের সঙ্গে। ঘটনাচক্রে তাঁর সহচরদের সঙ্গে আমারও ডাক পড়েছিল পুরুলিয়ায়, ছো-নৃত্যানুষ্ঠানের পরিধিতে নানান সক্রিয় চর্চার তাগিদে। দুইজন মাত্র বিদেশী ছাড়া, আমরা সকলেই ছিলাম বাঙালী। তিন দিনের এই প্রোজেকটে, দ্বিতীয় দিন থেকেই যখন আমরা আস্ফালন শুরু করেছিলাম, ছো-নাচিয়েদের সঙ্গে একটি ট্রেনিংয়ের সুবাদে, আমরা কিছু টেকনিক্যাল স্কিল রপ্ত করে নেব, আর তারপরে শুরু হবে আমাদের গঠনচর্চা, স্নেহ-বিদ্রূপে হেসেছিলেন স্থানীয় অধিবাসীরা। পরে ওঁদেরই মতো করে বুঝিয়েছিলেন আমাদের—শরীরের ভাষায় এঁরা যা আয়ত্ত করেছেন, তা নিছক আঙ্গিক নিয়মের টেকনিক্যাল দক্ষতা নয়। তাই কোনো কিছু শিখিয়ে-পড়িয়ে দিতে গেলে, বিশেষত 'শো-ওয়ালা' থিয়েটারের লোকজনদের, তাঁদের ভয়ানক বিব্রত হতে হয়। কেননা, প্রতিমুহূর্তে তাঁদের আবিষ্কার তাঁদেরই নিজস্ব জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, সেই জীবন নিয়ে তাঁরা অন্য আবর্তের জীবনের সঙ্গে মিশতে পারেন, মুখোমুখি হতে পারেন, অথচ তার ছকটা তো জ্যামিতিক নিয়মে বুঝিয়ে দিতে পারেন না! আমরাও কিন্তু পারিনি, আমাদের অনুসন্ধানী সক্রিয় চর্চার গাণিতিক ছক, পুরুলিয়ার কঠিন মাটির ব্ল্যাকবোর্ডে বুঝিয়ে আসতে।

প্রসঙ্গটি প্রায়ই আমার চিন্তা-ভাবনায় নড়াচড়া করে। করে বিশ্বের নানান নাট্য-গঠনযজ্ঞের উদাহরণের প্রেক্ষিতে। ভারতবর্ষের নানান অঞ্চলে লোক-অনুষ্ঠানের আদলে যে গড়নচর্চা চলছে, আদতে যার বিন্যাস বহু বহুকাল আগে থেকেই, সেদিকে খেয়াল রাখলে বোঝা যায়, শুধুমাত্র রিহার্সাল-অভিনয় বন্ধনী ছেড়ে ভারতবর্ষের কয়েকজন নাট্যসাধক বেরিয়ে আসতে চাইছেন, উৎসমুখ হিসেবে মেনে নিচ্ছেন বিবিধ লোক-অনুষ্ঠান চর্চা। আর এই বোধে অভিষিক্ত ওঁরাও, তাঁদের এই নিজস্ব গবেষণার বাহারি ফসল প্যাকেট মুড়ে সবার মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার জন্যে এই মুহূর্তে নয় ততটাই, পরিবর্তে অন্যান্যদের আহ্বান জানানো তাঁদেরই জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ গবেষণা নিয়ে এর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য।

জীবনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ গবেষণার মুখোমুখি দাঁড়ানো দুই শক্তিধরের এক বহুমাত্রিক সম্মিলন চোখে পড়েছিল উনিশ শো আশি সালের পোল্যান্ডে। ইয়েজি গ্রোটোভস্কির 'থিয়েটার অব সোর্সেস'এ সক্রিয়ভাবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন হাইতির 'ভুডু' গোষ্ঠীর নির্বাচিত কয়েকজন কর্ম-সাধক এবং পশ্চিমবাংলার বীরভূম অঞ্চলের বাউল গোরখ্যাপা। গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যায় 'ভুডু' গোষ্ঠীর দায়িত্ব-নির্বাহক 'টিগা' আর 'গোর' পরস্পর পরিচিত হলেন। 'থিয়েটার অব সোর্সেস' প্রোগ্রাম তখনও শুরু হয় নি, পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হবার পালা চলছে তখন। এর বাইরে অবশ্য নির্দিষ্ট কিছু কর্মদীক্ষা শুরু হয়ে গেছে, আমরা তারই অনুশীলনে ব্যস্ত। টিগা নিজে প্রায় ইংরাজি বলতে পারেন না, আর গোর দক্ষ বাঙলাভাষাতেই। টিগা নিজেও একজন গাইয়ে, তামবুর-বাজানোতেও বিশেষ দক্ষ। কোনো দোভাষী বন্ধুর সাহায্য তোয়াক্কা না করেই ওঁদের জানাশোনা হল। আর তারপর নিজেরা উজাড় করে দিলেন, তাঁদের নিজস্ব গবেষণালব্ধ বিভিন্ন সংগীতের মধ্য দিয়ে। আমরা যাঁরা উপস্থিত ছিলাম, তাঁরা কেউই দায়িত্ব নিইনি সেই গানগুলির ভাষা অনুবাদ করে সর্বজনবোধগ্রাহ্য করে তুলতে, হয়তো সম্ভবও ছিল না। আমরা শুধুই প্রত্যক্ষ করছিলাম সেই বহুমাত্রিক সম্মেলনটিকে। হয়তো তার অবয়বে ছিল সংগীত, ওঁদের নিজস্ব ভাষায় সরস মজা, মন্তব্য, বা থমক কিংবা তামবুর-বাদন, আত্মা হিসেবে উপস্থিত ছিল ঐ দুই কর্ম-সাধক, তাঁদের নিজস্ব জীবনেরই অভিজ্ঞতা-লব্ধ গবেষণা নিয়ে। আমাদের পুরুলিয়ায় ছো-অভিযানের প্রেক্ষিতে এই ঘটনাটির কথা মনে আসে। 'গোর' কিংবা 'টিগা' কি সেই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিল, বাজারি নিয়মে ধার করতে একে অন্যের কাছ থেকে নানান অচেনা দক্ষতা? অথবা একে অন্যকে বুঝিয়ে দিতে বিভিন্ন গাণিতিক ছকগুলি, বিশেষ ভঙ্গির গায়নের, বাজনার?

আর এ-সমস্ত কিছুরই তাগিদে 'থিয়েটার' অভিধাটির নিহিত শক্তি নিয়ে চলেছে বিভিন্ন চর্চা-অনুষ্ঠান-কর্মযজ্ঞ। 'নাট্যাভিনয় ছেড়ে চলে এসো এই অন্বেষায়' —এমন জোরালো দাবি এঁরা এই মুহূর্তেই তুলবেন না। কেননা এ দাবি অযৌক্তিক। যাঁরা এখনও নাটককে 'পারফর্মিং আর্ট মিডিয়া' হিসেবে ধরে নিয়ে কাজ করছেন, তাঁদের সক্রিয় অন্বেষণকেও তো খারিজ করা যায় না! আর এই অন্বেষণের তাগিদেই হয়তো তাঁরাও একদিন বেরিয়ে আসবেন অভিনয়ের মোহ-চক্র ছিঁড়ে। আর তাই প্রশ্ন তুলছেন আন্দ্রেই গ্রেগরিরা। শুধু অভিনয়-মঞ্চ-দর্শক-অভিনেতা বৃত্তে ঘুরপাক খাওয়া 'থিয়েটার' নামের এই জীবন্ত মাধ্যমটিতে কোথায় যেন মরচে পড়ে যাচ্ছে। ক্রমশ তা হয়ে উঠছে বহু-ব্যবহৃত জীর্ণ কিছু পদ্ধতির ফসল। ভেঙে ফেলতে হবে এই বাঁধন-দরোজা। 'থিয়েটার'কে জীবনের মুখোমুখি দাঁড় করাতে হলে, তাতেও জীবন সঞ্চারিত করতে হবে। অভিনয়ের থিয়েটার থেকে তাই এদের যাত্রা জীবনের থিয়েটারে।

উনিশশো বিরাশি সালে ইতালির রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের 'থিয়েট্রোলজি' বিভাগে "অরিজিন্যাল টেকনিক ডেল এটোর" সেমিনার চক্রটিতে হাজিরা দেওয়ার সময়, মাঝেমধ্যেই উল্লিখিত হত থামাস মার্টন-এর প্রসঙ্গ। ভয়ানক অনুসন্ধিৎসা ছিল, আর সম্প্রতি মোনিকা ফারলং-এর লেখা মার্টন-এর জীবনীগ্রন্থটি হাতে এসে পড়ায় আর তাঁর (মার্টনের) অন্যান্য বইপত্তরে চোখ বুলিয়ে নিতে পারার সৌভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে, মিলিয়ে নিতে ইচ্ছে করছিল কেন রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েট্রোলজি বিভাগে তাঁর নাম বহুবার উচ্চারিত হবে?

সেই মেলানোর যুক্তি-সিদ্ধান্ত-বিতর্কে যাবার আগে, এই সংখ্যায় বরঞ্চ মোনিকা ফারলং-এর লেখা মার্টনের গতিশীল জীবনের দিকে তাকানো যাক। লক্ষণীয় এটাই মার্টন কিন্তু তথাকথিত থিয়েটারের জগতের লোক নন, এমনকি থিয়েটার সম্বন্ধে তাঁর ভাবনা-চিন্তারও কোনো প্রকাশ ঘটে নি তাঁর নানান লেখা-পত্তরগুলিতে। অন্যদিকে, এই বিংশ শতাব্দীর সবচাইতে প্রভাবশালী ক্রিশ্চিয়ান ফিগার এই মার্টন একজন দর্শন-রচনাকার এবং কবি বা সক্রিয় সমাজ-কর্মী। এবং তাঁর সবচেয়ে বড়ো পরিচয় তিনি ছিলেন একজন ট্রাপিস্ট সাধক।

মার্টনের এই অন্বেষার জীবনের পর্বগুলি ছক কেটে ভাগ করা যায়। ফ্রান্সের প্রাদে শহরে উনিশশো পনেরো সালে তাঁর জন্ম। নানান নিয়তি-নির্দিষ্ট অভিশাপে কেটেছে তাঁর শৈশব। অল্পবয়সে হারিয়েছেন বাবা ও মাকে। তার পরের পর্বে তাঁকে দেখতে পাই, কেমব্রিজ এবং কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ঝকঝকে ছাত্র হিসেবে। সেখানে তিনি এক বোহেমিয়ান যুবা। মার্কসবাদের সঙ্গে এখানেই তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে আর বাইরে নানা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ব্যাপারে আন্দোলন-সংগঠনে মার্টন এক অত্যুৎসাহী যুবা। এরই পাশাপাশি চলছিল তাঁর নিজস্ব সাহিত্যকর্ম। উনিশশো চুয়াল্লিশ সালে বেরোনো মার্টনের 'থার্টি পোয়েমস' বইখানি নিউ ইয়র্ক শহরে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। তার মধ্যেকার একটি কবিতায় মার্টনকে পরিষ্কার চেনা যায় :

The white girls lift their heads
like trees,

The black girls go

Reflected like flamings in the
street.

The white girls sing as shrill
as water,

The black girls talk as quite
as clay.

The white girls open their
arms like clouds,

The black girls close their
eyes like wings :

Angels bow down like bells,

Angels look up like toys,

Because the heavenly stars
Stand in a ring :
And all the pieces of the
mosaic, earth,
Get up and flyaway like birds.

কবিতাটিতে ধরা পড়েছে কিউবা'র এক পাহাড়ী অঞ্চলের 'কালো কুমারী'র রহস্যময়তা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শহুরে-বোহেমিয়ান জীবন ছাপিয়ে রহস্যের আবহ মার্টনকে তখন আকর্ষণ করছিল।

এর পরের পর্বে মার্টন ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত। ক্রমে তিনি প্রবেশ করছেন তাঁর সাতাশ বছরের কেনটাকি-র গেথসামানি'তে মঠ-সন্ন্যাসীর জীবনে। এই চূড়ান্ত পর্বেই মার্টনকে পাওয়া যায়, তাঁর বিভিন্ন কর্মতৎপরতার সমাহারে। এই পর্বের জীবনে রয়েছে তাঁর নানান আত্ম-সংঘাত, আনন্দ, প্রশ্ন, কর্তাব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাঁর সটান উপস্থিতি। টমাস মার্টন এই সময়েই প্রাচ্য-জ্ঞানের নিবিড় সংস্পর্শে আসেন এবং জেন-প্রভু সুজুকি-র সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব তৈরী হয়। আর এরই সঙ্গে তিনি বিভিন্ন লেখা লিখে চলেছেন জাতিগত অখণ্ডতার পক্ষে, আর অবশ্যই পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতার হুঁশিয়ারি জানিয়ে।

পর্বে পর্বে এগিয়ে চলা টমাস মার্টনের জীবন যেন নিঃশব্দতা ও 'আত্ম-অভিযান'-এর প্রতিজ্ঞায় দীক্ষিত। সাধক জীবনেও মার্টন সমাজ-বিমুখ নন, বরঞ্চ এই সময়েই তাঁর সমাজ-কর্মী হিসেবে বিভিন্ন ক্রিয়াতৎপরতা ঝলসে ওঠে। কিন্তু এই এগিয়ে চলা, অবশ্যই একটি কেন্দ্রকে সাক্ষী রেখে। তাঁর অস্তিত্বের কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত 'নিঃশব্দ দর্শক', মার্টনের উল্লেখে 'ঈশ্বর', যাঁর সঙ্গে তাঁর সংহতির অন্বেষা। আবারও বলে রাখছি, সাহিত্য, সঙ্গীত বা সংস্কৃতির অন্য মাধ্যমের সঙ্গে মার্টনের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকলেও, 'থিয়েটার' শব্দটির উচ্চারণ তাঁর জীবনে প্রায় দেখিই না। অথচ, আধুনিক পৃথিবীর বড় বড় নাট্যবেত্তাদের বক্তব্যে বারে বারেই উচ্চারিত হয়েছে তাঁর জীবন-কাহিনী। জীবনের থিয়েটারের অন্যতম বড় শরিক হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন মার্টন।

থিয়েটারকে এখন বহির্জগতীয় এবং অন্তর্জগতীয়—এই যে দুই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হচ্ছে, সেই প্রেক্ষিতে মার্টন যে একজন মূল্যবান চরিত্র, তা বোধহয় অস্বীকার করা যায় না। তাঁর অন্বেষার পিছনে বাহারি গ্ল্যামারের চেয়ে সততারই মূলধন। যে হিসেবে কার্লোসে কাস্তানেদার ডন হুয়ানকে নিয়ে ডায়েরি-ধর্মী লেখাগুলিতে অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতই মুখ বাঁকাচ্ছেন, মার্টনকে কিন্তু তাঁরা হেলাফেলা করে মোটেই ছুঁড়ে দিতে পারছেন না। হয়তো মার্টনের নিজস্ব স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি কোনোরকম 'মার্টন-ইজম'-এর বিরুদ্ধে, তার সুবাদে কোনো তাত্ত্বিকই তাঁকে বিশেষ কোনো ছাঁচে ফেলতে পারবেন না।

উনিশশো আটষট্টি সালে ব্যাংককে এক দুর্ঘটনায় টমাস মার্টনের মৃত্যু হয়। পেন-ফুলনেস অব ইনার চেঞ্জ-এ বিশ্বাসী মার্টনকে নিয়ে এখন নানান্ আলোচনা চলছে পশ্চিমী জগৎ জুড়ে। নানান অপ্রত্যাশিত ঘটনা মার্টনের জীবন জুড়ে। মৃত্যুক্ষণও সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনার বাইরে নয়। বেশ কিছু বছর আগে ছাপ্পান্ন সালে নাওমি বার্টন একটি চিঠিতে মার্টনকে সেই ইঙ্গিতই দিয়েছিলেন :

I could'nt help noticing that it's your visitors who get locked out of the church, and your server who forget things, and your vestments that get caught in the

folding chair......I find your incredible adventures with nature and with publishing extremely endearing."

সেই অপ্রত্যাশিত বিস্ফোরণের সমাহারে মার্টনের জীবন এক মহা-থিয়েটারকেই হয়তো স্মরণ করাবে, যা নিছক বিলাস নয়, কেন্দ্রীয় বিশ্বাসের অন্বেষায় যা একেবারেই আপন-আদল পেয়েছে।

দিব্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

চলচ্চিত্র

এক বছরের বাংলা সিনেমা

উনিশ শ তিরাশি পেরিয়ে গেল। আজ চুরাশিতে দাঁড়িয়ে গত এক বছরের বাংলা সিনেমার দিকে নজর দিলে কোনোভাবেই আশাব্যঞ্জক কিছু চোখে পড়ে না। গত এক বছরে মোট ৩৬টি বাংলা ছবি মুক্তি পেয়েছে। তার মধ্যে গোটা পাঁচেক ছবি শিল্পমানসিকতার পরিচয় দেয়। ভালো ছবি বলতে যা বোঝায় ছবিগুলিকে সেই হিসেবে ভাবতে ভালো লাগে। বাকি ৩১টা ছবি আমাদের কোনো দিক থেকেই আকর্ষণ জাগায় না। এই ব্যাপারটা কেবল তিরাশির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। গত বিশ বছর ধরে আমরা প্রতি বছরের বাংলা সিনেমার খতিয়ান করে দেখেছি যে কোনো বছরেই উৎকৃষ্ট এবং বেশ পরিচ্ছন্ন সুস্থ ছবির সংখ্যা দশের বেশি হয় নি।

যে পাঁচটি ছবির কথা বললাম সেগুলি হল—উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর 'চোখ', বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'নিমঅন্নপূর্ণা', সন্দীপ রায়ের 'ফটিকচাঁদ', সত্যজিৎ রায়ের 'পিকু' এবং গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের 'নাগমতী'। বাকী ৩১টা ছবি হল : মুক্তির দিন, ছোট মা, সুপর্ণা, মৌচোর, দিন যায়, চেনা অচেনা, কাউকে বোলো না, যিনি রাম তিনিই কৃষ্ণ—একই দেহে রামকৃষ্ণ, এই ছিল মনে, কাজলা দিদি, উৎসর্গ, আগামীকাল, শৃংখল, রবি সোম, দুটি পাতা, সমাপ্তি, সংসারের ইতিকথা, নিশিভোর, জবানবন্দি, বনশ্রী বসু, অভিনয় নয়, অর্পিতা, ইন্দিরা, জ্যোৎস্না রাত্রি, তনয়া, মাতা আগমেশ্বরী, জীবন মরণ, বাতিঘর, প্রতিদান, অশ্লীলতার দায়ে এবং অগ্রদানী।

ঐ পাঁচটি ছবি ছাড়া বাকি সবকটা ছবিই শিল্পগত মানের দিক থেকে নিকৃষ্ট। তার মধ্যে নারায়ণ চক্রবর্তী পরিচালিত 'তনয়া' এবং সলিল সেনের 'মৌচোর'-এর বিষয়বস্তুতে অভিনবত্ব থাকলেও ভালো ছবি হিসেবে কোনোটাই দাঁড়ায় না। সলিলবাবু যে কারণে 'মৌচোর'-এর মতো কাহিনী নির্বাচন করেছিলেন তা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। যে মানুষদের জীবন জীবিকা নিয়ে ছবি করেছেন তার সম্পর্কে তাঁর সম্যক জ্ঞান না থাকায় ছবির কার্যকারণ, ঘটনাসংস্থান আর চরিত্রগুলোর আশা আকাঙ্ক্ষা আমাদের কাছে বিশ্বস্তভাবে ফুটে ওঠে না। ছবিটি অর্ধেক হতে না হতেই আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি। নারায়ণবাবু তনয়ায় নারীমুক্তির কথা বলতে চেয়েছিলেন। আজকের মেয়েদের স্বাধীন সত্তার বিকাশে চারপাশের অসুস্থ রাজনীতি কিভাবে প্রতিশ্রুতিময় মেয়েদের জীবন-জীবিকাকে নষ্ট করছে তার চেহারাটা সম্ভবত পরিচালককে আকর্ষণ করে থাকবে। তাই তিনি শংকরের লেখা ঐ নামের উপন্যাস আশ্রয় করে এক বিশেষ শ্রেণীর মেয়েদের নির্ভীকতা, স্বকীয়তা, স্বনির্ভরতার প্রচেষ্টাকে ধরতে, আর আজকের সমাজের শোষণটাকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সিনেমার বক্স-অফিসের সঙ্গে কোথাও হয়তো তাঁকে আপোস করতে হয়েছে, তাই তনয়া ভালো অভিনয়, ভালো ফোটোগ্রাফি, কিছু সংযত কাজকর্ম সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ভালো ছবির পর্যায়ে উতরোয় না।

স্বর্গত তরুণ পরিচালক ভাস্কর চৌধুরীর 'রবি সোম' সম্পর্কে কারুর কারুর বেশ কিছু প্রত্যাশা ছিল। তিনি পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের স্নাতক এবং অধ্যাপক ছিলেন। আমাদের মনে হয়েছিল যে তাঁর ছবিতে অন্তত বোধবুদ্ধিসম্পন্ন কিছু ব্যাপার দেখতে পাব। কিন্তু তিনি কমেডি ছবি করতে গিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেন নি। স্থূল কিছু রসিকতা দিয়ে ভালো কৌতুক-ছবি হয় না। তার জন্য চাই প্রকৃত হিউমার আর উইট। ছবিতে কোনোটাই নেই। দীপংকর দে অনেক চেষ্টা করেও ছবির সাদামাটা ব্যাপারগুলোকে সামাল দিতে পারেন নি। সুচিত্রাকন্যা মুনমুন সেনের রূপলাবণ্য সত্ত্বেও, সংবাদপত্রগুলোর জোর বিজ্ঞাপন সত্ত্বেও, মুনমুনের আড়ষ্ট বাংলা উচ্চারণ, নির্জীব অভিনয়, মূল কাহিনীর দারুণ দুর্বলতা, অর্থহীন দৃশ্যকল্পনা—সব মিলেমিশে ছবিটি বাংলা সিনেমায় ব্যর্থ সংযোজন। জয়ন্ত পুরকায়স্থ 'শুভ-রজনী' নামে একটা ছবি করেছিলেন। খুবই বাজে ছবি। গত বছর তিনি বানিয়েছেন 'মুক্তির দিন'—এটিও তাঁর ব্যর্থতার আর-একটা নিদর্শন। 'অগ্রদূত' গোষ্ঠী একসময় বেশ কয়েকটি ছবি করে সুনাম অর্জন করেছিলেন। বাঙালি দর্শক সেসব ছবি দেখেছে। সেই অগ্রদূত গোষ্ঠীর একমাত্র বিভূতি লাহা গোষ্ঠীর নাম দিয়ে এখনো ছবি করছেন। তিরাশিতে তাঁর তৈরি ছবি 'দিন যায়'। শিল্প ও বাণিজ্য—উভয়তই ছবিটা মার খেয়েছে। তপন সাহা নামে একজন নতুন পরিচালক গত বছরের শেষে 'আগামীকাল' নামে ছবিটি করেছেন। 'কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য'—এই বিজ্ঞাপন থাকা সত্ত্বেও ছবিতে ভিড় হয়নি। আজকাল 'এ'-মার্কা বাংলা ছবি করার একটা প্রবণতা মাঝে মধ্যে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তাতেও ফল হচ্ছে না। আদতে ছবির উপাদানে এত দুর্বলতা ছড়িয়ে থাকছে যে বাঙালি দর্শক কোনোরকম চুটকিতেই আর আকৃষ্ট হচ্ছেন না।

নিরঞ্জন দে মশাই কোনো ভাবেই সিনেমার লোক নন। অন্তত তাঁর কোনো ছবি থেকেই সে পরিচয় পাওয়া যায় না। ইতিমধ্যে তিনি বেশ কয়েকটা ভক্তিরসের ছবি তুলেছেন। কিন্তু ভক্তিই হোক আর শক্তিই হোক, ছবিতে কমিউনিকেট করার মতো কিছু ব্যাপার অন্তত থাকা চাই। তিরাশিতে তৈরি তাঁর ছবি 'যিনি রাম তিনিই কৃষ্ণ—একই দেহে রামকৃষ্ণ' দেখে আমাদের কেবল নিদারুণ দুঃখ আর লজ্জা হয় যে আশির দশকে পেঁৗছেও বাংলা সিনেমা কী দুঃসহ রুগ্ণতায় ভুগছে।

বেশ কিছু জনপ্রিয় ছবির পরিচালক বিজয় বসু গত বছর আমাদের উপহার দিয়েছেন 'সমাপ্তি'। ছবিটি চলে নি। ছবির বিষয়বস্তু বা অন্যান্য ক্ষেত্রে এমন একটিও উপকরণ নেই যা থেকে তাঁর দীর্ঘকালের চলচ্চিত্র-অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি ছবির কথা আমাদের এখনো মনে আছে। 'কিছুক্ষণ', 'অতল জলের আহ্বান', 'ধন্যি মেয়ে', 'অজস্র ধন্যবাদ'—এইসব মিষ্টি এবং ছিমছাম মজার ছবি করে তিনি বাংলা সিনেমায় অন্য ধরনের স্বাদ এনেছিলেন। কিন্তু গত বছরে তৈরি তাঁর দুটো ছবি 'অর্পিতা' এবং 'সংসারের ইতিকথা' দেখে আমাদের মনে হয়েছে তাঁর কর্মদক্ষতা ফুরিয়ে এসেছে। অপর্ণা সেনের অভিনয়ের জোর থাকলেও 'অর্পিতা'র কাহিনীবিন্যাস আমাদের ক্লান্ত করে। 'সংসারের ইতিকথা'ও তথৈবচ। প্রতি বছর এইরকম ডজনখানেক ছবি তৈরি হচ্ছে টালিগঞ্জের স্টুডিওপাড়ায়। কেবল সংখ্যায় সিনেমার তালিকা বড়ো হচ্ছে। বোধ, বুদ্ধি, চেতনা আর শিল্পাঙ্গিকে কোথাও কোনো সংযোজন নেই।

প্রখ্যাত ক্যামেরাম্যান দীনেন গুপ্ত মশাই পরিচালক হবার পর থেকে প্রায় এক ডজনের বেশি ছবি বানিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু একমাত্র 'নোতুন পাতা' ছবিটি ছাড়া তাঁর কোনো ছবি দর্শকসাধারণ নেয় নি। 'নোতুন পাতা' তাঁর পরিচালক হিসেবে প্রথম চিত্রপ্রয়াস। সত্যজিতের 'তিন কন্যা'র 'সমাপ্তি' ছবির এক দুর্বল অনুকরণে তৈরি এ ছবিতে কিছু ভালো অভিনয়, মোটামুটি ভালো ফোটোগ্রাফি মিলিয়ে একটা ব্যাপার তৈরি হয়েছিল যার ফলে ছবিটা ব্যবসায়িকভাবে উতরে যায়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তারপর থেকে অজস্র ছবিতে তিনি ব্যর্থ। গত বছর তিনি তৈরি করেন 'ইন্দিরা'। বঙ্কিমচন্দ্রের একটা সাধারণ কাহিনী অবলম্বন করে তিনি নাটকীয়তা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। সাহিত্যাশ্রয়ী চলচ্চিত্রকে উন্নত মানের হতে হলে পরিচালককে কেবল ক্যামেরা চালানো শিখলেই হয় না—সাহিত্যবোধ থাকাটা তাঁর একান্ত প্রয়োজন। সেই সঙ্গে সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণে কোন্‌টি কতটুকু রাখা দরকার সেই পরিমিতিবোধ অপরিহার্য। পুরোনো কাহিনী নিয়ে ছবি হবে না, এমন নয়। কিন্তু সেই বিষয়কে এমনভাবে পরিবেশন করতে হবে যে আমাদের ভালো লাগার মতো একটা ব্যাপার খাড়া হয়ে ওঠে। এর আগে তিনি 'রজনী' আর 'দেবী চৌধুরানী' পরিচালনা করেছেন। ছবিতে কোথাও বঙ্কিমচন্দ্র নেই, সিনেমার ব্যাকরণটিও নেই। আমরা বহু বিদেশী ছবিতে প্রাচীন কাহিনী, গাথাকাব্য, ঐতিহাসিক উপন্যাসের অনবদ্য রূপ প্রত্যক্ষ করেছি। সিনেমার ভাষায় যাকে 'পিরীয়ড পীস' বলে সেই বিষয়টি আমাদের দেশের নিরানব্বইজন পরিচালক জানেন না। আর জানেন না বলেই অতীত কাহিনী বা উপাখ্যান নিয়ে ছবি করতে গিয়ে তাঁদের বাস্তবতাবোধ থাকে না। প্রায় ক্ষেত্রেই পরিমিতিবোধ হারিয়ে ফেলেন।

পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এরই মধ্যে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশ কয়েকটি গল্প-উপন্যাস নিয়ে ছবি করেছেন। গত বছরে তাঁর তৈরি রঙিন ছবি 'অগ্রদানী' আমাদের প্রচণ্ড পীড়া দিয়েছে। তিনি লেখকের আত্মীয় হন। তাই গল্পসংগ্রহে তাঁকে কোনো পরিশ্রম করতে হয় না। কিন্তু বিপদ একটাই—তারাশংকরের রচনার যে ফোর্স বা আন্তর শক্তি, পরিচালক তারই হদিশ রাখেন না। তাই 'অগ্রদানী'র মতো অসামান্য গল্পও সিনেমার পর্দায় মাটি হয়ে যায়। অগ্রদানী ব্রাহ্মণের ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের উৎকট মেক-আপ এবং মাত্রাতিরিক্ত আবেগ সৃষ্টির চেষ্টা আমাদের আদিকালের মেলোড্রামার কাছে নিয়ে যায়।

গত বছরের শেষে মুক্তি পেলেও সুখেন দাসের 'জীবন মরণ' কলকাতা এবং শহরতলির বেশ কয়েকটা হলে রমরমিয়ে চলছিল। তাই অনেকেই বলছেন বাংলা সিনেমায় সুখেন দাসের মতো পরিচালক দরকার। ভাবুন আমাদের কী দুরবস্থা। কোনো মার্জিত রুচির শিক্ষিত, বোধবুদ্ধিসম্পন্ন দর্শকের পক্ষে সুখেনবাবুর ছবি আদ্যন্ত বসে দেখা বেশ দুরূহ। অথচ তাঁর ছবি চলে। রহস্যটা কী? বাইরে আমরা বাঙালিরা যতই সফিস্টিকেশন আর বিদ্যাবুদ্ধির কেতা জাহির করি না কেন, সিনেমা ব্যাপারটা এখনো আমাদের দেশে প্রধানত আমোদের ব্যাপার। সিনেমাই আমাদের দেশে একমাত্র শিল্পমাধ্যম যেখানে মাধ্যম-চর্চা, অধ্যয়ন বা ন্যূনতম শিক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই। কোনোরকম অনুশীলন এবং অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকেই এ মাধ্যম সম্পর্কে যে-কেউ যা-খুশি বলতে পারেন। এটা তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকার। বিশ্বের আর কোথাও শিল্প নিয়ে এত অশিক্ষা নেই। "আমি সত্যজিৎ হতে চাই না, আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা বুঝি না, আমি ছবি করি সহজ সরল সাধারণ মানুষের জন্য।"—সুখেন দাসের এই কথায় অনেকে তাঁর সৎ স্বীকারোক্তিতে পুলকিত হয়েছেন।

আমরা কেবল একটা কথাই বলতে চাই—সাধারণ দর্শকের জন্য ছবি করা মানেই কিছু স্থূল আবেগ, আদ্যি-কালের ধ্যান-ধারণা, জোলো সেন্টিমেন্ট, অতি-নাটকীয়তা, অবাস্তবতা ছবির বিষয়ীভূত করলেই তা মানুষে গ্রহণ করবে, এমন ধারণা সুখেন দাস কোথায় পেলেন জানি না। তবে হ্যাঁ, তিনি একটা ব্যাপারে খুব সাকসেসফুল। তিনি তাঁর ছবিতে ওজন করে কান্না-হাসি, প্রেম-ব্যর্থতা, দুঃখ-কষ্ট আর বস্তাপচা ভাবালুতাকে দর্শকদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারেন। না হলে তাঁর ছবি রজত জয়ন্তী সপ্তাহ পার করে কী করে। সাদামাটা বাংলা ছবির মফস্বলে একটা নির্দিষ্ট বাজার আছে। তাই শহরে না চললেও মফস্বলের দর্শকরা এখনো সেই পঞ্চাশ বছর আগের মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরে আছেন। তথাকথিত বাংলা ছবির দিকে তাকালে মনে

হয় বাংলাদেশ এবং বাঙালি সমাজ সম্ভবত শরৎচন্দ্রের পরিমণ্ডলের বাইরে আসতে পারে নি এখনো। এখনো সতীত্ব তথা নারীত্ব ব্যাপারটা বাংলা সিনেমায় উৎকৃষ্ট উপাদান। দাদার ত্যাগ, রাইচরণের মতো স্নেহপ্রবণ চাকর, মামা-মামীর পীড়ন, যৌথ পরিবারের সেই পুরোনো একঘেয়ে আদর্শ-বাণী ইত্যাদি আরো অসংখ্য ব্যাপার গত ষাট বছরের বেশি বাংলা সিনেমাকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। ১৯১৯ সালে প্রথম বাংলা নির্বাক ছবি তৈরি হয়েছিল 'বিল্বমঙ্গল'। ১৯৮৩-তে আমরা দেখছি সুখেন দাসের 'জীবন মরণ'। কোথাও কোনো তফাত নেই।

আমরা বাঙালি। রাগ-দুঃখ-অভিমান সত্ত্বেও বাংলা ছবি আমাদের দেখতেই হয়। কিন্তু আমরা দেখব কোন্ ছবিটা? একদিকে সুখেন দাসের ছবি, অন্যদিকে কাউকে বোলো না, দুটি পাতা, এই ছিল মনে, চেনা অচেনা, ছোট মা, সুপর্ণা, শৃঙ্খল, মাতা আগমেশ্বরী, বাতিঘর, জবানবন্দি, বনশ্রী বসু আর নিশিভোর-মার্কা ছবি। সেই একই গপ্পো এদিক ওদিক করে, একই ফর্মুলায় আমাদের পরিবেশন করা হচ্ছে। কত লক্ষ ভোর পেরিয়ে এসেও নিশিভোরের ঘোর আর আমাদের কাটছে না।

প্রতি বছর গণ্ডায় গণ্ডায় আর্ট ফিল্ম্ হোক এমন প্রত্যাশা অসম্ভব। দুনিয়ার কোনো প্রান্তেই সিনেমায় তা হচ্ছে না। আসলে মোটামুটিভাবে একটা সাধারণ ভালো ছবি করার জন্য যেগুলো দরকার সেইরকম ভালো গল্প নির্বাচন, সুগ্রথিত চিত্রনাট্যরচনা, কিছু বাস্তবসম্মত সুন্দর অভিনয়, জীবনধর্মী সংলাপ ইত্যাদি ব্যাপারগুলো সম্পর্কে আমাদের পরিচালকেরা একেবারেই চিন্তিত নন। পুনার ফিল্ম ইনস্টিটিউটের সমাবর্তনে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায় আজকের বেশিরভাগ পরিচালকদের উদ্দেশে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন—'হি ডাজ নাথিং, বিকজ হি নোজ নাথিং।' সত্যি, কী লজ্জার কথা। চলচ্চিত্র মাধ্যমটি যে-কেবল নাচগানে ভরপুর একটা লোভনীয় প্ল্যাটফর্ম নয়, এতে যে আধুনিক মানবসভ্যতার উত্থান পতন থেকে শুরু করে ব্যক্তিবিশেষের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিল মনস্তাত্ত্বিক দিকের উন্মোচন সম্ভব—একথা কজন পরিচালক ভেবে দেখেন?

বাংলা সিনেমার প্রবাহিত দৃশ্যক্রমে আমাদের আজকের বাঙালী সমাজের প্রকৃত চেহারাটা কখনো বিশ্বস্তভাবে ধরা দেয় না। অধিকাংশ বাংলা ছবিতে সিনেমার আসল ভাষা নেই। জীবনের ভাষার কথা তো ছেড়েই দিলাম। তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে শতকরা নিরানব্বইটা বাংলা ছবি বাঙালী দর্শকদের প্রবঞ্চিত করে চলেছে।

সমস্যা আর সংকটের দোহাই দিয়ে এইসব চিত্রপরিচালকরা তাঁদের অক্ষমতাকে গোপন করতে চাইছেন। কিন্তু আপনারা একবার ভেবে দেখুন তো—গত বছরের ছত্রিশটা ছবির কয়েকটাকে বাদ দিলে, কটা ছবির মধ্যে জীবনধর্মী সংলাপ পেয়েছি, বাস্তব-অনুগ অভিনয় দেখেছি, পারিপার্শ্বিক সমাজ তথা জীবনের বস্তুধর্মী দৃশ্য কোথাও আছে? নড়বড়ে চিত্রনাট্য, দুর্বল অভিনয়, চূড়ান্ত মেলোড্রামা, সাদামাটা ফোটোগ্রাফি—এসবের জন্য কি ইনডাসট্রির গলদ খুঁজে কোনো লাভ আছে! চলচ্চিত্রের প্রধান পুরুষ প্রথমাবধি হলেন পরিচালক। অসংখ্য মানুষকে নিয়ে একসঙ্গে কাজ করলেও শেষ পর্যন্ত একটা ছবির ভালো মন্দ নির্ভর করে পরিচালকের মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তাচেতনার ওপর। তিনি হলেন স্রষ্টা। তাঁর যোগ্যতা থাকলে তিনি সকলের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেবেন।

সিনেমা-শিল্পটা যাঁদের কাছে জীবন এবং জীবিকা, তেমন মানুষের সংখ্যা আমাদের চলচ্চিত্রশিল্পে খুব কম। যাঁদের সাধ আছে, ক্ষমতা আছে, তাঁদের যোগাযোগ নেই, লোকধরার সুযোগ নেই। তাই বছরের পর বছর আমরা জ্যোৎস্না রাত্রি, এই ছিল মনে আর কাজলা দিদি-র মতো ছবি দেখছি।

এক সময় উত্তমকুমারের উপস্থিতি আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পুনঃপুন নেপথ্য কণ্ঠের সহযোগে বাংলা ছবি সাড়ম্বরে বাজার গরম করে রাখত। হেমন্তবাবু বয়সের ভারে অনেকটা স্তিমিত। উত্তমহীন বাংলা ছবিকে কেবল স্টাইলাইজড অভিনয় আর স্মার্টনেসে টেনে নিয়ে যাবে এমন অভিনেতাও নেই।

একদল ইনডাস্ট্রির ভেতরকার সমস্যার উদাহরণ দেন, আর-একদল নীতিবাগীশ আছেন তাঁরা বলেন অশ্লীল হিন্দি ছবি বাঙালি দর্শকের চরিত্রহনন করছে। বাঙালিরা আর বাংলা ছবি দেখেন না। কিন্তু গত বছরে পুরোনো তিনটে ছবি—'পথে হল দেরী', 'কুহক' আর 'সূর্যতপা'—অমিতাভ বচ্চন, বিনোদ খান্না, রেখা-রাখী, আর জীনৎ আমন অধ্যুষিত রঙচঙে হিন্দি ছবির পাশে সমান তালে ৬৩ দিন ধরে চলল কিভাবে?

কলকাতার অধিকাংশ হলে আজকাল হিন্দি ছবি ঢুকে পড়েছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। রাধা, পূর্ণ, প্রাচী, মিনার, বিজলী, ছবিঘর, রূপবাণী, অরুণা, ভারতী, ইন্দিরা, উজ্জ্বলা—হয়তো আরো এইরকম দু-একটা হলে আজও বাংলা ছবি নিয়মিত দেখানো হয়। তার মধ্যে বিজলী গত কয়েক মাস ধরে বন্ধ রয়েছে। আরো কয়েকটা হলে সাময়িক ধর্মঘট চলেছে। তবু আমরা গত বছরে ৩৬টা ছবি পেয়েছি। কিন্তু বছর বছর যদি আমরা নিকৃষ্ট ছবির তালিকা বাড়িয়ে যাই তবে এ হলগুলোও বেহাত হয়ে যাবে। তখন শশী কাপুর, বিনোদ মেহেরা, শ্রীদেবী, রতি অগ্নিহোত্রী কিংবা নীতু সিং-ধর্মেন্দ্র-হেমা মালিনীর অলীক-অবাস্তব কাণ্ডকারখানা গলাধঃকরণ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না।

কলকাতার সাহেবপাড়ায় আজও বেশ কিছু মার্কিন আর ব্রিটিশ ছবি মুক্তি পায়। সেইসঙ্গে এন-এফ-ডি-সি-র কল্যাণে কিছু ইওরোপীয় অন্যান্য দেশের দু-একটা ছবিও আমরা দেখার সুযোগ পাচ্ছি। দুর্দান্ত বা অসাধারণ কিছু ছবি সবক্ষেত্রে না পেলেও ঐসব ছবিতে মোটামুটি বুদ্ধির ছাপ থাকে। একটা পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে ছবি করেও যে প্রভূত অর্থ লাভ করা যায় তার প্রমাণ ঐসব ছবিগুলো। আসলে বাংলা ছবি করতে কোনোরকম বিদ্যাবুদ্ধি বা শিল্পপ্রযত্নের প্রশ্ন নেই। যাহোক করে একটা কিছু খাড়া করতে পারলেই হল। যে বিষয় নিয়ে পরিচালক ছবি করছেন সে বিষয় সম্পর্কে তাঁর কোনো অনুসন্ধিৎসা নেই, কোনো প্রশ্ন নেই। ফলত, দর্শকদের বিভ্রান্ত করা ছাড়া সেসব ছবি দিয়ে অন্য কিছু হয় না।

নারায়ণ সান্যালের জনপ্রিয় রচনা 'অশ্লীলতার দায়ে' অবলম্বন করে নাট্যকার-অভিনেতা উমানাথ ভট্টাচার্য যে ছবিটি করলেন তাতে কিছু দর্শক রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে হয়তো বাংলা ছবিতে এতদিনে একটা দারুণ ব্যাপার দেখা যাবে। তাঁরাও নিরাশ হয়েছেন। লোকমুখেই একটা ছবির জনপ্রিয়তা ক্রমশ দু সপ্তাহ থেকে রজত জয়ন্তী সপ্তাহে পৌঁছায়। কেননা আমাদের প্রতিষ্ঠিত দৈনিক সংবাদপত্রগুলোর গতানুগতিক ছকে বাঁধা সমালোচনা আর পেশাগত মন্তব্য পড়ে এখন আর কেউ হলে ভিড় করেন না। ঐ সমালোচকদের কলমে ছবির ভালো মন্দ কিভাবে ওঠা-নামা করে সে রহস্যটা তাঁরা জেনে ফেলেছেন।

গৌতম চট্টোপাধ্যায় যখন 'নাগমতী' করেন তখন এটুকু বোঝা যায় যে প্রথাসিদ্ধ বাংলা সিনেমার স্রোতে গা ভাসানোর কোনোরকম ইচ্ছেই তাঁর নেই। নাহলে তিনি বাজার-চলতি কোনো কাহিনী নির্বাচন করতে পারতেন। ছবিটিকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রদান করে কোনো বাড়তি মূল্য দেওয়া না হলেও যোগ্য প্রচেষ্টাকে সম্মান জানানো হয়েছে। সেটুকুও যথেষ্ট। তরুণ চলচ্চিত্রকার সন্দীপ রায় পিতার কাহিনী আর চিত্রনাট্য আশ্রয় করে 'ফটিকচাঁদ' করেছেন। এটি কোনো দুর্দান্ত শিল্পোন্নত ছবি না হলেও আর-দশটা বাংলা সিনেমা থেকে অনেক স্বতন্ত্র। সিনেমার ভাষা আর ব্যাকরণ এবং শিল্পিত রূপটা যে তিনি করায়ত্ত করেছেন সেটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর 'চোখ' বহু-আলোচিত এবং বহুপ্রশংসিত। ছবিটিতে পরিচালকের চলচ্চিত্রবোধ আজকের সময়ের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতটিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। তিনি একটা পজিটিভ বক্তব্য রাখতে পেরেছেন। আঙ্গিকদক্ষতায়ও ছবিটি স্বকীয়তায় চিহ্নিত। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'নিম-অন্নপূর্ণা' ব্যবসাগতভাবে চলে নি। কিন্তু দুরূহ রচনা চলচ্চিত্রায়নে সৎ সাহস এবং বেশ কিছুটা যোগ্যতায় ছবিটি নিয়ে ভাবতে ইচ্ছে করে। বুদ্ধদেবের 'গৃহযুদ্ধ' ছবিটা দেখার সুযোগ পেয়েছি, ছবিটা এখন মুক্তিও পেয়েছে। ছবিটায় বুদ্ধদেব অন্তত এটুকু প্রমাণ করেছেন যে তিনি প্রধানুগ বাঙালি পরিচালকদের দলের মানুষ নন। এক ভিন্নতর প্রতিশ্রুতি নিয়ে সিনেমাজগতে এসেছেন। এ আলোচনাপ্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায় ও তাঁর অসাধারণ সৃষ্টি আটাশ মিনিটের 'পিকু' ছবিটা আলোচনা করলাম না। তাতে পরোক্ষে তাঁকে ছোটো করাই হবে। আমাদের প্রায় অধিকাংশ পরিচালকেরাই বিদ্যাবুদ্ধি, যোগ্যতা এবং সামগ্রিক শিল্পচিন্তায় তাঁর থেকে একশ মাইল দূরে অবস্থান করছেন।

ইদানীং কিছু কিছু রঙীন বাংলা ছবি তৈরি হচ্ছে, তবু ছবি দেখে দর্শকদের মন ভরছে না। যাঁরা পুরোনো যন্ত্রপাতি আর পুরোনো সমস্যার কথা বলেন, তাঁরা নিজেরাই অবগত আছেন যে টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়ায় ভাঙা জিনিসপত্র আর রুগ্ণ ব্যবস্থার মধ্যেই দু-চারজন আন্তর্জাতিক মানের অনেক বাংলা ছবি করেছেন। আসলে যাঁরা এ শিল্পে করে খাচ্ছেন তাঁদের বেশির ভাগই সিনেমার আত্মার আত্মীয় নন। টাকা আর যোগাযোগ থাকলেই এ লাইনে কিছু একটা করা যায়, তাই যাঁদের মনোহারির দোকান দেওয়া উচিত ছিল তাঁরাও পরিচালক হয়ে ঘাঁটি আগলাবার চেষ্টা করছেন। নতুন প্রতিভাবান তরুণদের ভালো কাজকর্মে এঁরা যেমন ঈর্ষাকাতর, তেমনি নিজেদের আসন টলমল ভেবে সর্বদা ভয়ে সংকুচিত।

'সুপার গানে ভরা সাড়া জাগানো ছবি, দুরন্ত অভিনয়—দুর্বার গতি', 'দারুণ প্রেমের ছবি', সব বয়সের, সব শ্রেণীর দর্শকদের জন্য মিষ্টি ছবি', 'সবার সাথে দেখার মতো মনমাতানো ছবি'—এতসব বিজ্ঞাপন দিয়েও বাংলা ছবির মৃতপ্রায় শরীরে শক্তি সঞ্চার করা যাচ্ছে না। কেউ কেউ মন্তব্য করেছিলেন, বম্বে থেকে শক্তি সামন্তর মতো দু-চারজন সাকসেসফুল পরিচালককে আনিয়ে কলকাতায় ছবি বানালে বাংলা ছবি আগের নিউ থিয়েটার্সের গৌরব ফিরে পাবে। একেবারে অসম্ভব কথা। বাংলা ছবির জন্য বাইরে থেকে কাউকে আনার দরকার নেই। প্রকৃত ভালো বাংলা ছবি করতে পারলে ইনডাস্ট্রি আপনিই ফুলে ফেঁপে উঠবে। অনেক দিন আগে বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকার সুইডেনের বার্গম্যান আত্মকথায় বলেছিলেন: টু মেক ফিল্মস ইজ ফর মি এ ন্যাচারাল নেসেসিটি, এ নীড সিমিলার টু হাঙ্গার অ্যান্ড থার্স্ট। বাঙালি পরিচালকরা এসব কথা শুনলে চমকে ওঠেন। আসলে এদেশে এখনো সিনেমা মানে কিছু পয়সার বিনিময়ে কয়েক ঘণ্টার জন্য ফুর্তি আর প্রমোদ কিনে নেওয়া। নিজের ক্ষুধা আর তৃষ্ণার মতো একটা তাড়না নিয়ে আমাদের কেউ সিনেমায় আসেন না। তাই বাংলা সিনেমা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে। নিকৃষ্ট বাংলা ছবির প্রতি অহেতুক সহানুভূতি দেখিয়ে বাঙালিপ্রীতির কোনো কারণ দেখি না।

সোমেন ঘোষ

চিত্রকলা

দু-চার কথা

ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল হলে সম্প্রতি আয়োজিত প্রদর্শনী 'চৌরঙ্গী—অতীত ও বর্তমান' আমাকে ভীষণভাবে আপ্লুত করে॥ প্রায় সত্তর হাজার মানুষ কী নিদারুণ আগ্রহে, মমতায় আমার ছবির সঙ্গে ব্রিটিশ চিত্রকরদের অঙ্কিত ছবি মিলিয়ে-মিলিয়ে দেখে রস গ্রহণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বুঝতে চেষ্টা করেছেন কলকাতা কতটা বদলেছে—কতটা বদলেছে রাস্তাঘাট, মানুষজন, জীবনযাত্রা, আবহ কিংবা প্রেক্ষাপট। দর্শকদের মধ্য থেকে কেউ কেউ আমাকে উৎসাহ দিয়ে-

ছেন, আলোচনা করেছেন, প্রত্যুত্তরে আমার কথাও তাঁদের জানিয়েছি। আলাপ-আলোচনায় মনে হয়েছে মানব-জীবনের অনুভূতি কত না তীব্র। নানা-স্তরের মানুষ আমার লাইন-ড্রয়িং স্কেচ দেখে উৎফুল্ল হয়েছেন। আশ্চর্য হয়েছেন—কত্তো বড়ো চৌরঙ্গী লাইন-ড্রয়িং-বন্দী হয়ে কি ভাবে ধরা দিয়েছে চোখের সামনে এক নজরে। আপনার প্রশ্নের মতো আমারও মনে হয়েছে—পশ্চিমী রীতির ছবি আজও কেন জনপ্রিয় হল না। বোধ করি, স্রেফ দুর্বোধ্যতার জন্য। ছবি দেখে সাধারণ মানুষ যদি অভিভূত না হন, তবে কার জন্য ছবি করা, কিজন্য ছবি করা! যতদিন না ড্রয়িংরুম-মনস্কতা আমাদের কাটবে, ততদিন আমাদের এদেশে শিল্পকলা একটি বিশেষ সমাজের জন্যই পসরা হয়ে থাকবে। অত্যন্ত সুখের লক্ষণ—আজকের সমকালীন ভারতবর্ষের শিল্পকলাজগতে এই বোধ অনুভূত হতে শুরু করেছে। তাই শিল্পকলা এখন অনেকটা এগিয়ে আসতে শুরু করেছে সাধারণ মানুষের কাছে—সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে। আর তা না হলে তো মুক্তি নেই আমাদের, শিল্পের!

কথায় কথা এসে' যায়। এক ধরনের শিল্পী আছেন, তাঁরা আঁকছেন পুরস্কারের প্রত্যাশায়। যে ধরনের ছবি এবার পুরস্কৃত হল, পরের বছর তারই অনুকরণে চিত্রকলা রকমফের হয়ে ক্যানভাসে ফুটে উঠল। ভাবনা-চিন্তা সব যেন একই গন্ডির মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। এই অবস্থাটা বেশি দেখা যায় দিল্লী কলামন্ডলে। স্বভাবতই, সমঝদার দর্শকেরা হতাশ হন, বিরক্তি আসে। ফলে, চিত্রকলা জীবন থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। সৎ বুদ্ধিজীবীরা পিছিয়ে যাচ্ছেন। নকল জিনিস নিয়ে লাফালাফি চলছে। মাঝে হঠাৎ হুজুগ উঠল ডুডলিংস-এর ছবির, যেগুলো ড্রয়িং বলে প্রদর্শিত হল। আকস্মিকভাবে নানা ইমেজ বের হয়ে এল কলমের খোঁচায়। শিল্পীর মানসিক পরিপ্রেক্ষিতের উপর ছবি যেন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করার ছবির রূপান্তর। নগ্ন নারীদেহের পাশে বাজপাখি বা চামচিকে বা গাছ অথবা প্রজাপতি কিংবা দাঁত-বের-করা কুকুরের প্রতিচ্ছবি! কী তার অর্থ বোধগম্য হয় না। নাকি স্টানট দিতে পারলেই তৈরি হয় আহামরি শিল্পের ভাষা! তো এইসব ছবি দিয়ে, অর্থাৎ, শিল্পীর গভীর-গোপন অথবা একান্ত ব্যক্তিগত মননের ছবি দিয়ে, সাধারণ মানুষকে আমি-আপনি কিভাবে যোগাযোগের সূত্রটা ধরিয়ে দেব? শিল্পাচার্য নন্দলাল তো হাজার হাজার স্কেচ করেছেন, বিষয়বস্তু তুলে ধরেছেন—সবাই তা বুঝতে পেরেছেন সহজে। এতে করেই নন্দলাল এক চলমান ইতিহাস তথা বিশাল এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন। সে কি শুধু অসাধারণ মানুষের দৌলতে? না, সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন বলেই!

কথাটা জিজ্ঞেস না করলেও বলতাম, আমি নিজেকে গর্বিত মনে করি— জয়নাল আবেদিন সাহেবের অত্যন্ত কাছে আসার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে। এবং ঘনিষ্ট হয়েছিলাম। তাঁর সান্নিধ্যে এসে অযাচিত মূল্যবান শিক্ষা লাভ করেছিলাম। যে শিক্ষক ছাত্রদের সামনে প্রয়োজনীয় বক্তব্য তুলে ধরতে দ্বিধা বোধ করেন না, এগিয়ে দিতে পারেন, আজকের দিনে সেইসব শিল্পীশিক্ষকমহাশয়দের বড়োই অভাব। আমি চিরকাল শিক্ষকদের মাথার উপর স্থান দিয়েছি। ছাত্ররা যদি শিক্ষকদের উপযুক্ত মর্যাদা দেন তো তাঁরাই মর্যাদা লাভ করবেন স্ববৃত্তিতে। আমার শিক্ষকতা-জীবন তৃপ্ত হয়েছে—প্রায় তিরিশ জন ছাত্র চিত্রকলায় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এগিয়ে আসছে এক-কদম দু-কদম করে। আলাদা করে দু-একজন সম্পর্কে কিছু বলে অথবা ছাত্রদের উৎসাহিত করে ছবি আঁকায় কাউকে খাটো করতে চাই নে।

স্ব-পেশায় নিযুক্ত কোনো শিল্পী সম্পর্কে কিছু বলতে অস্বস্তি হয়। আগেই বলেছি, আদর্শের তাগিদে মাথা নত করি নি। শহীদ হবার পথ বেছে নিয়েছি। এর মূল্যও দিতে হয়েছে অনেক। কিন্তু ইদানীং মকবুল ফিদা হুসেন অনেক লম্বাচওড়া কথা বলে যাচ্ছেন। যথার্থ শিল্পীর উচিত এসবের প্রতিবাদ করা। বস্তুত, হুসেন সাহেব ছবি আঁকা শুরু করেন সিনেমার ব্যানার ছবি পোস্টার এঁকে। চিত্রাভিনেত্রী নার্গিস অথবা নায়ক রাজকাপুরকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে খাড়া করে আঁকলে জনগণ ভালোভাবে নেবে, সেই ভেবেচিন্তে মাপজোক করে ছবি আঁকতেন। তার জের আজো চলেছে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে সময়োপযোগী চিত্রকলা বাজারে ছেড়ে। আর-একটা কথা; যখন মানুষ ব্যক্তিত্ব হারায়, তখন অন্যের কাঁধে ভর করে উঠবার চেষ্টা করে। হুসেন তাই তাঁর প্রদর্শনীতে ভালো নবীন শিল্পীদের বেছে নিয়ে ইদানীং প্রদর্শনী করেন। আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হতে পারলাম না যে এটা একটা বাহবা পাবার মতো কাজ হতে পারে! চিরনমস্য শিল্পী এবং শিল্পকলার প্রতি হুসেনের অর্বাচীন উক্তির বিরুদ্ধে কোনো বলিষ্ঠ বক্তব্য শিল্পীমহল থেকে উচ্চারিত হয়েছে বলে আমার শোনা বা জানা নেই। এর জন্যও অবাক হচ্ছি।

আগেই বলেছি, তরুণ শিল্পীদের কাজকর্মের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সব সময় সম্ভব হচ্ছে না। কলকাতার তরুণদের সম্পর্কেও আমার একই কথা। পত্রিকায় রিভিউ পড়ে পরের মুখে ঝাল খেতে রাজী নই। প্রসঙ্গত, দু-চার কথা এখানে এসে যাচ্ছে এই রিভিউ বা সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে।

আমার সাম্প্রতিক প্রদর্শনী 'চৌরঙ্গী—অতীত ও বর্তমান' দেখে এক শখের সমালোচক-শিল্পী বললেন, এই সিরিজের ছবিগুলি নাকি ফেল্ট পেনে আঁকা। কালি-কলমের বিষয়টি তিনি নিজে শিল্পী হয়েও ধরতে পারলেন না, অথচ তাঁরা শিল্পকলা-সাহিত্যের পরিবেশের মধ্য দিয়ে মানুষ হয়েছেন। শিল্পকলা বিভাগে শিক্ষা-টিক্ষাও দিচ্ছেন।

এইরকম অবিশ্বাস্য ভুল কী করে যে করেন, ভেবে পাই না। ইচ্ছাকৃত, নাকি অন্য কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকে! আরও লেখা হল—দূরের থেকে প্যানোরমা ভিউয়ের চৌরঙ্গী দেখলে এক ইমপ্রেশন জাগে, আর কাছে এলে মনে হয় বাড়িগুলো পড়ে যাচ্ছে। তাজ্জব পর্যবেক্ষণশক্তি এবং কল্পনার বিচিত্র গতি। এইসব কথাবার্তা শুনলে স্বাভাবিক ভাবে মনে হতে পারে—সমালোচক এই ধরনের ছবি কোনোদিন দেখেন নি। তাই নিজেই কাত হয়ে গেছেন। দোষই বা কী! কালি-কলমে প্যানোরমার কাজ কলকাতায় অন্য কাউকে আগে করতে দেখেন নি হয়তো। আর-একজন শৌখিন সমালোচক বললেন—আঁকা ছবিগুলি নাকি ব্রোমাইড পেপারে এনলার্জ করা হয়েছে! হাসব কি কাঁদব বুঝতে পারি না। অত বড়ো বড়ো ব্রোমাইড পেপার কেনার পয়সা আমার নেই। এক আপনিই বললেন, দর্শকের হাতের ছোঁয়া বাঁচাবার জন্যই বোধ হয় প্ল্যাস্টিক পেপার দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন ছবিগুলি! আমার কথা হল, শৌখিন সমালোচকদের প্রয়োজন কিছু লেখার আগে ভালো করে বুঝে, জেনে নেওয়া। আর-একটা কথা—ঈর্ষা দিয়ে মহান কিছু সৃষ্টি করা অসম্ভব।

শিল্পীর সঠিক দায়িত্ব হচ্ছে, সর্বপ্রথম সততা, আন্তরিকতা এবং মৌলিক কার্যক্রম। সমকালীন আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েও নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখা একটি জরুরি বিষয়, প্রতিটি শিল্পীর পক্ষে। শিল্পী তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এমনভাবে তুলে ধরবেন সাধারণ মানুষের কাছে যাতে তাঁর স্বকীয়তা বজায় থাকে, আবার সাধারণের কাছাকাছিও নিজেকে রাখা যায় পরিপূর্ণ মুক্ত মানসিকতায়। দুর্বোধ্যতা একটি বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য বজায় রাখা সহজ। কিন্তু সহজ সরল ভাবে কথা বলা অনেক বেশি কঠিন।

Art should be communicative rather than personal.

যখন ইউরোপে ল্যান্ডস্কেপ পার্কের রেলিংএর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যখন ইতালিয়ানরা শহরের ছবি আঁকছিলেন স্টাইলাইজড় রেইনস, মাইথোলজিক্যাল কাম্প্রিজ—সূর্যালোকের বাতাবরণে, তখন ইংল্যান্ডে কনস্টেবল এবং তাঁর সমসাময়িক শিল্পী ওল্ডক্রম প্রধানুযায়ী ল্যান্ডস্কেপ আঁকার জগতে নিজেদের ব্যক্ত করেন স্বকীয় ভঙ্গিমায়, বৈপ্লবিক চেতনায়। ইংল্যান্ড প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতুলনীয়। বৃষ্টির পর যেন তার রূপ খোলে আরও। পরিবেশ এমন রঙচঙে হয়ে যায়, মনে হয় সারা প্রকৃতিই শিল্পীর রঙের প্যালেট। তখন ধরা পড়ে চোখে সবুজাভ ঘন ওক গাছের বন। ছোটো ছোটো বাড়ি। আলো-করা ফুলের বাগান। ভরে থাকে প্রকৃতি সূর্যালোকের পরশে। রঙের আলো-আঁধারি, বহুবর্ণের ছটা। এইরকম একটি প্রকৃতি থেকে কনস্টেবল নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারেন নি বা রাখেন নি। তাঁর সমগ্র আত্মা মনেপ্রাণে ডুবে যেত রঙের চেতনায়, মহিমায়, বৈভবে, প্রকৃতির অবিস্মরণীয় সত্তায়। বিমুগ্ধ কনস্টেবল সদাই নিমগ্ন থাকতেন রঙ তুলি নিয়ে। এজন্য তাঁকে বলা হয় প্রকৃতির শিল্পী। পৃথিবীতে তিনি ভাস্বর হয়ে আছেন তাই অনন্য এক স্বকীয়তার প্রতিষ্ঠান হিসেবে।

মাতিস কী ধরনের কাজ করেছেন তা সবাই জানেন। তবু মাতিসের শিল্পশিক্ষা-গ্রহণের অপরিসীম আগ্রহের কথা বলছি। মাতিসের তখন বয়স তিরিশের কাছাকাছি। পল গঁগা তাহিতি দ্বীপে স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়ে বসে আছেন। ভ্যান গগ মৃত। উৎকেন্দ্রিক অবস্থায় শিল্পী সিগন্যাক। লত্রে অসুস্থ এবং চরম সীমায় উপনীত। এইরকম একটি সময়ে মাতিসের চিত্রপ্রদর্শনী কোনো ছাপ রাখতে পারল না। মাতিস (১৮৯৬ সাল নাগাদ) দেখা করলেন অস্ট্রেলিয়ান শিল্পী জন রাসেলের সঙ্গে। ইনি ক্লদ মঁনে এবং রঁদ্যার ঘনিষ্ঠ সহযোগী বন্ধু। রাসেল মাতিসকে ভ্যান গগের দুটো ড্রয়িং উপহার দেন। এর পর মাতিস দেখা করলেন পিসারো এবং রঁদ্যার সঙ্গে। তাঁরা তাঁকে উপদেশ দিলেন টারনারের কাজকর্ম দেখতে, অন্তঃস্থ করতে। মাতিস এঁদের কাছ থেকে টিপস নিয়ে, স্ত্রীর কাছ থেকে পঞ্চাশ পাউন্ড সংগ্রহ করে পাড়ি দিলেন লন্ডন। সেখানে এসে মাতিস সেজানের ল্যান্ডস্কেপ, গঁগার ছোটো একটি আঁকা ছবি, দুটো প্যাস্টেলের কাজ অডিলন এবং বিডানের, ভ্যান গগের একটি ড্রয়িং কিনে বাড়িতেই ছোটোখাটো একটি আর্টগ্যালারি বানিয়ে ফেললেন। দিনরাত এগুলো অন্তঃস্থ করতে-করতে নিজেকে তৈরি করতে লাগলেন। এইভাবে নিজেকে গঠন করে মাতিস আজ মাতিস-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, বন্দিত হয়েছেন, নন্দিত হয়েছেন শিল্পকলাজগতে। কী অসাধারণ ধৈর্য, শিল্পের প্রতি নিষ্ঠা, মমতা, এবং মানসিকতার অধিকারী ভাবুন তো!

এইরকম আদর্শবোধ আমাদের দেশে দু-চারজন শিল্পীর যদি থাকত তবে ভারতীয় শিল্পজগৎ আজ কোন স্তরে পৌছত! শ্রদ্ধা করা তো দূরের কথা—বদলে চলেছে রেষারেষি। ভাবলে ক্লান্তি আসে, লজ্জা পাই, হতাশ হই। আমার কথা—একে অপরকে শ্রদ্ধা না করলে মানুষ হতে পারেন না, প্রকৃত শিল্পী হওয়া তো আরো দূরের কথা।

আজকের কলকাতায় নদীর স্রোতের মতো তিনটি রূপ সমান্তরালভাবে বয়ে চলেছে গঙ্গা-মেঘনা-পদ্মার মতো। তিনটি স্রোত—হুগলী নদীর স্রোত, জনসমাগমের স্রোত, সঙ্গে সঙ্গে চলেছে যানবাহনের অবিরাম স্রোতোধারা। নদী, গাড়ি আর মানুষের এমন সহাবস্থান ইট-কাঠ-কংক্রিটের স্রোতে কদাচ মিশে যায়নি। এটা একটা আশ্চর্য অনুভূতি, এক পৃথক ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। অবশ্যই তার নাম কলকাতা। একদা রাজধানী কলকাতা, অধুনা বহু বিশেষণের কলকাতা আজও অন্তরের রাজধানী হয়ে অধিষ্ঠাত্রী—কলকাতা। এখানেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে প্রাচীন কলকাতার ঐতিহ্যের ভারে ভারাক্রান্ত স্মৃতিসৌধাবলী। আকাশের নক্ষত্রের মতো তাদের অধিষ্ঠান। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে ময়াল সাপের মতো শহর কলকাতায় মিছিল, শ্লোগান, পুজোর ভাসান, দূষিত বাতাস। একই আকাশের নীচে বাস করছে ধনী, নির্ধন। কেউ স্কাইস্ক্রেপারে, কেউ ফুটপাতে। একই সঙ্গে চলছে গ্যাসের উনুনে ফ্ল্যাটে, ইট-কাঠ-কয়লা বসিয়ে ফুটপাতে রান্নাবান্না, ঘরগেরস্থালি। কেরোসিন কুপির আলোয় ঝুপড়ির জীবনযাত্রা, আনন্দ বর্ধনের জন্য ট্রানজিসটার সেটে হিন্দি গান। আবার

কোথাও পুরাতন ইমারতের ফাটলের মধ্যে রৌদ্রলোভী বটগাছ আকাশকে ছুঁতে চাইছে। আশ্চর্য মাদকতায় ভরে আছে আমাদের ভারাক্রান্ত, পৃথুলা কলকাতা। এই আমার কলকাতাকে একের পর এক নতুন করে রেখাবন্দী করে চলেছি যেন নতুন আবিষ্কারের নেশায়। সার্থকতার ভার আপনাদের দিলাম।

রথীন মিত্র

বিদেশী সাহিত্য

গান্ধীকে নিয়ে কিছু ভাবনা

['গান্ধী' ছবির বিতর্ককে ধন্যবাদ—গান্ধীকথা সম্প্রতি বাঙালিদের ভিতরে আবার বেশ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। অরওয়েলের এই পুস্তক পর্যালোচনা এখন তাই রূপান্তর করে পরিবেশন করবার সপক্ষে অন্তত দুটি বড়ো যুক্তি পাওয়া যায়। তরুণদের ভিতরে যাঁরা অরওয়েলের উনিশশো উনপঞ্চাশ পর্যালোচিত বইখানি পড়ে উঠতে পারেন নি, হঠাৎ এই পর্যালোচনা বাঙলায় পড়ে তাঁদের হয়তো মনে হবে—পড়লে হয় বইটা। আর যাঁরা পড়েছেন তাঁরা নিজেদের সেই অনুভবের সঙ্গে এই পর্যালোচনার বিশেষ ভঙ্গিকে মিলিয়ে গান্ধীজীকে একবার নতুন করে দেখে নিতে পারবেন। এভাবে ফিরে দেখা, আর-একবার স্বাদ ফিরিয়ে দেওয়াই তো যথার্থ পর্যালোচনার লক্ষ্য। অরওয়েল সেই কাজ পারতেন বড়ো ভালো। প্রথম এবং প্রধান কারণ এই। আরো একটি কারণ আছে।

অরওয়েলের ব্যক্তিত্বের মাপ হয়তো খুব বড়ো নয়, কিন্তু মাত্রা বহু। এই বহুমাত্রিক লেখককে উনিশশো চুরাশির নাম করে যেন ছাঁচে ফেলা ভূমিকাভিনেতার মতো বড়ো বারবার উপস্থিত করা হচ্ছে। এতে পাঠকদের প্রতি সুবিচার হচ্ছে না, অরওয়েলের স্মৃতির প্রতিও অবিচার চলছে। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। সব লেখক সমস্ত পাঠকের মনের মতো হবেন, এমন কোনো কথা নেই; কিন্তু লেখক দারুণ ভালো, মাঝারি কিংবা মন্দ যেমনটিই হোন, তিনি যা তাঁকে ঠিক পুরো সেভাবেই দেখতে পাওয়া লেখকের পক্ষে যেমন, পাঠকের পক্ষেও তেমনি আরামপ্রদ। উনিশশো চুরাশিতে অরওয়েলের নামকে ফিরিয়ে আনার প্রবণতা দেখে আমাদের এরকম মনে হয়েছিল যে অরওয়েলকে যদি নতুন প্রজন্মের বাঙালি পাঠকদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হয় তাহলে **উনিশ শো চুরাশি-র** পুনরুল্লেখই যথেষ্ট নয়, এমন কি ওই উল্লেখ হয়তো আবশ্যিকও নয়। অরওয়েলের সৎ, তন্নিষ্ঠ মেজাজের নির্ভুল নিদর্শন ছড়ানো রয়েছে তাঁর বিবিধ প্রবন্ধে। গান্ধী বিষয়ে আলোচনা প্রবন্ধটি তাদের অন্যতম। অনু.]

যতক্ষণ না নির্দোষ প্রমাণ হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত সন্তকে দোষী সাব্যস্ত করাই সংগত, অবশ্য একই সাক্ষ্যপরীক্ষা সব সাধুসন্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। গান্ধীর বেলায় যেসব প্রশ্ন তুলতে ইচ্ছে করে সেগুলো এইরকম: এই যে নিজে দীন নগ্ন বৃদ্ধ প্রার্থনার আসনখানির ওপরে বসে স্রেফ আধ্যাত্মিক বলে সমস্ত সাম্রাজ্যকে নড়িয়ে দিচ্ছেন, এই বোধ এবং অহমিকা গান্ধীকে কতখানি ঠেলেছিল? আর, জোরজুলুম এবং জালিয়াতি থেকে স্বাভাবিকভাবে যে রাজনীতিকে বেছে পৃথক করাই শক্ত, সেই রাজনীতিতে ঢুকে তিনি নিজের নীতিগুলিকে আপস মানাতে বাধ্য হয়েছিলেন কতখানি? এসবের কোনো সুনির্দিষ্ট জবাব দেওয়ার আগে গান্ধীর কর্ম এবং রচনাগুলি খুঁটিয়ে পড়ে ফেলা নিতান্ত দরকার, কেননা তাঁর সমস্ত জীবন ছিল তীর্থযাত্রার মতো যেখানে প্রত্যেকটি ক্রিয়াই অতুচ্ছ। কিন্তু এই আংশিক আত্মজীবনী [**দ্য স্টোরি অব মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ** বাই এম. কে. গান্ধী গুজরাতি থেকে মহাদেব দেশাই অনূদিত। পাবলিক অ্যাফেয়ারস প্রেস] যেটি শেষ হয়েছে উনিশশো বিশের দশকে সেটি তাঁর সপক্ষে খুব জোরালো সাক্ষ্য দিচ্ছে; বিশেষ করে জোরালো এই জন্য যে এখানে রয়েছে তাঁর জীবনের সেই অভিজ্ঞ যাকে তিনি বলতেন অপুনর্ভব, সেই অংশের কথা যাতে মনে পড়ে একজন সন্ত বা প্রায়-সন্তের ভিতরে এক অতিশয় চৌকশ মানুষ ছিলেন যিনি ইচ্ছে করলে ধুরন্ধর আইনজ্ঞ হিসেবে যেমন, প্রশাসক কিংবা হয়তো ব্যবসায়ী হিসেবেও তেমনি সার্থকনামা হয়ে উঠতে পারতেন।

এই আত্মজীবনী যখন প্রথম বেরোচ্ছে তার কাছাকাছি সময় দিয়েই আমি এ বইয়ের প্রথম একটি-দুটি অধ্যায় কোনো ভারতীয় খবরের কাগজে বিশ্রী ছাপার অক্ষরে পড়ি। লেখাটা আমার মনের ওপরে ছাপ ফেলেছিল, গান্ধী নিজে সে সময়ে ফেলেন নি। যে-সমস্ত জিনিস সে সময়ে তাঁর সঙ্গে যুক্ত করা হত, ঘরে-বোনা কাপড়, 'আত্মিক শক্তি' এবং 'নিরামিষ আহার'—এসবের আবেদন ছিল না; তা ছাড়া একটা পিছিয়ে-থাকা উপবাসী জনস্ফীত দেশে তাঁর মধ্যযুগীয় কার্যক্রম স্পষ্টতই অচল ছিল। খুব পরিষ্কার ছিল এটাও যে ব্রিটিশরা তাঁকে ব্যবহার করছিল, কিংবা, ভাবছিল যে ব্যবহার করছিল। এমনিতে অবশ্য জাতীয়তাবাদী হিসেবে তিনি একজন শত্রুই ছিলেন কিন্তু প্রত্যেক সংকটমুহূর্তেই যেহেতু তিনি হিংসাত্মক কর্মপন্থা রোধে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে দিতেন—আর, সেটা ব্রিটিশদের দিক থেকে দেখতে গেলে তো সবরকম কার্যকর কর্মপন্থা রোধেরই নামান্তর হত—তাঁকে 'আপনজন' বলেই গণ্য করা যেত। নিজেদের ভিতরে এটা কখনো-কখনো নির্মোহ নিষ্করুণ রঙ্গের ছলে স্বীকারও করা হত। ভারতীয় ধনকুবেরদের মনোভাবও ছিল একই জাতের। গান্ধী তাদের অনুতাপ করতে আহ্বান করে, কমিউনিস্ট কিংবা সোশালিস্ট—সুযোগ পেলেই যারা সকলের ধনসম্পদ কেড়ে নেবে, তাদের তুলনায় বহুগুণে বাঞ্ছনীয় হয়ে উঠেছিলেন। এসব হিসেবনিকেশ শেষ পর্যন্ত কতদূর নির্ভরযোগ্য বলা শক্ত; গান্ধী নিজেই বলতেন, "ঠক যারা, তারা ঠকায় শেষ পর্যন্ত শুধু নিজেদেরই।" সেটা একটা কথা ঠিকই, কিন্তু প্রায় সর্বদাই যতখানি নম্র ব্যবহার তাঁর সঙ্গে করা হত তার একটা আংশিক কারণ অন্তত এই বোধের ভিতরেই ছিল যে তিনি কাজে লেগে যেতেও পারেন। ব্রিটিশ রক্ষণশীলেরা সত্যি-সত্যি তাঁর ওপরে রেগে যায় যখন ভিন্ন কোনো বিজেতার প্রতিও তিনি প্রয়োগ করেন তাঁর অহিংসা, যেমনটা হল সেই উনিশশো বিয়াল্লিশে।

এমন-কি তখনও আমার যেটা নজরে পড়েছে সেটা এই যে, যে-সমস্ত ব্রিটিশ রাজকর্মচারী তাঁকে নিয়ে প্রতিকূল আর তামাশার মেজাজ মিশিয়ে কথা বলেছে তারা পর্যন্ত কোনোভাবে তাঁকে কিন্তু সত্যি পছন্দ করত এবং তাঁর গুণগ্রাহী ছিল। কেউ কখনো বলে নি যে, তিনি দুর্নীতিগ্রস্ত অথবা সাধারণ অর্থে উচ্চাকাঙ্ক্ষী কিংবা কোনো-একটা কাজেও ভয় বা অসূয়ার তাড়না তাঁকে প্রবৃত্ত করাতে পেরেছে। গান্ধীর মতো একজন মানুষকে বিচার করতে বসলে স্বভাবতই মানুষে সাধারণের তুলনায় অনেক উঁচু মাপের মানদণ্ড ব্যবহার করে। তাই ছোটোখাটো গুণগুলি নজরে পড়ে না। যেমন, এই-আত্মজীবনী থেকেও বোঝা যায়, তাঁর স্বাভাবিক দৈহিক সাহস ছিল খুবই চোখে পড়বার মতো: পরে যেভাবে তাঁর মৃত্যু হল তাতে সেই সাহসের দৃষ্টান্ত পুনশ্চ পাওয়া গেল, কেননা নিজের গা বাঁচানোর ব্যাপারে সতর্ক যে-কোনো জননেতা এর চেয়ে ঢের পর্যাপ্ত পাহারায় সুরক্ষিত থাকতেন। এ ছাড়া, ই. এম. ফরস্টার **এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া**-তে খুব ন্যায়সংগতভাবে যে দরের খ্যাপাটে সন্দিগ্ধতাকে ভারতীয় চরিত্রের বদ্ধমূল অসদ্‌গুণ বলে বিবৃত করেছেন—যার সঙ্গে তুলনীয় ব্রিটিশ অসদ্‌গুণ হচ্ছে কপটাচার,—সেই দরের সন্দেহ-বাতিক থেকেও তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। যদিও অবিশ্বস্ত আচরণ চট করে ধরে ফেলবার মতো যথেষ্ট তীক্ষ্ণ কাণ্ডজ্ঞান নিঃসন্দেহে তাঁর ছিল তবু যেখানে যতটা সম্ভব তিনি যেন এটাই বিশ্বাস করতে চাইতেন যে সকলে যা করছে সরল বিশ্বাসেই করছে এবং প্রত্যেকেরই একটা ভালো দিক রয়েছে যেদিকে গেলে তাদের কাছাকাছি পৌঁছনো যায়। এটাও লক্ষণীয়, তিনি জন্মেছিলেন নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে, সুযোগ-সুবিধার ভিতরে জীবন শুরু হয়েছিল এমন নয়, এবং আকর্ষণীয় আকৃতি নিয়েও জন্মান নি; কিন্তু এজন্য মাৎসর্য অথবা হীনম্মন্যতা তাঁকে অধিকার করতে পারে নি। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষের কুৎসিততম প্রকাশের চেহারা যখন তিনি দেখতে পান, তাঁর প্রতিক্রিয়ায় ছিল বিস্ময়। এমন-কি যখন তিনি সত্যিই যাকে বর্ণ-সংগ্রাম বলে অভিহিত করা যায় এইরকম একটা লড়াই করছেন তখনও তিনি মানুষকে বিভিন্ন জাতি বা সামাজিক স্তর-মর্যাদার সূত্র ধরে সাজিয়ে নিতে যান নি। একজন প্রদেশের শাসক, জনৈক ক্রোড়পতি-তুলাব্যবসায়ী, এক অর্ধাহারী দ্রাবিড় কুলি, ব্রিটেন-থেকে-আসা এক বেসরকারী সৈনিক—সকলেই সমানভাবে মনুষ্যপদবাচ্য, একইভাবে সকলের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। ভয়ানক গোলমেলে অবস্থাতেও, ভারতীয়দের নেতা হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি যখন নিজেকে অপ্রিয় করে তুলছিলেন তখন যেমন বিশ্রী গোল বেঁধে গেল, এমন-কি সেইরকম সময়েও তাঁর ইউরোপীয় বন্ধুর অভাব ঘটে নি, এটা নজরে পড়ে।

খবরের কাগজে পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হবে বলে ছোটো ছোটো টুকরোয় ভাগ করে লেখা এই আত্মজীবনী কোনো মহান সাহিত্যকীর্তি নয়। এর ভিতরের অংশে অনেক কিছুই খুবই সাদামাটা আর সেজন্যেই এটির দাম বেড়ে গেছে বহুগুণ। এই কথা মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল যে, গান্ধী একেবারে যে-কোনো তরুণ ভারতীয় ছাত্রের সাধারণ উচ্চাভিলাষ নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন, চরমপন্থী মত তাঁকে গ্রহণ করতে হয় অল্প-অল্প করে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশ অনিচ্ছাসত্ত্বেও। মজা লাগে সেইসব সময়ের কথা শুনতে যখন গান্ধী টুপি দিচ্ছেন মাথায়, নাচ শিখছেন, ফরাসী আর লাতিন পড়ছেন, উঠছেন গিয়ে আইফেল টাওয়ারে, এমন-কি বেহালা শিখতে চেষ্টা করছেন—এত কাণ্ড সবই ইউরোপীয় সভ্যতাকে যতদূর সম্ভব আত্মস্থ করে নেবার উদ্দেশ্যে। তিনি সেইসব মহাপুরুষ বা সন্তদের একজন নন যাঁরা আশৈশব অসামান্য শুচিতা-চিহ্নিত, আবার তিনি সেইরকম বৈরাগীদের মতোও নন যাঁরা চমকপ্রদ লাম্পট্যের পরে সংসারত্যাগী যোগী বনে যান। যৌবনকালে তিনি কী কী অপরাধ করেছিলেন তার সম্পূর্ণ স্বীকৃতি রয়েছে এখানে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বীকারোক্তির যোগ্য অপরাধ তেমন কিছু নেই। গান্ধীর মৃত্যুকালে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে যা ছিল সব-কিছু মিলিয়ে একটি আলোকচিত্র তোলা হয়। এই বইয়ের প্রচ্ছদ সেই ছবি। মোটামুটি পাউন্ড পাঁচেকে কিনে নেওয়া যায় এমনই সে সম্পত্তি; গান্ধীর পাপ, অন্তত তাঁর দেহগত পাপ-ও, তেমনি স্তূপ করে রাখলে তুলনীয় একটি সংগ্রহ হবে। কয়েকটি সিগারেট, কয়েক গ্রাস মাংস, দাসীর কাছ থেকে আনা-কয়েক পয়সা সরানো, বেশ্যালয়ে-গমন দুটি বার (প্রতি বারই চলে আসা গেছে "কিছু-না-করেই"), প্লিমাউথে ল্যান্ডলেডির সঙ্গে একটা হব-হব-নটঘটি আর মাত্র একবারই দারুণ রেগে খেপে ওঠা—সর্বসাকল্যে এই তো সংগ্রহ। প্রায় বাল্যবয়স থেকে আন্তরিকতার যে গভীরতা, যে প্রতিন্যাস তাঁর ছিল তাকে ধার্মিক না বলে নৈতিক বলাই সংগত, ত্রিশে পৌঁছে যাবার আগে এই প্রতিন্যাস কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো গতি পায় নি। জনজীবনে প্রবেশ হিসেবে বর্ণনা করা চলে এমন ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটে নিরামিষ ভোজনের মাধ্যমে। তাঁর বেশ কিছুটা অসাধারণ স্বভাবী বৈশিষ্ট্যের তলে বেশ মজবুত মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী পিতৃপুরুষদের নিত্য উপস্থিতি অনুভব করা সম্ভব। মনে হয়, যেন ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে পরিত্যাগ করে এলেও তাঁর ভিতরে রয়ে গিয়েছিলেন এক উদ্যোগী আইনজ্ঞ, স্থিরবুদ্ধি রাজনীতিক যাঁর খরচপত্র কমিয়ে রাখার দিকে যেমন খেয়াল, তেমনি নৈপুণ্য সভা-সমিতি-পরিচালনার

কাজে, তাড়া করে গিয়ে চাঁদা আদায় করে নিতে যাঁর কোনো ক্লান্তি নেই। নানা বৈচিত্র্যের অদ্ভুত সংমিশ্রণে গড়া ছিল তাঁর চরিত্র কিন্তু তার ভিতরে এমন কিছুই ছিল না যেদিকে আঙুল তুলে বলা যায় খুব খারাপ ওটা, আর, আমি যতদূর জানি, গান্ধীর অতিবড় শত্রু পর্যন্ত স্বীকার করবে যে তিনি এমন একজন চিত্তাকর্ষী এবং অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন যিনি শুধু বেঁচে থেকেই পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। তদুপরি মানুষটি আবার প্রীতির পাত্র হিসেবে গ্রহণীয় ছিলেন কিনা, কিংবা, যাদের কাছে মূল ধর্মবিশ্বাস-গুলি অগ্রহণীয় তাদের কাছেও সেই বিশ্বাসে প্রোথিত তাঁর সমস্ত বাণীর মূল্য থাকা সম্ভব কিনা—এইসব ব্যাপারে আমি কখনো সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হতে পারি নি।

সম্প্রতি গান্ধীকে নিয়ে এইভাবে কথা বলা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে যাতে মনে হবে যে, পশ্চিমী বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি শুধু তাঁর সমবেদনা ছিল তাই নয়, তিনি একেবারে এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গই ছিলেন। বিশেষত নৈরাজ্যবাদীরা এবং শান্তিবাদীরা তিনি যে কেন্দ্রীয়তা এবং রাষ্ট্রবদ্ধ হিংস্রতার বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেছেন এরই ভিত্তিতে একেবারে ধরে নিয়েছে যে তিনি তাদেরই পক্ষের মানুষ, তাঁর ভাবনাধারায় যে কী পরিমাণ লোকোত্তর-ভাব এবং অ-মানবিকতাবাদী ঝোঁক রয়েছে সেসব তারা একেবারে অগ্রাহ্য করেছে। কিন্তু আমার মনে হয় যে কারুরই বুঝতে ভুল হওয়া উচিত নয় : 'সকল কিছুরই পরিমাপ মেলে মানুষে' এবং 'এই যে পৃথিবী, যে পৃথিবীটাতেই শুধু আমরা বাঁচি সেখানে জীবনকে যাপনযোগ্য করে তোলাই আমাদের কাজ'—ধরনের কথায় যে বিশ্বাসের প্রকাশ তার সঙ্গে গান্ধীর বাণী ঠিকমত মিশ খায় না। গান্ধীর বাণী অর্থবহ হয়ে ওঠে তখনই যখন মনের ভিতরে এই বিশ্বাস কাজ করে যে ঈশ্বর আছেন এবং এই বস্তু দিয়ে ঘেরা গোটা পৃথিবী—এই মায়ার জগৎ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হবে। যে-সমস্ত বিধি-নিষেধ গান্ধী নিজের উপরে আরোপ করেছিলেন সেগুলো তিনি জোর করে হয়তো তাঁর প্রতিটি অনুগামীকে প্রতিপদে মানতে বাধ্য করেন নি, কিন্তু মনে করতেন যে ঈশ্বর অথবা মানবসমাজকে সেবা করতে হলে মেনে চলা যা অত্যাবশ্যক সেইগুলি সযত্নে বিবেচ্য। প্রথমত মাংসাহার এবং সম্ভব হলে সর্বপ্রকার জৈবখাদ্যগ্রহণই নিষিদ্ধ। (স্বাস্থ্যের খাতিরে গান্ধীকে দুধ বিষয়ে আপস করতে হয়েছিল, কিন্তু একে তিনি ব্যত্যয় বলেই বিবেচনা করতেন।) নিষিদ্ধ মদ্য অথবা তামাক, মশলা বা সুঘ্রাণ ব্যঞ্জন, এমন-কি সুগন্ধি পাতাও দেওয়া চলবে না, কেননা আহার তো করা হচ্ছে আহার্যের জন্য নয়, শুধুমাত্র শরীরের শক্তি রক্ষার জন্য। দ্বিতীয়ত, সম্ভব হলে, কোনো যৌন-সংগম নয়। যদি সংগম করতেই হয়, সেটা যেন বহুদিন অন্তর-অন্তর হয় এবং সন্তানপ্রজননই যেন হয় তার একমাত্র উদ্দেশ্য। পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি গান্ধী নিজে শপথ নিয়েছিলেন **ব্রহ্মচর্যের** ; তার অর্থ কেবল অযৌনাচার নয়, যৌন-আকাঙ্ক্ষারই নিবৃত্তি। ঘনঘন উপবাস এবং বিশেষ আহারব্যবস্থা ব্যতিরেকে ওই অবস্থায় গিয়ে পৌঁছনো কঠিন বোধ হয়। দুগ্ধপানের অন্যতম বিপদ এই যে ওটি কামস্পৃহাবৃদ্ধির সহায়ক। সর্বশেষ এবং মুখ্য নিষেধ এই যে শুভসন্ধানী মানুষের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা কোনো নিজস্ব প্রণয়প্রীতি থাকা একেবারে উচিত নয়।

গান্ধীর মতে, ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব বিপজ্জনক কেননা "বন্ধুদের পরস্পর প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে" এবং বন্ধুর প্রতি আনুগত্য কাউকে কোনো অন্যায়কর্মের দিকে ঠেলে দিতে পারে। এ বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রশ্নাতীত। তদুপরি, ঈশ্বরকে ভালোবাসতে হলে অথবা সমস্ত বিশ্বসংসারের মানবপ্রেমে মগ্ন হতে গেলে কোনো বিশেষ ব্যক্তির প্রতি প্রেমের পক্ষপাত দেখিয়ে ওঠা যায় না। এ-ও সত্য এবং যথাসংগত যে ঠিক এই কথাটিরই তীক্ষ্ণমুখে এসে থেমে যায় মানবিক এবং ধার্মিক প্রতিন্যাসের আপাত মিলমিশ। সাধারণ মানুষের কাছে ভালোবাসার মানে তো কয়েকটি মানুষকে আর সকলের বেশি ভালোবাসা ছাড়া আর অন্য কিছুই নয়। গান্ধী তাঁর পত্নী এবং সন্তান-সন্ততির প্রতি বেদরদীর মতো ব্যবহার করেছিলেন কিনা, গান্ধীর আত্মজীবনীতে এই ব্যাপারটা নিশ্চিত করে ঠাহর করা যায় না, কিন্তু বইতে এই কথা বেশ পরিচ্ছন্ন হয়েছে যে তিনি চিকিৎসকের নির্দেশমত জৈব খাদ্য দেওয়ার চেয়ে স্ত্রী এবং সন্তানদের মরতে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন অন্তত তিনবার। এটা ঠিক যে আসন্ন মৃত্যু শেষ পর্যন্ত আসে নি এবং এ-ও সত্য যে গান্ধী উলটো তরফের নৈতিক চাপে রোগীকে সর্বদাই এ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন যে ইচ্ছে হলে পাপ করে বেঁচে থাকার সিদ্ধান্ত সে নিতে পারে : তবু সিদ্ধান্ত যদি তাঁরই একান্ত নিজস্ব হত তাহলে তিনি জৈব খাদ্য নিষিদ্ধই রাখতেন, তাতে ঝুঁকি যা-ই থাকুক। তিনি হলে বলতেন, বেঁচে থাকবার জন্যে আমরা কতদূর কী করব তার একটা সীমা টানা দরকার, এবং সে সীমা মুরগীর সুরুয়ার বেশ ওদিকে। হতে পারে, এই প্রতিন্যাস মহত্ত্বমণ্ডিত কিন্তু অধিকাংশ মানুষ যে অর্থে শব্দটি ব্যবহার করে সেই অর্থেই সোজাসুজি এটি অ-মানবিক। মানবিক হওয়ার মৌল লক্ষণ হচ্ছে সে নিখুঁত হতে চায় না, আনুগত্যের জন্য কখনো-কখনো সে পাপ করতেও প্রস্তুত, বৈরাগ্যকে সে এমন স্তরে পৌঁছে দেয় না যা বন্ধুসুহৃদের সঙ্গে গল্পসল্প অসম্ভব করে তোলে, মানবিক মানুষকে শেষ পর্যন্ত জীবনের হাতে হেরে গিয়ে ভেঙেচুরে চুরমার হয়ে যাবার জন্যে তৈরি থাকতে হয়, অন্য মানুষদের ভালোবাসার উপরে নিজের জীবনকে বেঁধে রাখার অবধারিত মূল্য সেইটাই। সন্দেহ কী যে মদ্য, তামাক এবং অন্যান্য যা দ্রব্যাদি সেগুলো মহাপুরুষকে এড়িয়ে যেতে হবেই কিন্তু মহাপুরুষত্ব হচ্ছে এমন একটি দ্রব্য যা সাধারণ মানুষকে এড়িয়ে যেতেই হবে। এর একটা চটজলদি জবাব রয়েছে, কিন্তু সেটি দেবার ব্যাপারে একটু সাবধান হওয়া দরকার। এই যোগী-অধ্যুষিত যুগে বড়ো সহজেই ধরে নেওয়া হয় যে "নিরাসক্তি" শুধু যে এই জাগতিক জীবনকে পূর্ণতর রূপে গ্রহণ করবার চেয়ে ঢের বেশি উন্নত স্তরের জীবনযাপনপদ্ধতি তাই নয়, এখানে পৌঁছনো খুব কঠিন বলেই সাধারণ মানুষ একে বর্জন করে, অর্থাৎ সাধারণ মানুষ হচ্ছে ব্যর্থ মহাপুরুষ বা খণ্ডিত সন্ত। এই ধারণার যাথার্থ্য সম্পর্কে সন্দেহ রাখার কারণ আছে। বহু মানুষ আন্তরিকভাবেই সন্ত হতে চায় না এবং এটার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে কয়েকজন মানুষ যাঁরা সন্তত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন বা সন্ত হতে চান, তাঁরা কখনোই সাধারণ মানুষ হওয়ার জন্য প্রলুব্ধ হন নি। মনে হয়, এর মনস্তাত্ত্বিক সূত্র খুঁজলে যা পাওয়া যাবে তা এই যে "নিরাসক্তি"র মূল প্রেরণা রয়েছে পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেয়, বেঁচে থাকার যন্ত্রণা, সবচেয়ে বেশি যৌন বা অযৌন যে-কোনো রূপেই যে-ভালোবাসা বড়ো কঠিন আয়াসলভ্য তা থেকে পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেতে। এখানে অপার্থিব এবং মানুষী আদর্শের ভিতরে কোনটি 'উচ্চতর', তা নিয়ে বিতর্কের অবতারণার অবশ্য কোনো আবশ্যকতা নেই। কথা হচ্ছে দুইয়ের ভিতরে গরমিল নিয়ে। ঈশ্বর এবং মানুষ—এই দুইয়ের ভিতরে একজনকে বেছে নিতে হয় এবং নম্রতম উদারনৈতিক থেকে ধরে কট্টর নৈরাজ্যবাদী পর্যন্ত সমস্ত চরমপন্থী এবং প্রগতিবাদীরা সকলেই মোটামুটি মানুষকেই বেছে নিয়েছে।

অবশ্য গান্ধীর শান্তিবাদকে তাঁর অন্যান্য বাণী থেকে কতকটা পৃথক করা সম্ভব। এর মূল তাগিদ ছিল ধার্মিক কিন্তু এটিকে তিনি এমন এক বিশেষ কৌশল, এক প্রণালী হিসেবে দাখিল করেছিলেন যার সাহায্যে ঈপ্সিত রাজনৈতিক ফল ফলিয়ে তোলা যায়। অধিকাংশ পশ্চিমী শান্তিবাদীদের সঙ্গে গান্ধীর প্রতিন্যাস তুলনীয় নয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম অঙ্কুরিত এই **সত্যাগ্রহ** এক ধরনের অহিংস যুদ্ধের মতো, এ যুদ্ধে শত্রুকে আহত না করে, তার বিরুদ্ধে ঘৃণা না পোষণ করে এবং বিদ্বেষ না জাগিয়ে তাকে পরাভূত করা যায়। এই রণনীতির ভিতরে রয়েছে আইনঅমান্য, ধর্মঘট, রেলগাড়ির সম্মুখে শুয়ে পড়া, পালিয়ে না গিয়ে বা উলটে না মেরে পুলিশের মার সহ্য করা। **সত্যাগ্রহের** (ইংরেজি) রূপান্তর 'প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স্' (পরোক্ষ প্রতিরোধ) করায় গান্ধীর আপত্তি ছিল : গুজরাতিতে সম্ভবত কথাটির অর্থ "সত্যের বল"। জীবনের প্রথম দিকে গান্ধী বুয়র যুদ্ধে ব্রিটিশ পক্ষে স্ট্রেচার-বাহক হিসেবে কাজ করেছিলেন, ১৯১৪-১৮-র যুদ্ধেও একই কাজ করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। হিংসাত্মক পথ সম্পূর্ণত ছেড়ে দেওয়ার পরেও এই কথাটা বোঝার মতো পর্যাপ্ত সততা তাঁর ছিল যে যুদ্ধকালে কোনো-না-কোনো পক্ষ নিতেই হয়। তিনি কখনো বলেন নি —আর তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক কৃতি যেহেতু পুরোপুরি জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত—তাঁর পক্ষে সম্ভবই ছিল না এরকম নির্বীর্য অসৎ ছলনায় সায় বাজিয়ে যাওয়া যেন প্রত্যেক যুদ্ধে উভয় পক্ষই একেবারে তুল্যমূল্য, যেন কে জেতে তাতে কিছুই এসে যায় না। অধিকাংশ পশ্চিমী শান্তিবাদীর মতো অস্বস্তিকর প্রশ্নগুলি এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে পটুত্বও তিনি বিশেষভাবে অর্জন করেন নি। সাম্প্রতিক যুদ্ধের প্রেক্ষিতে প্রতিটি শান্তিবাদীর একটা পরিষ্কার দায় ছিল একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া : "ইহুদীদের কী হবে? ওদের মেরে ফেলে দেওয়া হোক, দেখবে এটা? না হলে, যুদ্ধ না করে এটা ঠেকাবে কী দিয়ে?' এখানে বলা উচিত, আমি একটি পশ্চিমী শান্তিবাদীকেও এ প্রশ্নের কোনো সৎ উত্তর দিতে শুনি নি, "তুমি আরেকজন" গোছেরই এড়িয়ে যাওয়া ছলনা দেখেছি বহু, অন্যান্য ঢঙও দেখেছি, কিন্তু এটা একটা ঘটনা যে ১৯৩৮-এ গান্ধীকে প্রায় অনুরূপ একটি প্রশ্ন করা হয় এবং তাঁর জবাব শ্রী লুই ফিশারের **গান্ধী এবং স্তালিন** গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। শ্রী ফিশার জানাচ্ছেন, গান্ধীর মত ছিল এই যে জর্মন ইহুদীদের গণ-আত্মাহুতি দেওয়া উচিত, তাহলে "হিটলারের হিংস্রতা বিষয়ে বিশ্ব এবং জর্মন জনগণকে জাগিয়ে তোলা যাবে।" যুদ্ধের পরে তিনি নিজেকে সমর্থন করেন : ইহুদীরা যেভাবেই হোক নিহত হলই, তাদের মৃত্যু বরং অতুচ্ছ হয়ে থাকতে পারত। বিবরণ থেকে বোধ হয়, শ্রীযুক্ত ফিশারের মতো ব্যগ্র অনুরাগীও এই প্রতিন্যাসের ধাক্কায় বেসামাল হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু গান্ধী অটুট রাখছিলেন তাঁর সততা—আর কিছু নয়। খুন করতে প্রস্তুত না হলে যেসব জীবনহানি কোনো না কোনোভাবে ঘটে যাবেই তার জন্য প্রায়ই প্রস্তুত থাকা জরুরি হয়ে ওঠে। ১৯৪২-এ যখন তিনি জাপানি হানাদারদের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উৎসাহ দিচ্ছিলেন, তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন যে এর ফলে কয়েক কোটি মানুষের প্রাণ যাবে।

একই সঙ্গে আবার এ কথা ভাবারও যথেষ্ট কারণ আছে যে গান্ধী, যতই যা হোক তিনি জাতক তো সেই ১৮৬৯-এর, সর্বাধিনায়কত্বের চরিত্র ঠিক ধরতে পারেন নি এবং সব-কিছুকেই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর নিজের লড়াইয়ের ভাষ্যেই অবধারণ করতে চেয়েছেন। এখানে বড়ো কথাটা এই নয় যে, তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করার সময়ে ইংরেজরা প্রভূত ধৈর্যশীলতার প্রমাণ দিত ; এর চেয়েও বড়ো প্রাসঙ্গিক কথাটা এই যে, তিনি সর্বদাই প্রচারের একটা সুযোগ পেতেন। উপরের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হবে যে তিনি "বিশ্বকে জাগিয়ে তোলায়" বিশ্বাস করতেন। সেটা সম্ভব হতে পারে তখনই যখন তুমি কী করছ বিশ্ব সেটা শুনবার একটা সুযোগ পায়। যেখানে রাষ্ট্র-বিরোধীরা রাত্রির মধ্যযামে অদৃশ্য হয়ে যায়, তাদের বিষয়ে আর কিছু শোনাই যায় না সেখানে গান্ধীর প্রণালী প্রয়োগ করার পথ দেখতে পাওয়া কঠিন। স্বাধীন ছাপাখানা এবং সম্মিলনের অধিকার ব্যতিরেকে শুধু বহির্জগতের মতামত চেয়ে আবেদন পৌঁছে দেওয়া যায় না তাই নয়, কোনো গণ-আন্দোলন গড়া, এমনকি প্রতিপক্ষকে নিজের উদ্দেশ্য জানানো পর্যন্ত অসম্ভব হয়। রুশদেশে কি এই মুহূর্তে কোনো গান্ধী রয়েছেন? যদি থাকেন, কী করে উঠতে পারছেন তিনি? আইন অমান্য আন্দোলনের অনু-

শীলন রুশ জনগণের পক্ষে সম্ভবপর হয় কেবল যদি একযোগে একই ভাবনা সকলের মনে জেগে ওঠে, এমন-কি তখনও, ইউক্রেইনের দুর্ভিক্ষের ইতিহাস যা বুঝিয়ে দিয়েছে, খুব একটা উনিশ-বিশ কিছু হবে এমন নয়। তা-ও যদি না-হয়, ধরাই যায় অহিংস প্রতিরোধ স্বদেশী সরকার কিংবা স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে কার্যকর, কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কী ভাবে এর প্রয়োগ হবে? এই গেল-যুদ্ধের বিষয়ে গান্ধীর বিবিধ ভাষণের একটির সঙ্গে অন্যটির বক্তব্যে যে-বিরোধ দেখা যাচ্ছিল তাতে সম্ভবত এটাই ধরা পড়ে যে, তিনি নিজে এই অসুবিধা টের পাচ্ছিলেন। বৈদেশিক রাজনীতিতে প্রয়োগ করতে গেলে শান্তিবাদ হয় তার শান্তিবাদিতা হারায় নয়তো তোষণের আকার ধরে। তা ছাড়াও, ওই যে মৌল প্রত্যয় ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে যোগাযোগের বেলায় গান্ধীর অব্যর্থ সহায় ছিল : 'সব মানুষকেই অল্পবিস্তর কাছে টানা যায় আর ব্যবহারে ঔদার্য থাকলে সাড়া মেলে সকলের কাছেই'—গুরুতর প্রশ্ন উঠে যায় এই প্রত্যয় বিষয়েই। খুব সহজ দৃষ্টান্ত : পাগলদের সঙ্গে ব্যবহার করতে গেলেই ধরা পড়ে যে কথাগুলি অবধারিত সত্য নয়। তখন প্রশ্নটা দাঁড়ায়—মানসিকভাবে সুস্থ কে? হিটলার সুস্থ ছিল? এটা কি সম্ভব নয় যে একটা সম্পূর্ণ সংস্কৃতি ভিন্ন কোনো সংস্কৃতির প্রতিমানে পাগল প্রতিপন্ন হয়ে যাবে? তারপর জাতীয় গোষ্ঠীগুলির নিজস্ব ভাবসাব যতদূর আঁচ করা সম্ভব তাতে আচরণে ঔদার্য থাকলেই সহৃদয় প্রতিক্রিয়া মিলবে, এরকম কোনো প্রত্যক্ষ যোগ কি দৃশ্যমান মনে হচ্ছে? আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কৃতজ্ঞতা কি কোনো একটা উপাদান হিসেবে গণ্য?

এইসব এবং অনুরূপ বহু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার দরকার, খুব জরুরি দরকার কেউ বোতাম টিপে ফেলবার এবং রকেট উড়তে শুরু করে দেবার আগে যে-কটি মাত্র বছর আছে তার ভিতরে এই আলোচনা সেরে নেওয়া। সন্দেহ হয়, এই সভ্যতা আরো একটা মহাযুদ্ধের ধকল সইতে পারবে কিনা, এবং এই কথাটুকু অন্তত ভাবার মতো যে এ থেকে বেরোবার পথ রয়েছে অহিংসাতে। গান্ধীর গুণ এই যে, আমি যে-সব জাতের প্রশ্ন উপরে তুলেছি তিনি সেগুলি সৎভাবে ভেবেচিন্তে দেখতে প্রস্তুত থাকতেনই এবং খুবই সম্ভব যে এগুলির অধিকাংশকেই তাঁর সংবাদপত্রের অসংখ্য প্রবন্ধাবলীর ভিতরে কোনো-না-কোনো ভাবে আলোচনা করে দিয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে এইরকম মনে হয় যে তিনি অনেক কিছুই হয়তো বুঝতেন না, কিন্তু এমন কিছু ছিল না যা নিয়ে তিনি কথা বলতে কিংবা ভাবতে ভয় পাবেন। গান্ধীর প্রতি কোনোদিনই আমি মনের মতো মানুষ হিসেবে টান অনুভব করে উঠতে পারি নি, কিন্তু আমি কখনোই এ কথাটা নিঃসংশয়ে ধরে নিই না যে, রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তিনি মূলত ভ্রান্ত, এ-ও আমি বিশ্বাস করি না যে তাঁর জীবন ব্যর্থ হয়েছে। এটা খুব আশ্চর্য যে যখন তিনি নিহত হন, তাঁর একান্ত অনুরাগীদের ভিতরে বহুজন শোকার্ত হয়ে বলে উঠেছিলেন, সারা জীবনের কাজ ধ্বংস হয়ে গেল দেখার জন্যে যতটা আয়ুর দরকার ঠিক সে কটা বছরই তিনি বেঁচে রইলেন, কেননা ভারতে তখন সেই গৃহযুদ্ধ চলেছে ক্ষমতার হস্তান্তরের অন্যতম উপজাত হিসেবে যে-গৃহযুদ্ধ ছিল সর্বদাই পূর্বদৃষ্ট। কিন্তু গান্ধী তো হিন্দু-মুসলিম প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে একটুখানি মসৃণ করে দেবার জন্য জীবনপাত করেন নি। তাঁর প্রধান রাজনৈতিক লক্ষ্যবেধ, শান্তিপূর্ণ পথে ব্রিটিশ শাসনের অপসারণ, শেষ পর্যন্ত ঠিকই হয়ে গেছে। এ অবস্থায় যেমন হয়ে থাকে প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি এপাশে ওপাশে দুরকমই দেখা যায়। যেমন, একদিকে বিনা যুদ্ধে ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে গেল, একটা ঘটনা যেটা সত্যি সত্যি ঘটে যাবার এক বছর আগেও খুবই কম রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের পক্ষে এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার সাধ্য ছিল। অন্যদিকে এটা ঘটিয়ে তুলল শ্রমিক সরকার। এতে সন্দেহ নেই যে রক্ষণশীল সরকার, বিশেষত চার্চিলের নেতৃত্বাধীন সরকারের ব্যবহার হত ভিন্নরকম। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনে যদি ১৯৪৫-এ ভারতকে স্বাধীনতাদানের পক্ষে বেশ জোরালো জনমত তৈরি হয়ে গিয়ে থাকে তার কতখানি গান্ধীর ব্যক্তিগত প্রভাবে হয়েছে? এবং যদি ভারত এবং ব্রিটেন শেষ পর্যন্ত ভদ্র এবং বন্ধুত্বপূর্ণ একটি সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে—যেটা হওয়ারই সম্ভাবনা—সেটা কি আংশিকভাবে এ কারণেই হবে যে গান্ধীর সমুদাত একরোখা, বিদ্বেষবিহীন লড়াই রাজনীতির হাওয়াকে সংক্রামকতামুক্ত করতে পেরেছিল? এসব প্রশ্ন যে আদৌ মনে উঠতে পারে—এতেই ধরা পড়ে তাঁর মর্যাদা। কোনো-কোনো লোকের হয়তো আমাদের মতো গান্ধী বিষয়ে একরকম নান্দনিক বীতরাগ থাকতে পারে, কেউ তাঁর তরফ থেকে সন্ত পদের দাবি অগ্রাহ্য করতে পারেন, (বলা দরকার, তিনি নিজে কখনো এ দাবি করেন নি)। কেউ-বা এমন-কি মহাপুরুষত্বের আদর্শকেই পরিত্যাজ্য বিবেচনা করে অতঃপর অনুভব করতে পারেন যে গান্ধীর মৌলিক উদ্দেশ্যগুলিই ছিল মানববিমুখী এবং প্রতিক্রিয়াশীল : কিন্তু শুধুমাত্র রাজনীতিবিদ হিসেবে, আমাদের কালের ধুরন্ধর রাজনীতিজ্ঞদের সঙ্গে তুলনায় কী অসামান্য পরিশুদ্ধ গন্ধ তিনি ছড়িয়ে রেখে যেতে পেরেছেন।

রচনাকাল ১৯৪৯

জর্জ অরওয়েল

ভাষান্তর মানসী দাশগুপ্ত

সাহিত্য : সঙ্গ-প্রসঙ্গ

নোবেলের চেয়ে বড়ো পুরস্কার পেলেন সুকুমার সেন, অথচ...

খবরের কাগজে খুব ছোট করে খবরটা বেরিয়েছিল মাস দেড়েক আগে। তাও সব কাগজে না। কোনো কোনো কাগজে। সুকুমার সেন রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির ত্রৈবার্ষিক স্বর্ণপদক পেয়েছেন এবং বাকি জীবনের জন্যে সম্মানিত সদস্যপদ। ছাপার হরফের কার্পণ্যে, এবং পুরস্কারটির আর্থিক জৌলুস না থাকায়, সাধারণ পাঠকপাঠিকারা তার গুরুত্ব বুঝতে পারেন নি। বিস্ময়ের কথা, পণ্ডিতেরাও অনেকেই এ ব্যাপারে উদাসীন। উদাসীনতা সর্বগ্রাসী। এবং অসাড়তা চতুর্দিকে। যদি তা না হত, গোটা ভারত জুড়ে তোলপাড় কাণ্ড ঘটত এতদিনে। রেডিও টিভিতে হৈচৈ। কাগজে লেখালেখি। সুনীতিবাবু বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই দক্ষিণ কলকাতা থেকে উত্তর কলকাতায় ছুটে যেতেন, তাঁর এই প্রিয় ছাত্রটিকে অভিনন্দন জানাতে। সংবর্ধনাসভার আয়োজন করতেন। দেশের মানুষকে বুঝিয়ে বলতেন, এই পুরস্কারের কী তাৎপর্য, কী গুরুত্ব।

নোবেল পুরস্কারের মতো রয়েল এশিয়াটিকের এই পুরস্কারটিও আন্তর্জাতিক। পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তের মানুষই পেতে পারেন। তবে ফারাক আছে কয়েকটা ব্যাপারে। প্রথমত, এশীয় বিষয়ক গবেষণার জন্যে এটি দেওয়া হয়। নোবেলের ক্ষেত্রে এরকম বাধ্যবাধকতা নেই। দ্বিতীয়ত, কোনো একটা বিশেষ গ্রন্থ কিংবা গবেষণার জন্যে এটি দেওয়া হয় না। দেওয়া হয় সারা জীবনের নিদ্রাহীন অনুসন্ধান ও 'অসামান্য' মৌলিক গবেষণার জন্যে। অবশ্যই ইংরেজিতে লেখা হওয়া চাই। এটা একটা শর্ত। কোনো আঞ্চলিক ভাষা কিংবা বিস্মৃতপ্রায়-লিপি-নির্ভর গবেষণা হলেও, তার বিবরণ এবং সিদ্ধান্ত ইংরেজিতে হওয়া আবশ্যিক। নোবেল পুরস্কারের ক্ষেত্রেও বোধ হয় এটাই নিয়ম।

তবুও পণ্ডিতেরা নোবেলেরও চেয়ে এশিয়াটিকের এই পুরস্কারটিকে মূল্যবান মনে করেন তিনটে কারণে। (১) এটি অযাচিত এবং অপ্রার্থিত। কোনো প্রাপকই আগাম জানতে পারেন না, তিনি এটি পাচ্ছেন। বিচারকেরাই তাঁর খোঁজখবর করেন, তাঁর মৌলিকতা সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হন। তারপর নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে, সিদ্ধান্তের কথাটি জানিয়ে দেন এমন একটা ভঙ্গিতে—যেন, তাঁকে পুরস্কৃত করে তাঁরা ধন্য। (২) এর নিরপেক্ষতা সম্পর্কে আজ অবধি সন্দেহ জাগে নি কারো মনে। রাজনৈতিক তাৎপর্য একেবারেই নেই। যেমনটি আছে নোবেল পুরস্কার সম্পর্কে সংশয় আর সন্দেহ। (৩) এর পেছনে কোনো বিত্তবানের আর্থিক উশকানি কিংবা প্রলোভন নেই। পণ্ডিতেরা নিজেদের পয়সায় এটি দিয়ে থাকেন। স্বভাবত, যিনি পান তিনি মনে করেন, সারা জীবনের শ্রম, অনুসন্ধান এবং পাণ্ডিত্যের সেরা পুরস্কারটি পাওয়া হল। পুরস্কৃতের সঙ্গে পুরস্কারদাতার সম্মান আর স্বীকৃতি জড়ানো এত বড় পুরস্কারও বোধ হয় খুব বেশি নেই।

নোবেল পুরস্কার যিনি পান, তাঁকে কেমন ভাষায় খবরটি জানানো হয়, আমি জানি না। সেরকম চিঠি আজ অবধি দেখি নি। দেখলুম, সুকুমারবাবুকে লেখা রয়েল এশিয়াটিকের সভাপতি ডানকানসনের ১৩ ফেব্রুয়ারির চিঠি। চিঠির প্রথম অনুচ্ছেদে তিনি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, পুরস্কারটির উদ্দেশ্য কী, কাদের টাকায় দেওয়া হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। তার চেয়েও বড়ো কথা, ঐ একই অনুচ্ছেদে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, আগের বার এই স্বর্ণপদক দেওয়া হয়েছে চীনবিদ্যার এক মহাপণ্ডিত, প্রয়াত ওয়ালটার সাইমনকে।

কেন, কী উদ্দেশ্যে, অধ্যাপক ওয়ালটার সাইমনের এই নামোচ্চারণ? অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, সুকুমারবাবুকে এমন একটা ব্যাপারে আশ্বস্ত করা যে, অযোগ্য কাউকে এ পুরস্কার দেওয়া হয় নি। তিনিও যদি এটি গ্রহণ করেন, সম্মানহানির আশঙ্কা নেই। বিনা মন্তব্যে গোটা চিঠিটাই উদ্ধৃত করছি। সেটা এরকম :

Dear Professor Sen,

As you probably know, the Royal Asiatic Society holds in trust a fund arising from Diamond Jubilee of Queen Victoria in 1897, whose purpose is the award of a Gold Medal in recognition of outstanding scholarship in one of the many fields of Asian Culture, published in English language (or, if by way of publication of original texts, with substantial English Commentary). The intervals between awards must not be shorter than three years, and the last Gold Medal was awarded to the late Professor Walter Simon for his work in the field of sinology.

It gives me great pleasure to write to you, at the instance of the small committee of senior Fellows who have been considering the matter for the last few months under the terms of the Trust, and to invite you to be the next recepient of the Gold Medal. I do hope you will say yes.

The invitation is, in fact, a double one, for the council of the society, on its part, would be most gratified if you would agree also to let your name be added to the list of the Society's Honorary Fellows. I shall be looking forward eagerly to word from you accepting both the Gold Medal and the Honorary Fellowship.

Sd/- D. J. Duncanson,
President

মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গেল সবই। এমন কি এই কথাটিও, যে, ইচ্ছে করলে সুকুমারবাবু এটি প্রত্যাখান করতে পারেন। সে প্রশ্নই ওঠে না। অতীতে এমন ঘটনা ঘটে নি। ভবিষ্যতেও ঘটবে না মনে হয়, যদি বিচারবিভ্রান্তি না ঘটে। একটা ব্যাপারে সামান্য কুয়াশা জড়ানো আছে এখনো। সেটা কুয়াশামুক্ত করা দরকার। সুকুমারবাবুকে এই স্বর্ণপদক দেওয়া হল কেন, তাঁর কোন্ ধরনের কাজ তথা গবেষণার জন্যে?

অনেকেই জানেন, আজীবন তিনি

শেকড়সন্ধানী। আমাদের ভাষা এবং আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের লোকসাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্য, দেবদেবী, এবং পুঁথি-পাথরে লুকোনো ইংগিতের মর্মোদ্ধারে নিদ্রাহীন। কেবল ভারতবিদ্যার না, ইরানোলজি বা ইরানবিদ্যারও রাতজাগা গবেষক। ইতিহাসের বহু লুপ্ত সূত্রের আবিষ্কারক। তাঁর সেই সিদ্ধান্ত এবং গবেষণার ফলাফল বেশির ভাগই লিখেছেন তিনি ইংরেজিতে—কেবল বাঙালি না, ভারতীয় না, আন্তর্জাতিক গবেষকদের কথা মনে রেখে। রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির স্বর্ণপদক পেয়েছেন তিনি সেসবের জন্যে। তাও, এ পর্যন্ত যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের সমান না, দ্বিগুণ। কারণ, আগের বার এই ত্রৈবার্ষিক স্বর্ণপদক কেউ পাননি। ছ বছর আগে পেয়েছেন অধ্যাপক সাইমন। অধ্যাপক সেন ২৭তম প্রাপক।

জানি না, সুকুমারবাবুকে এই প্রাপকের তালিকায় ২৮তম প্রাপক হিসেবে গণ্য করা হবে,—নাকি ২৮ এবং ২৯-তম প্রাপক? আরো একটা ব্যাপারেও তাঁর অনন্যতা স্বীকৃত। যদিও এশীয় সংস্কৃতিতে অসামান্য একটা কিছু করার জন্যে এই পুরস্কার দেওয়া হয়, তবু এ পর্যন্ত এশিয়ার কেউ তা পান নি, তিনিই পেলেন প্রথম। বাকিরা অ-এশীয় এবং ইংরেজ।

মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল ৬০ বছর পূর্ণ হওয়ার সময়, ১৮৯৭ সালে, রয়েল এশিয়াটিকের এই পুরস্কারটি যখন প্রবর্তিত হয়, তখন ভারতের অনেক রাজা-মহারাজা আর্থিক সাহায্য করতে চেয়েছিলেন পুরস্কারটির চারপাশে টাকার ঝনঝনানি ছড়িয়ে দেবার প্রয়োজনে। কিন্তু সোসাইটির সদস্যরা তাঁদের দানে পন্ডিতদের সম্মানিত করাটাকে অগৌরবের মনে করেন। ইংরেজ রাজসরকারের সাহায্যও তাঁরা নেন নি। সেই থেকে সদস্যদের চাঁদায় পুরস্কারটি দেওয়া হচ্ছে। নোবেলের সমতুল মনে করা হচ্ছে। নোবেলের সম্মানে কলঙ্ক লাগে, নানা কারণে, নানা সময়ের সন্দেহজনক সিদ্ধান্তে। কিন্তু এটি অমলিন থেকে যায়।

প্রথম যিনি রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির এই স্বর্ণপদক পান, তাঁর নাম অধ্যাপক ই বি কাওয়েল, প্রাচ্যবিদ্যার ক্ষেত্রে একজন বিশিষ্ট পুরুষ। তারপর খ্যাতিমান এবং অল্প খ্যাতির অধিকারী অনেকেই পেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সংশয় জাগেনি কখনই। সুকুমার সেন নিঃসন্দেহ এ পুরস্কারের পক্ষে সংশয়াতীত পুরুষ।

কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে তাঁর, এই পুরস্কার পাওয়ার পর, সঠিক জানি না। তাঁর ছায়ায় এবং ছোঁয়ায় মাঝে মাঝে এসেছি। চমকে চমকে উঠেছি তাঁর মন্তব্যে। নিজের চারপাশের অন্ধকারটাকেই ঘন মনে হয়েছে। কখনো বা ভেবেছি, ডালপালার নড়াচড়া দেখেই জীবনটা কেটে গেল। ভেতরের রহস্য কিছুই জানি না। আমাদের প্রতিদিনের ভুল উচ্চারণ, ভুল শব্দ এবং ভুল বাক্য ব্যবহারের দিকেও তো তাঁর নজর সমান। যেমনটি কালিদাসের কালের দিকে, ভাষার দিকে, তেমনি আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির জন্মলগ্নের দিকে তাঁর কৌতূহল আজও অবিরাম। স্বভাবত কোনো আর্থিক মূল্যেই তিনি খুশি না। এটা বুঝেছি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেওয়া দশ হাজার টাকার পুরস্কার নেওয়ার সময়। তিনি খুশি হন নি, বিচারকদের পূর্বাপর সিদ্ধান্তগুলির পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখে। চেয়েছিলেন অর্থ নয়, নিঃসংশয় সুবিচার। সেটাই আসল পাওয়া। অন্য সব তুচ্ছ।

সোনালি, রুপোলি অনেক পুরস্কারই তিনি জীবনে পেয়েছেন যোগ্যতার স্বীকৃতি হিসেবে, কাজের নজির দাখিল করে। সেই যৌবনে তিনি বলেছিলেন, কালিদাসের আগে অশ্বমেধের কাল। আজ অবধি সেটাই মেনে চলেছেন সবাই। বলেছিলেন, কালিদাসই মন্দাক্রান্তা ছন্দের আবিষ্কারক। দেশী-বিদেশী পন্ডিতেরা তাঁর এই সিদ্ধান্তের সামান্যতম হেরফেরও ঘটাতে পারেন নি গত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে। ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক পেয়েছেন তিনি দুবার। সেটা সওয়া দশ ভরির। তৃতীয় বারও সে পদক তিনি পেতে পারতেন। গবেষণাপত্র দাখিলেরও উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রবোধ বাগচী বারণ করায় তিনি বিরত হন। স্মরণীয় প্রবোধ বাগচীর সেদিনের সেই অনুরোধ, 'সুকুমারবাবু, আপনি যদি বারবার এই পুরস্কারের জন্যে প্রতিযোগিতায় নামেন, তো, আর কেউ কোনো দিনই ভুবনমোহিনী পাবে না। অন্যদের এবার সুযোগ দিন।'

রয়েল এশিয়াটিকের এই পুরস্কার পাওয়ার পর সেদিন যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করি, তখনো এমন একটা পরিপ্রেক্ষিতের কথা আমার মনে ছিল। তবুও জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'কেমন লাগছে?'

খুব স্পষ্ট এবং কুয়াশাহীন গলায় তিনি বলেছিলেন, 'নোবেল পুরস্কার পেলেও আমি এত খুশি হতাম না।'

তবুও কেন যে তিনি পরের প্রশ্নটায় আমাকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন, কে জানে। আমি জানতে চেয়েছিলুম, 'ভবিষ্যতের গবেষণা এবং বর্তমানের অনুসন্ধান সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?' তিনি বলেছিলেন, 'যার বর্তমান নেই, তার আবার ভবিষ্যৎ কী? কেবল আমাদের দেশের না, বিদেশের এই অবস্থা।'

আমি বিচলিত হয়েছিলাম তাঁর এই মন্তব্যে। এটাও কি তাঁর এই মুহূর্তের মানসিক প্রতিক্রিয়া নয়? কোন্ অন্ধকারে তিনি রেখে যাবেন তাঁর এতদিনের গবেষণা তথা শেকড়সন্ধানের ফলাফল? সেটাই এখন জিজ্ঞাসা।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

অন্নদাশঙ্কর রায়

তিনি শুধু চূড়ান্ত-নান্দনিক শিল্পীই নন, কোনোই সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথের পরে, আমাদের আধুনিক সাহিত্যে নানা-গুণ-সমন্বিত পুরোহিত ও প্রোফেট ; এবং দুই বাংলার বাঙালি হিন্দুমুসলমানদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি। তাঁর বাঙালিত্ব, মন ও মননে, যে প্রসারতা বিস্তার করেছে, ধর্মীয় বোধের ঊর্ধ্বে, মানসিকতায় : দেখতে পাই অন্নদাশঙ্কর রায় বিপ্লবী, সমাজসংস্কারবাদী, যোদ্ধা, নির্দেশক, মেধা ও প্রজ্ঞায় সৃজনশীল, সত্যবাদী এবং বাস্তববোধেই খাঁটি দেশজ। তাঁর ভুবন, তাঁর ব্যক্তি-কেন্দ্রিক নয়, বরং আন্তর্জাতিকতায় স্বদেশী। বা, স্বদেশী আন্তর্জাতিকতায়, মূল্যবোধে, নৈতিক দায়িত্বে সামাজিক প্রতিনিধি, বিশ্বমানবিক। তিনি, অন্নদাশঙ্কর রায়, আমাদের হয়ে প্রতিনিধিত্ব শুরু করেছিলেন চল্লিশের শুরু থেকে, এখনো করছেন, শতাব্দীর এই উপান্তেও। যখন, গোটা দেশ দাউ দাউ করে জ্বলছে ; হত্যা, রাজনীতি, অমানবিক, অসামাজিক, নীতিহীনতায় সবাই দিশেহারা, অন্ধ, বধির, অন্নদাশঙ্কর রায়, দেখতে পাই, এগিয়ে আসেন, কথা বলেন, কলম ধরেন, অবিচারের প্রতিবাদে মুখর হন, যোদ্ধার বেশে সাহসীদের আহ্বান করেন ন্যায় ও সত্যের সপক্ষে রুখে দাঁড়ানোর জন্যে। বলা বাহুল্য, অন্নদাশঙ্কর রায়, এযুগে, তিনিই একক।

এ বছর, ১৯৮৪-তে তাঁর আশীতম জন্মদিবস পূর্তি হলো ১৫ই মার্চ, বৃহস্পতিবার। জন্মেছিলেন উড়িষ্যার ঢেঙ্কানলে, ১৯০৩-এ। পিতা ছিলেন রাজকর্মচারী ঢেঙ্কানলে। অন্নদাশঙ্করই সন্তানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। তিন ভাই দুই বোন। ঢেঙ্কানলেই প্রাথমিক শিক্ষা। ষোলো বছর বয়সে টলস্টয়ের 'তিনটি প্রশ্ন' নামক একটি গল্প অনুবাদ করে প্রবাসীতে পাঠিয়ে দেন। ছাপা হয়। সেই থেকে সাহিত্যে হাতেখড়ি। জীবনে আর কখনো অনুবাদ করেন নি।

র‍্যাভেনশ কলেজ, পাটনা কলেজের ছাত্র। বি-এ পাশ করে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে পরীক্ষা দেন। প্রথমবার পঞ্চম স্থান অধিকার করেও চাকরিতে যোগ দেন নি। দ্বিতীয়বার পরীক্ষায়, গোটা ভারতে আবার প্রথম স্থান। বিলেতে গিয়ে দুই বছর ট্রেনিং। সেই সময় ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ। দেখা হয় রোমাঁ র'লার সঙ্গে। বিলেতে থাকাকালীন 'পথে প্রবাসে' রচনা শুরু। 'পথে প্রবাসে' ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় বিচিত্রায়, ১৯২৭-এ। 'পথে প্রবাসে' প্রকাশকালেই অন্নদাশঙ্কর সাহিত্যের আসরে পাকাপাকি আসন করে নেন। সেই থেকে এখনো তিনি সৃজনশীল।

সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় অন্নদাশঙ্করের অবাধ-মননশীল বিচরণ। নানা অভিজ্ঞতায় তিনি প্রাজ্ঞ। বুদ্ধিযোগী লেখক হিসেবে, তাঁর তুলনা আজ বাংলা সাহিত্যে বিরল। 'দ্বিধাদ্বন্দ্ব' গ্রন্থের ভূমিকায় অন্নদাশঙ্কর রায় জানাচ্ছেন : রোজ পাঁচখানা (এখন আটটি) দৈনিকপত্র আমার পাঠ্য। এ ছাড়া দেশবিদেশের সাপ্তাহিক। না পড়ে আমি কিছু ভাবি নে। না ভেবে আমি কিছু লিখি নে। যা লিখি তা ভাববার মতো করেই লিখি। যাঁরা পড়বেন তাঁরাও ভাববেন এটাই আমি আশা করি। আর কিছু না পারি একদল পাঠককে ভাবুক করে তুলতে পারি। দেশময় যদি একটা ভাবনার স্রোত বয়ে যায় তো বহু সমস্যার সমাধান সুগম হয়। না হলেও আমাদের ভাবনা বৃথা যাবে না। ভাবনাই তো কর্মের বীজ। বীজধান তোলা থাকবে, পরে একদিন তার থেকে গাছ গজাবে।"

তাঁর এই ভাবনা-বোধ শুধু আজকের নয়, পাঠকেরা জানেন। 'দ্বিধাদ্বন্দ্বের' ভূমিকায় আরো লিখছেন : 'মনঃস্থির করতে না পারলে আমরা একবার এপথ ধরব, একবার ওপথ ধরব, তারপর আবার এপথ, আবার ওপথ। শেষে একটা মধ্যপথও পেতে পারি। কিংবা তৃতীয় এক পথ। ভবিষ্যৎই বলতে পারে ভারত কোন পথে তার লক্ষ্যে উপনীত হবে। লক্ষ্যটাই যে কী তাও তো পরিষ্কার নয়। দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন সকলেই একমত ছিলেন যে স্বাধীনতাই লক্ষ্য। কিন্তু স্বাধীনতার পরে কী? মার্কিনমার্কা গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্র? ব্রিটিশমার্কা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র? রুশমার্কা শিল্পভিত্তিক অগণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র? না রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ, যার গুরু গান্ধী"?—"নীরব দর্শক হয়ে কেবলমাত্র মনন লিখন রূপসৃষ্টি প্রভৃতি নিয়ে ব্যাপৃত থাকাও অস্বস্তিকর। আমার হাতে বিশুদ্ধ সাহিত্যের কাজও আছে, আমার হাত খালি নয়। তা সত্ত্বেও আমাকে বিবাদ বিসম্বাদেরও সময় মুখ খুলতে হয়। বিশেষতঃ যখন দেখি দেশ লক্ষ্যহীনভাবে প্রতিহিংসার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে।"

শুধু লেখক হিসেবেই নয়, বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাঁর এই দাবিকে আমরা শিরোধার্য করি, কারণ, স্বচ্ছ বোধ ও ভাবনার স্রোত তিনি বইয়ে দিয়েছেন, দিচ্ছেন একালের এবং আগামী কালের পাঠকের মনে ; আমি মানতে বাধ্য, যে তাঁর লেখনীতে দেশকালসমাজের একটি সামগ্রিক চিত্র-ভাবনা অনায়াসে প্রত্যক্ষ হয়। তিনি নিজেই বলেছেন : "জাতির স্বাধীনতাও মহামূল্য"। ব্যক্তিস্বাধীনতায় তাঁর বিশ্বাস সম্পর্কে নতুন করে কিছু জানানোর নেই। শুধু, জরুরী অবস্থার দিনগুলোর কথা মনে রাখা জরুরী।

একজন মানুষ হিসেবে অন্নদাশঙ্কর রায় কতখানি বিশ্বনাগরিক এবং মানবিক, আমরা দেখেছি। বিভিন্ন সময়ে, নানা লেখায়, হরেক কাজে, বিস্তর বাদ-প্রতিবাদে।

অনেকেই, বাংলা ভাষায় সুদীর্ঘ উপন্যাস লিখে খ্যাতিমান। অনেকেই ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে ইতিহাসকে পুনর্মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন। অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রথম, বাংলা ভাষায় এপিক উপন্যাস লিখেছেন। ছয়খণ্ডে সমাপ্ত 'সত্যাসত্য' উপন্যাসের প্রতি খণ্ডই স্বয়ংসম্পূর্ণ। যেমন অনেকটাই প্রুস্তের সোয়ানস্‌ওয়ে।

অন্নদাশঙ্কর, তাঁর শেষ বৃহত্তম উপন্যাস "ক্রান্তদর্শী" লিখছেন গত ছয় বছর ধরে। ভাবছেন গত পঁচিশ বছর। নোট করছেন গত দশ বছর। মোট চার খণ্ডে সমাপ্য ; প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। দ্বিতীয় খণ্ড ছাপা হচ্ছে। তৃতীয় খণ্ড লিখছেন।

অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর বেশির ভাগ বাংলা গদ্যই ইংরেজিতে লেখেন, প্রথমে। পরে বাংলায়, সরাসরি টাইপরাইটারে। এই অভ্যাস গত পঞ্চাশ বছরের। চাকরি সূত্রে দুই বাংলার বিভিন্ন প্রান্তরে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন। সেই সুবাদে দুই বাংলার হিন্দু-মুসলমানই তাঁর চিরসখা। বাংলাদেশে এখনো তাঁর বিস্তর বন্ধুবান্ধব।

প্রথম সাহিত্যচর্চা ওড়িয়া ভাষায়। আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ। সবুজ-অক্ষর নামে যে সাহিত্যান্দোলন গড়ে তোলেন, এখনো আলোচ্য।

ছড়া লিখতে শুরু করেন বুদ্ধদেব বসুর অনুরোধে, রবীন্দ্রনাথের উপদেশে। 'আধুনিক কবিতা'—ছন্দ ও অন্তমিল ছাড়া—লিখতে তিনি নারাজ, অথচ জীবনানন্দ দাশকে 'শুদ্ধতম কবি' বলে চিহ্নিত করেন।

মন ও মননের দিক থেকে, তাঁর এই আধুনিকতা সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসান একবার প্রশ্ন করেছিলেন : "আপনার মতো একজন আধুনিক লোক পল্লীগানের মধ্যে কি আনন্দ পান'? তিনি বলেছিলেন, 'আমরা শহরের লোকেরা ভাবি আমরাই দেশ, আমরা যা ভাববো তাই দেশের ভাবনা, আমরা যাই বলবো তাই দেশের বক্তব্য। কিন্তু আমরাই তো এই দেশের সবটা নই। আমাদের বিরাট অংশ তো গ্রামে রয়েছে, তাই আমি খাঁটি দেশজ শব্দ শুনবার জন্যে কান খাড়া করে থাকি। এবং সেই খাঁটি শব্দগুলো আমি পল্লীগানের মধ্যে পাই।' [সতত স্বাগত : অন্নদাশঙ্কর রায়। পৃষ্ঠা : ৯৯। সৈয়দ আলী আহসান।]

সাহিত্যের জন্যে অন্নদাশঙ্করের ত্যাগ সর্বজনবিদিত। বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে প্রশাসনিক মনোমালিন্যের ফলে চাকরি থেকে নির্ধারিত মেয়াদের অনেক আগেই অবসর নেন। চলে যান শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনই ছিল তাঁর আরাধ্য আবাস। কিন্তু, একটি পারিবারিক বিপর্যয়ের ফলে চলে আসেন কলকাতায়।

অন্নদাশঙ্করের জীবনে টলস্টয়, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ আদর্শ পুরুষ। টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য তাঁকে আন্দোলিত করে ; গান্ধী, রবীন্দ্রনাথের জীবনচর্চাকে নিজস্ব করে নেন, আবার গান্ধীর নীতির প্রতি সবচেয়ে শ্রদ্ধাশীল। গান্ধীবাদী বলে নিজেকে তুলে ধরেন লেখায়, জীবনেও।

এ বছর, অন্নদাশঙ্কর রায়ের আশীতম জন্মদিবসপূর্তিই শুধু নয়, এই বছর তাঁর সাহিত্য-জীবনেরও ষাট বছর পূর্ণ হলো। এই ষাট বছরে গল্প উপন্যাস কবিতা প্রবন্ধ ছড়া ভ্রমণকাহিনী নাটক মিলিয়ে শতাধিক বই প্রকাশিত। অনুবাদ হয়েছে কয়েকটি, নানা ভাষায়। সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র পুরস্কার ইত্যাদির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পোস্টে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। সাহিত্যের জন্যে পদ্মভূষণ দিতে চেয়েছিলেন ভারত সরকার, প্রত্যাখ্যান করেছেন।

একদা, রবীন্দ্রপুরস্কারের কর্তা হয়েও, এ পর্যন্ত রবীন্দ্রপুরস্কার পান নি। সাহিত্য অকাদেমির পুরস্কার পেয়েছেন 'জাপানে'র জন্যে ; ভ্রমণকাহিনী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক, বিদ্যাসাগর পুরস্কার, আনন্দবাজারের আনন্দ পুরস্কার, আর বিশ্বভারতীর দেশিকোত্তমে ভূষিত হয়েছেন, লেখক হিসেবে, চিন্তাবিদ হিসেবে।

'পি ই এন'-এর ভারতীয় শাখার সহ-সভাপতি, সেই প্রথম থেকেই। আরো আছে। আরো ছোটোখাটো নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত।

এখনো তিনি কর্মঠ, সবল। লেখায় এবং বলায়। তাঁর আশীতম জন্মদিবস পূর্তিতে আমাদের যা করণীয় ছিল, কিছুই করিনি। অথচ আমরা, এই দেশে বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, সাহিত্য সম্পাদক, চিন্তাবিদ বলে খ্যাত। এপার বাংলায় তাঁকে নিয়ে কোনো ভাবনা নেই, কিন্তু ওপার বাংলা বাংলাদেশে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে, বাংলা একাডেমী ছত্রিশজন খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীর স্বাক্ষরিত একটি সুদৃশ্য অভিনন্দনপত্র পাঠিয়েছেন। এবং এদেশের পত্রপত্রিকায় নয়, ঢাকার দৈনিক সংবাদপত্রগুলোতেও, এমন কি বাংলাদেশ সরকারের দৈনিক মুখপত্র 'দৈনিক বাংলা'য় তাঁকে নিয়ে, তাঁর জন্মদিনে বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ভারত এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, আশীতম জন্মদিবস পূর্তিতে বহু টেলিগ্রাম, শুভেচ্ছা-চিঠি এসেছে। অথচ, একমাত্র কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র, বুদ্ধিজীবীরাই প্রায় নীরব। এই নীরবতায় আমরা দুঃখিত নই, বরং লজ্জিত।

দাউদ হায়দার

"আমি বিশ্বাস করি কবিতা এক অন্য ভাষা"

সভ্যতা আমাদের সাবধানী করেছে। আমাদের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে চাপা—কেননা, আমরা বিশ্বাস করি দেওয়ালেরও কান আছে। মুক্তির অর্থ আমরা ভুলে গেছি। পরিচিত শব্দব্যবহারে আমাদের দৈনিক ভাষা হয়ে উঠেছে জোলো। মৃত্যু গুমখুনের মাঝে ছটফট করে আমাদের আত্মা। তবু, আমাদের সেই চেনা শব্দছক থেকে কোনো নতুন আবিষ্কারে যাওয়ার উপায় নেই। একজন দক্ষ কবি, একজন পটু গদ্যলেখক বা একজন উন্মাদ শিল্পীর পক্ষেই একমাত্র এই চেনা গোলকধাঁধা চূর্ণ করা সম্ভব। পঞ্চাশের কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় আমাদের এক আপাতরহস্যময় রত্নগুহার পথ নির্দেশ করেন।

"আমি বিশ্বাস করি কবিতা এক অন্য ভাষা। এক অদ্ভুত সংকেত। আমাদের এখানে দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে অনেকেই এই ভাষায় রপ্ত হয়ে উঠেছেন। কবিতার জনপ্রিয়তা তা-ই প্রমাণ করে। অবশ্য প্রথম দিকে, একেবারে প্রথম দিকে আমি যখন লেখালিখি করি তখন সেরকম কোনো দর্শন......নির্দিষ্ট কোনো সাহিত্যদর্শন আমার ছিল না। আমি কমিউনিস্ট রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলাম। এক ধরনের বামদর্শন নিশ্চয়ই আমার ছিল যেমন, শিল্প মানুষের জন্য। হ্যাঁ, আমি এখনো বিশ্বাস করি মানুষের জন্যই সব শিল্প। শিল্পের খাতিরে কোনো শিল্পের কথা আমি বিশ্বাস করি না।"

একজন কবির প্রতিটি রচনার জন্মর পেছনে থাকে শিহরিত রহস্যকাহিনী। ধারাবাহিক রচনা প্রস্তুতিতে অতীতের শিল্পের ছায়া অনেক সময় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রভাব থেকে কখনো বা জন্ম হয় নতুন পদ্ধতির। শক্তির কবিতার শরীরে মাঝে মাঝেই জীবনানন্দর বোধ কাজ করে। কখনো বা প্রভাব জন্ম দেয় আগন্তুক সৃষ্টির।

"হ্যাঁ, জীবনানন্দর শৈলীকে হয়তো অনেক সময় আমি অনুসরণ করেছি। অত্যন্ত সচেতন এই অনুসরণ। মহাপয়ারে আমিও লিখেছি। কিন্তু আমার লেখা ঠিক কখনোই জীবনানন্দ-প্রভাবিত নয়। আমার রচনায় আকৃতির দিক থেকে আমি রবীন্দ্রনাথকেও অনুসরণ করেছি। কিন্তু তার ভেতর, ঐ শরীরের ভেতর আমি আমার মস্তিষ্ক ঢুকিয়ে দিয়েছি। আমি তো নানান ফর্মেই লিখেছি—এমনকি ছড়ার ছন্দেও।

"আমি চেষ্টা করেছি যাতে পাঠকের সঙ্গে আমার সংযোগ নিবিড় হয়ে ওঠে। তাই আমি অনেকসময় লৌকিক ভাষা—এমনকি স্ল্যাং-ও ব্যবহার করেছি আমার রচনাকে আরো জ্যান্ত করবার জন্য। আর হয়তো একারণেই জনপ্রিয় কবি বলতে আজকাল আমাকেই বোঝায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও ভাষাকে নিয়ে এসেছিলেন মুখের অনেক কাছাকাছি—তবু, হয়তো বয়েসের জন্যই তিনিও যথেষ্ট সমসাময়িক থাকতে পারছেন না।"

পঞ্চাশ ও ষাটের আত্মীয়ক্ষণে বাঙলা সাহিত্যে হাংরি জেনারেশন নামক এক সাহিত্য-আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিল। প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার অন্তর্গত সামাজিক বিশৃংখলা সৃষ্টিও ছিল এই আদর্শের উদ্দেশ্য। স্থিতিশীলতাকে ভেঙেই চেষ্টা করা হয়েছিল কোনো সমান্তরাল পৃথিবী আবিষ্কারের।

"হাংরির সঙ্গে আমার সম্পর্ক একেবারে প্রথম দিকে—মাত্র কয়েক মাস পরেই এই আন্দোলন আমার কাছে বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। এমন লোকজন এই আন্দোলনে ভিড় করেছিল—যারা কেউই ঠিক সে অর্থে কবি বা লেখক নয়—সৃজনশীলতাহীন। ঐভাবে সামাজিকতাকে নষ্ট করা যায় না—আসলে ওরা কেউই ঠিক লেখক নয়।... একমাত্র বাসুদেব দাশগুপ্ত ছাড়া। তা, বাসুদেব যদি হাংরি নাও করতেন তবেও তিনি লেখকই হতেন। অ্যালেন গীনসবার্গরা তখন আমেরিকায় নানান আন্দোলন করছে—এখানেও ওরকম কিছু একটা করার চেষ্টা হয়েছিল। তবে ইমপ্যাক্ট অন্তত আমার কাছে শূন্য। অশ্লীলতাই আধুনিকতা নয়।"

প্রতিষ্ঠান কি তাহলে খুব কাম্য? তা সে রাজভবনের চাকরিই হোক কি কাগজের আপিশে, প্রতিষ্ঠান কি একধরনের অবদমনের কাজ চালায় না কবি বা শিল্পীর স্বাধীনতার শাদা ডানার ওপর? সৃজনশীলতা কি শেষ পর্যন্ত খাঁচায় তার রক্তাক্ত চঞ্চু নিয়ে মুখ থুবড়ে মরে?

"প্রতিষ্ঠানবিরোধিতায় আমিও বিশ্বাস করি। সমস্ত স্বাধীন মানুষ তাই করে। কিন্তু কাগজের আপিশে চাকরি না করে যদি আমাকে অন্য কোথাও চাকরি করতে হত—তাহলেও প্রতিষ্ঠানেই করতে হত। অবশ্য আমি যেখানে কাজ করি সেখানে আমার স্বাধীনতা অবাধ। আমি যখন খুশি যাই আসি। আমায় কিছু বলা হয় না। আমায় ওরা ভালোবাসে। প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হবেই। সমাজের জন্যই হবে। কাগজের আপিশ আর অন্য প্রতিষ্ঠানে সেইদিক থেকে কোনো তফাত নেই।"

বালিতে অজস্র নুড়ি। কেউ যেতে-যেতে ছড়িয়ে গেছে। ঐ রঙগুলির প্রতিফলনের থেকেও বর্ণময় আমাদের মস্তিষ্কের ভেতরকার চিন্তাস্রোতের ঢেউ। সুঠাম নিয়ন্ত্রিত একপেশে কণ্ঠে যন্ত্রমানুষের গলার স্বরই শুধু পাওয়া যায়। সৃজনশীল মানুষের প্রতিটি সৃষ্টিতে থাকে জন্ম আর মৃত্যুর গল্প। চূড়ান্ত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শুরু-হওয়া কোনো যাত্রা শেষ হয় জীবনের সুগন্ধে। আবার ঐ জীবনমুখিতাই ক্রমে এক বিস্মিত শূন্যের ধোঁয়ায় গিয়ে থামে—এইভাবে চলে নিরন্তর যাত্রা।

"হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য থেকে আমার কবিতায় মৃত্যুচেতনা যেমন বারে বারে এসেছে, ঠিক সে রকমই জীবনের প্রতি টান যেতে পারি কিন্তু কেন যাব-তে। এটা একটা জার্নি...ধারাবাহিক জার্নি মৃত্যু আর জীবনের মধ্যে। এই বিরোধিতা আমার লেখায় বার বার এসেছে। বার বার আসবেও। এই যে নানান ধরনের কবিতা আমি লিখেছি, তার মধ্যেও এই অস্থিরতা রয়েছে। আমি অনেক লিখি বলে কবিতা মাঝে-মাঝে হয়ে ওঠে পুনরাবৃত্তিময়, একরকম। কবিতা অনেক লিখি কারণ এটা এখন কথা বলার মতো হয়ে উঠেছে।"

খবরের কাগজ এবং অন্যান প্রচারমাধ্যমগুলির ভেতর দিয়ে আমরা আন্তর্জাতিকতার স্বাদ নিই। আমাদের চাহিদা বিজ্ঞাপনের চাবুকে লাফিয়ে ওঠে। বিপ্লব,-অভ্যুত্থান, হত্যা, ক্যু, যুদ্ধ আর ফ্যাশন প্যারেড-অধ্যুষিত এই সভ্যতায় ঊনবিংশ-শতকীয় রোমান্তিকতার শব পচে উঠেছে।

"সহজকবিত্বে আমি বিশ্বাস করি না। কেননা এখন কবিতা সম্পূর্ণই মস্তিষ্কনির্ভর। এখন ওরকমভাবে কবিতা লেখা, ঐ আগেকার মতো, অসম্ভব। তবে আমি পাঠকদের যতটা সম্ভব সরাসরি আঘাত করবার চেষ্টা করি। যদিও তার পেছনেও অনুশীলন আছে। হয়তো অনেক সময় সেই অনুশীলনের ছাপ রচনাটিতে প্রকাশ্যে থাকে না, তবে তা থাকে নেপথ্যে—প্রস্তুতিতে। কারুর পক্ষেই আজ আর সহজ কবিতা লেখা ঠিক নয়।"

পৃথিবীর রাজনীতিতে এক মহান সংকট চলছে। বিশেষত আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর আজো এক কিম্ভূত অবস্থায় রাত জাগতে হচ্ছে। কপালে ঘাম, বিরক্তি আর অবসাদে ভরে গেছে লক্ষ্মীর অলিন্দ।

"সংসদীয় গণতন্ত্রে আমার একদম বিশ্বাস নেই। সংসদীয় গণতন্ত্রে আমাদের দেশের আজ এই দশা। একমাত্র রক্তাক্ত বিপ্লবই এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারে। নকশাল আন্দোলনেই একটা চেষ্টা হয়েছিল...যদিও কিছু ভুল ছিল, ভুল হত্যাও হয়েছে, তবু ঐ প্রথম একটা চেষ্টা হয়। আমি এই বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা অর্থনীতির দিক থেকেই বলছি যদিও। কারণ, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর বর্তমান অবস্থাটাও খুব আদর্শ নয় বেশ কিছু

দিক থেকে। ওদের হায়ারারকি এক অদ্ভুত পাঁচিল ব্যবহার করে। যেখানে অন্যের চিন্তা ঢুকতে পায় না। আমি মানুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী—সব বই সে পাঠ করবে। সে নিজে ভাববে। আজ যদি ভারতবর্ষে সশস্ত্র বিপ্লব হয় তাহলে আমি দুটো কাজ করতে পারি। এক : যদি ওদের চেষ্টা আর উদ্দেশ্য সৎ হয় তবে হয়তো আমি প্রয়োজন হলে আমার আগের সব লেখা ফেলেও দিতে পারি। না, তাতে আমার কোনো মমতা থাকবে না। আমি দরকার হলে নিজেকে বদলাবার চেষ্টা করব। **দুই :** যদি ওদের উদ্দেশ্যে ফাঁক এবং অবদমন থাকে তবে আমি হব পলাতক কবি। পশ্চিমবঙ্গের বামসরকারের অবশ্য সাংস্কৃতিক শিক্ষাই নেই। অবশ্য আমি এও মনে করি যে অনেক ফ্যাসিস্ত খুব বড় লেখক। জর্জ অরওয়েল তো আমার ভীষণ প্রিয় লেখক। কমলকুমার মজুমদার, যিনি ফিউডাল লেখক একজন, তিনিও খুব প্রিয়। সমাজতান্ত্রিক দেশে নিশ্চয়ই সব লেখা ঢোকবার স্বাধীনতা নেই। আসলে, আমি যে রাষ্ট্রের কথা ভাবছি তা হয়তো—হ্যাঁ—কল্পনা! সলঝেনিৎসিন, আমার খুব প্রিয় তাঁর লেখা। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি তাদের দেশের অবস্থা বাইরে জানতে দেয় না—এটা খুবই খারাপ। "হয়তো লেখকরা প্রায় প্রত্যেকেই গোপনে ফ্যাসিস্ত, মনে মনে ফ্যাসিস্ত, তারা চায় তাদের কথা শুনুক সকলে।"

কোন্ বিশেষ অবস্থায় একজন কবি তাঁর রচনার জন্ম দেন? এর পেছনে যদিও বৈজ্ঞানিকের সুঠাম যুক্তি নেই, তবু কোন্ কোন্ ঘটনা—জীবনযাপনের কোন্ উপাদান তাঁর মননকে উশকে দেয়?

"আনহ্যাপিনেস্—আমার লেখার সোর্স বললে আনহ্যাপিনেসকেই বোঝায়। খুব সুখী অবস্থায় আমি কিছু সৃষ্টি করতে পারি না—তাই হয়তো নেশা আমাকে লেখার দিকে নিয়ে যেত। হয়তো ঐ শারীরিক অসুবিধে আর বিরক্তি আমাকে বাধ্য করত লিখতে। আমার পরিবার অসম্ভব সুখী একটি ইউনিট—মাঝে-মধ্যে যেটুকু অশান্তি তাও আমার জন্য।...অবশ্য এখন মদ একদম খাই না, শুধু বিয়রটা মাঝে মাঝে। ভ্রমণ এখন মদের জায়গা নিয়েছে। আমার মনে হয় স্থির থাকলে আর সাহিত্য হয় না।"

পেশার জন্য শক্তিকে মাঝে-মাঝেই বিজ্ঞাপনের ক্যাপশন লিখতে হয়। আধুনিক পৃথিবীতে বিজ্ঞাপন এক ভীষণ নিয়ামক। পৃথিবীর বহু শিল্পী-সাহিত্যিকের বিচরণভূমি এই বিজ্ঞাপনকে অনেকেই আধুনিকতার শেষ শিল্প বলে অভিহিত করেন। আর অনেকে এই পণ্য-প্রতিযোগিতায় নষ্ট করেন নিজের অস্তিত্ব। প্রাণ হয়ে ওঠে হোর্ডিং-এ আবদ্ধ দ্বিমাত্রিক ছবিমাত্র!

"না—কখনোই আমি বিজ্ঞাপনকে শিল্প ভাবি না। সামান্য বুদ্ধি আর ক্রিয়েটিভিটি থাকলেই ভালো বিজ্ঞাপন করা যায়। এটা আমার কাছে একটা নতুন খেলামাত্র। অনেক খেলার মধ্যে আরো একটা। তবে, আমার আজকাল কবিতা লেখবার আগে সম্পূর্ণ দৃশ্যটা ভেসে ওঠে। তারপর আমি শব্দ দিয়ে তা পূর্ণ করি। এটা আগে ছিল না। এখন হচ্ছে—এই মাস তিন-চার হল। এটা একটা খুবই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন, না?

"আমি যখন লিখতে চাই না, ভালো লাগে না বা পারি না, তখন অনুবাদ করি। মায়াকোভস্কি, রিলকে, নেরুদা, লোরকা, হাইনে বা মেঘদূত। হ্যাঁ, এর মধ্যে নিশ্চয়ই পরস্পরবিরোধিতা আছে। যেমন লোরকা ও রিলকে, আমি দুজনের অনুবাদ করেছি। আমি দেখতে চাইছি বাঙলায় ঐ কবিতাগুলি কিভাবে পুনর্জন্ম নেয়। সাম্প্রতিক বিদেশী কবিতা আমার খুব পড়া হয় না।

"রবীন্দ্রনাথ সবথেকে, সবদিক থেকে আমার প্রিয়। বিশেষত প্রবন্ধ আর গানের জন্য। জীবনানন্দ আর সুভাষ মুখোপাধ্যায় আমার প্রিয় কবি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ি, অমিয়ভূষণ মজুমদার আমার প্রিয় গদ্যলেখক—কমলবাবুর কথা তো আগেই বলেছি। সমসাময়িকদের লেখা আমায় তত টানে না।

"বিকাশ ভট্টাচার্য, প্রকাশ কর্মকার, রবীন মণ্ডল, গণেশ পাইনের ছবি আমার খুব ভালো লাগে। ঠিক সচিত্রকরণ ছবিতে আমার ভালো লাগে না। নীরদবাবু, নীরদ মজুমদার, খুব বড়ো শিল্পী ছিলেন।

লিটল ম্যাগাজিনগুলির মধ্যে কৌরব, ঈগল আর শতভিষা খুব উল্লেখযোগ্য মনে হয়। তরুণদের বা আমার পরবর্তীদের মধ্যে অন্যরকম, আমাদের-মতো-নয় লিখছেন এবং ভালো লিখছেন জয় গোস্বামী, তুষার চৌধুরী, মৃদুল দাশগুপ্ত, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অভী সেনগুপ্ত, অনুরাধা মহাপাত্র, দেবারতি মিত্র—আরো অনেকে, অনেকে।"

এতক্ষণ যে মানুষের সাথে দীর্ঘ আলাপ, যাঁর সমস্ত যুক্তি, প্যাশন, চিন্তার পরস্পরবিরোধিতা, আদর্শের চিত্র, স্বেচ্ছাচার, সুন্দরের প্রেম আমরা শুনলাম তাঁকে কি ধরাবাঁধা নিয়মে পুরস্কার গ্রহণে মানায়?

"না, আমাকে মানায় না আমি জানি। আমি জানি আমার চরিত্রের সঙ্গে এটা খাপ খায় না। যদি দশ-পনেরো বছর আগে এই পুরস্কার পেতাম তবে নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যান করতাম—কিন্তু এখন ওটা নাটক হয়ে যেত।"

শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাম্প্রতিক যে কাজে ডুবুরি, তা হল গীতাকে বাঙলা কবিতায় সরাসরি রূপ দেওয়া। আমরা বিস্ময়ের অপেক্ষায় থাকি। রথের চাকার শব্দে বাতাস ভারি হয়ে এল!

তুহিন চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থসমালোচনা

Islam in Modern India
Amalendu De
Maya Prakashan কলকাতা-৭০০ ০০৯
১০০·০০

গত দশ বছর ধরে ডঃ অমলেন্দু দে বিভিন্ন ইতিহাস-পত্রিকায় যেসব প্রবন্ধ লিখেছেন এবং সেমিনারে যেসব পেপার পড়েছেন সেসবের সংকলন এই গ্রন্থ। অতএব এই গ্রন্থকে লেখকের ভাষায় 'শুড নট বি ট্রিটেড অ্যাজ অ্যান এক্সজসটিভ অ্যাকাউন্ট অন দিস সাবজেক্ট'। এই গ্রন্থের যে-কোনো একটি প্রবন্ধ (অর্থাৎ অধ্যায়) একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ হতে পারত। যেমন প্রথম অধ্যায় দারাশিকোর জীবনদর্শন। দারাশিকোকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদ্যোক্তা হিসেবে বিচার করা হয়েছে। আজকের ভারতবর্ষের সংহতিচিন্তায় দারাশিকো এতই প্রয়োজনীয় যে এই বিষয়ে যত বিচার-বিশ্লেষণ হয় ততই আমাদের মঙ্গল। হিন্দু-মুসলমানের মিলনসাধনায় এমন এক বৌদ্ধিক-মানবিক মানদণ্ড প্রস্তুত করলেন তিনি যে তাঁর কাছে প্রাণ এবং রাজ্য তুচ্ছ হয়ে গেল। বড়ো হয়ে থাকল উপনিষদচর্চা, সুফিবাদ, বেদান্ত দর্শন। ভাবুক দার্শনিক চিন্তাবিদ, সর্বধর্মসমন্বয়বাদী বিবেকী পুরুষ ভারতপথিক দারাশিকোকে পরাজিত হতে হল গোঁড়া সুন্নি মুসলমান, ক্ষমতায় উন্মত্ত মনসবদারের দল এবং রক্ষণশীল মোল্লাতন্ত্রের কাছে। দারাশিকোর মৃত্যুর সঙ্গে শেষ হল আকবরের সেকুলার ভারতবর্ষের। ডঃ দে এই প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন কলকাতার কোনো এক সেমিনারে। সেমিনারের জন্যে এই পেপারটি যথোপযুক্ত হলেও একটি ইতিহাস-গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় হিসেবে আমাদের মনের চাহিদা মেটাতে পারে নি।

এই গ্রন্থে আরো বারোটি অধ্যায়ের মধ্যে আছে মুসলমান সম্প্রদায় কেমন করে একটি পৃথক সম্প্রদায় এবং শক্তি হিসেবে গড়ে উঠল (১৮১৮—১৯০৫); আছে 'রোল অফ বেংগলি মুসলিম প্রেস ইন দি গ্রোথ অফ মুসলিম পাবলিক ওপিনিয়ন ইন বেংগল (১৮৮৪—১৯১৪)'; 'মোঃ আলী ও বিপিনচন্দ্র পালের সংঘাত; ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ (১৯২৬—১৯৩৬); মুসলমানদের দাবি পৃথক হোমল্যান্ড; হক-জিন্না সংঘর্ষ; দ্বিজাতিতত্ত্বকে ফজলুল হকের আক্রমণ থেকে আরম্ভ করে পানজাবের, আসামের সাম্প্রদায়িক ইতিহাস সমীক্ষা।

এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে একটি চিত্তাকর্ষক আলোচনা আছে। ১৯৪৪—৪৭-এর বাঙালি কল্পনার প্রকাশ—অবিভক্ত স্বাধীন বাঙলার জন্যে সংগ্রামের একটি খসড়া। অবিভক্ত স্বাধীন বাঙলার জন্যে সেদিন যাঁরা প্রখর হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা হলেন শহীদ সুরাবর্দি, আবুল হাসেম (ইনি হলেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত লেখক বদরুদ্দিন ওমরের পিতা) এবং শরৎ বসু তো ছিলেনই। নিঃসন্দেহে যে-কোনো বাঙালিকে এই প্রবন্ধটি উত্তেজিত করবে। আমরা সেই যুগে বাংলাদেশ ভাগ কি বন্ধ করা যায় না—এমন একটা চিন্তায় বিভোর হয়ে যেতে চেয়েছিলুম হয়তো-বা। এবং আজও আমাদের এই উত্তেজনা যে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, এমন কথা হলফ করে বলতে পারি না। কিন্তু, আপনি যদি আজকের কোনো বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীকে জিগেস করেন যে অবিভক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ বাস্তব রূপ নিলে সেদিন তিনি কি যথেষ্ট খুশি হতেন? আপনি নিঃসন্দেহে জানতে পারেন তিনি আদৌ এমন ঘটনা ঘটলে আনন্দ পেতেন না। এবং ভবিষ্যতেও পাবেন না। আমি সবিনয়ে নিবেদন করব, আমরা যেন এমন ঐতিহাসিক ঘটনা বিচার করতে বসে যথেষ্ট নিরপেক্ষ ও হৃদয়হীন থাকতে পারি। ১৯৪৭-এর মে মাসে সত্যি সত্যি কি আমরা কোনো স্বাভাবিক ইতিহাস-ধারণা থেকে সার্বভৌম স্বাধীন বাঙলার স্বপ্ন দেখেছিলুম? কিংবা আমরা কেবলমাত্র অবিভক্ত বাঙলার স্বাধীন সত্তার জন্যে কাতর না হয়ে অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতার জন্যে সর্বস্বান্ত হতে পারলুম না কেন? এবং এই তথাকথিত স্বাধীন বাঙলার সাধক সুরাবর্দি ও আবুল হাসেমের রাজনৈতিক-সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইতিহাসবোধ সম্বন্ধে আমাদের ধারণাগুলো যেন যথেষ্ট সঠিক হয়। কারণ আমি একাধিক দেশব্রতী, চিন্তাশীল, সেকুলার হিন্দু বাঙালির সঙ্গে সুরাবর্দি-প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি তাঁদের গলা ভিজে আসে। সুরাবর্দি যথার্থই সেকুলার ছিলেন তাঁরা সত্যিসত্যি মনে করেন। সুরাবর্দি বাঙালি হয়েও বাঙালি ছিলেন না জানি। জিন্নার অনুগামী হিসেবে তাঁর জীবনকর্ম এখনো সবাই বিস্মৃত হয়ে যান নি। একজন বিচক্ষণ রাজনীতিক ব্যক্তিত্বকে তো আমরা হঠাৎই ১৯৪৭-র মে মাসে প্রথম আবিষ্কার করব না। তাঁর অতীত, তাঁর বর্তমান, এমন কি ভবিষ্যৎ দিয়েই তাঁকে নিরাসক্ত মন নিয়ে বিচার করব। জানি, পূর্ব পাকিস্তানের পটভূমিকায় সুরাবর্দি অতীতের সুরাবর্দি নন। সেই সুরাবর্দিকে অভিনন্দন। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের পিতা মোহম্মদ আলি জিন্না সম্বন্ধে অনেকেরই মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। অনেকের বিচারে তিনি এখন ইতিহাসের সাধুপুরুষ বলেই সম্মানিত হচ্ছেন।

এগুলো কিছু ভালো লক্ষণ নয়। আসলে, দেশভাগের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে কংগ্রেসকে সত্যি সত্যি নিজের কাছে হেরে যেতে হয়েছে। কংগ্রেস তো সেদিন ৭নং জন্তর মন্তর রোডের একটা কেবলমাত্র বিরাট বাড়ি ছিল না। সেদিন কংগ্রেস ছিল গোটা ভারতবর্ষের এক খোলামেলা, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-থাকা একান্নবর্তী সংসার যেন। তাই ভারতবর্ষের বহু হিন্দু এবং কম হলেও খুব কম নয় মুসলমান এই দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বিভক্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা মেনে নিতে পারে নি। মুসলমানের একটা বড় অংশ দ্বিজাতিতত্ত্বের ধ্বজা ধরে ছিল বলে স্বল্পসংখ্যক মুসলমান যারা দেশভাগ চায় নি তাদের খবর কেউ সেদিন রাখে নি। মুসলমানরা তো রাখেই নি। হিন্দুরা ধরেই নিয়েছিল যে কোনো মুসলমানই অবিভক্ত স্বাধীন ভারত চায় না। যাঁরা মোহাম্মদ আলি করিম ছাগলার আত্মজীবনী পড়েছেন তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে এই মহাপ্রাণ সেদিন কী আর্তনাদ করেছিলেন। তাই আজ যাঁরা হঠাৎ আবিষ্কার করছেন জিন্না, সুরাবর্দি, আবুল হাসেম আদৌ তেমন মন্দ মানুষ ছিলেন

না, তাঁরা প্রকারান্তরে দ্বি-জাতিতত্ত্বকে মেনে নিচ্ছেন। ওদিকে আজ পাকিস্তানের উকিল, ডাক্তার, বিচারক, সাহিত্যিক, শিল্পীর দল বলছেন জিন্নার দ্বি-জাতিতত্ত্ব এই উপমহাদেশের সর্বনাশ করেছে। আমি অবশ্যই জিন্না-সুরাবর্দির ঐতিহাসিক বিচার চাই। পরিতাপের বিষয়, সে কাজ আমরা এখনও আরম্ভ করি নি। সংবাদপত্রে, সেমিনারে এই চর্চা আরম্ভ হলেও ইতিহাসের গবেষণাগারে সিরিঅস চর্চা এখনো তেমন করে আরম্ভ হয় নি।

এই গ্রন্থের অপর একটি মূল্যবান বিষয় হল ঢাকার মুসলমান সাহিত্য সমাজ। এই অধ্যায়ে ১৯২৭-এ ঢাকায় 'শিখা' গোষ্ঠীর বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনের একটি সারগর্ভ আলোচনা আছে। এই 'শিখা'ই হল মুসলমান সাহিত্য সমাজের মুখপত্র। মাত্র ৫।৬ বছরের জন্য শিখা চিন্তার আগুন জ্বেলেছিল। এই পত্রিকার প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল : জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব। চিন্তার আন্দোলনের এই শিখা যাঁরা জ্বেলেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন আবুল হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ প্রমুখ। এই শিখাগোষ্ঠী বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনে সেদিন ঢাকার পথে নেবেছিল। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ 'জিজ্ঞাসা' ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদক শিবনারায়ণ রায় জিজ্ঞাসার আগামী সংখ্যায় শিখা-গোষ্ঠীকে নিয়ে একটি মননশীল প্রবন্ধ উপস্থিত করবেন। শিখা-গোষ্ঠীর মানবতন্ত্রী, সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর তরুণ অধ্যাপক ধূর্জটি দে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ সম্প্রতি সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করে আমাদের উপকার করেছেন। এ ধরনের সমাজ-সম্পর্কবিহীন বৌদ্ধিক চিন্তার সংগ্রাম পরাধীন দেশে কোন সমাজেই বেশিদিন টেকে না। আর সে কালের মুসলমান সমাজে যে ছ বছর এই 'শিখা' নিবে যায় নি সেই তো পরম সৌভাগ্যের কথা। তবে এই শিখা-গোষ্ঠী সম্বন্ধে আমার একটা খেদ রয়েই গেল। ঢাকার অগ্রগামী মুসলমান সাহিত্য সমাজ সেদিনই বা মুসলমান সাহিত্য সমাজ নামটা বেছে নিয়েছিলেন কেন! যুক্তিসংগত কারণেই তাঁরা পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজ নামটি বেছে নিতে পারতেন। আমার ছোটবেলায় 'মুসলমানী বাংলা' নামক লেবেলটি আমাকে যারপরনেই পীড়া দিয়েছিল।

এবার শের-এ-বাংলা ফজলুল হক প্রসঙ্গ। ফজলুল হক জিন্নার দ্বি-জাতিতত্ত্বকে আক্রমণ করেছিলেন—লেখক এই সংবাদ দিয়েছেন। সংবাদটা সংবাদ হিসেবে সত্য মিথ্যা এ আলোচনায় না গিয়ে বলছি ফজলুল হক বাঙালির খুব প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও বাঙালির মুখ রক্ষা করতে পারেন নি। তিনি কোনদিনই সার্থক রাজনীতিজ্ঞ হতে পারেন নি। সেকালের বাঙালি সমাজ তাঁর কাছে বার বার বহু কিছু প্রত্যাশা করে কেবলই ব্যর্থমনোরথ হয়েছিল। কারণ, ফজলুল হকের ঐতিহাসিক চেতনা কোন দিনই তাঁর সমাজ-ধর্মচেতনাকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। জিন্নার দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, ফজলুল হক হয়েছিলেন তার শিকার। মুসলমান নেতাদের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে তাঁদের কোন আত্মজীবনী পাওয়া যায় না। কোন ডায়েরি পাওয়া যায় না। ফজলুল হককে বিচার করতে হলে নির্ভর করতে হবে তাঁর অসংলগ্ন, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বক্তৃতামালার ওপর। দু-একজনকে বাদ দিলে মুসলমান নেতাদের ইতিহাসের ধারার সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। এসব কিছু শোধ করে দিয়ে গেলেন একটিমাত্র মানুষ। তিনি হলেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ। ফজলুল হক সম্বন্ধে আর-একটি মন্তব্য করব। ফেব্রুয়ারি মাস, ১৯৪৭। তিনি কোন এক জনসভায় গান্ধীকে উপদেশ দিলেন যে তিনি অমুসলমান হয়ে যেন ইসলামের কোন বাণী প্রার্থনাসভায় প্রচার না করেন। কারণ, এমন পরধর্মচর্চায় হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

ফজলুল হক ইতিহাসের কোন দাবি মেটাতে পারেন নি। বরং ধর্মের নামে ধর্মান্ধতার শ্লোগান উচ্চারণ করার সুযোগ বুঝে। জিন্নার হাতে তুলে দিয়েছিলেন বাঙালি মুসলমানদের।

সবশেষে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু প্রমাণ করে হিন্দু পাঠক ভারতীয় ইসলাম সম্বন্ধে আজকাল কতখানি সচেতন হয়েছে। সেই পরিমাণে হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে মুসলমান সম্প্রদায় সচেতন হয়েছে এমন প্রমাণের অপেক্ষায় বসে আছি। এই গ্রন্থ পাঠকসমাজ গভীর উৎসাহ নিয়ে পড়বেন, এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কারণ, ভারতীয় ইসলাম বিষয়টি বৃহত্তর পাঠকসমাজ যতদিন না গভীরভাবে উপলব্ধি করবেন ততদিন ঐ সমাজের অন্য কোন এক অংশে এই সম্প্রদায়কে নিয়ে কোন এক স্বার্থসিদ্ধির খেলা চলতে থাকবে।

হোসেনুর রহমান

রামমোহন-সমীক্ষা : দিলীপকুমার বিশ্বাস। সারস্বত লাইব্রেরী, কলিকাতা-৬, ১৯৮৩। ৬৫ টাকা।

শেকসপীয়র-চর্চা বা রবীন্দ্রচর্চা কথাটি যে অর্থে ঐ মনীষীদের জীবন, কর্ম, রচনা বা চিন্তার আলোচনা প্রসঙ্গে পণ্ডিতসমাজ ব্যবহার করে থাকেন, রামমোহন-চর্চা অভিধাটি তেমন পরিচিত নয়। অথচ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপটেম্বর, ঠিক সার্ধশতবর্ষ আগে, ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলে রামমোহন রায়ের প্রয়াণের পর থেকে এদেশে এবং বিদেশে বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ব্যক্তিত্ব, মনীষা এবং কর্ম সম্বন্ধে। এই রচনাগুলি অবশ্যই নানা ধরনের লেখকের নানা ধরনের রচনা, এবং 'রামমোহন-চর্চা' বললে যে ধরনের 'অ্যাকাডেমিক' গবেষণা বা পেশাদার ঐতিহাসিক মূল্যায়ন বোঝায়, সব তা নয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রথম দিকে রাজা রামমোহন সম্পর্কে নিবন্ধ বা গ্রন্থ যা রচিত হয়েছে, তা তিন ধরনের। প্রথমত, যাঁরা রামমোহনের সমসাময়িক তাঁরা এঁকেছেন রামমোহন-স্মৃতি। দ্বিতীয়ত, রামমোহনের জীবনী রচনা করার উদ্দেশ্য ছিল অনেক লেখকের। এবং তৃতীয়ত রামমোহনের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের বিবরণ দিয়েছেন অনেক লেখক। রামমোহনের মূল্যায়ন অর্থাৎ তাঁর চিন্তার আলোকে এবং কর্মের নিরিখে তদানীন্তন যুগের দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত বিচার করে ইতিহাসে তাঁর প্রকৃত স্থান নির্ধারণ করার কাজ শুরু হয়েছে সবচেয়ে পরে। এই কাজের ফলে পূর্ববর্তী তিন ধরনের কাজের নানা ভুলভ্রান্তি যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি নানা সময়ে ক্রমাগত আবিষ্কৃত হয়েছে বহু অজানা তথ্য। ফলে, রামমোহন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিধি হয়েছে বিস্তৃত। রামমোহন-চর্চার এই ধারা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও আমাদের সমগ্র জিজ্ঞাসা এবং কৌতূহলের নিরসন হয় নি। শতাধিকবর্ষব্যাপী রামমোহন-চর্চায় গতানুগতিক জীবনী রচিত হয়েছে অনেক এবং তাঁর নানা সংস্কার-প্রচেষ্টা নিয়েও লেখা হয়েছে, কিন্তু একমাত্র দার্শনিক মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ছাড়া কেউই তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং মনীষার বহুমাত্রিকতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নি। রামমোহনের প্রয়াণের সার্ধশতবর্ষপূর্তির কালে তাই অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস যখন সবিস্তারে রামমোহনের চিন্তার সমগ্র রূপটি আবিষ্কারের পর আমাদের সামনে তুলে ধরেন, তখন সেই গবেষণার ফসলকে রামমোহন-চর্চায় অমূল্য এবং সম্ভবত শ্রেষ্ঠ সংযোজন বলে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানাতে বাধা দেখি না।

উনিশ শতকের তিরিশের দশকেই দেশে-বিদেশে রামমোহন সম্পর্কে অনেকগুলি রচনা প্রকাশিত হয়। লন্ডনের 'দি এশিয়াটিক জারনাল' কাগজের ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় বাই এ ফ্রেন্ড অব রামমোহন নামে একটি লেখা বের হয় রামমোহনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে। এবং তারপর যথাক্রমে ডাঃ ল্যান্ট কার্পেন্টার, রবার্ট আসপল্যান্ড এবং রেভারেন্ড টি, রীস তাঁদের জীবনীমূলক রচনা প্রকাশ করেন। ডাঃ ল্যান্ট কার্পেন্টার আরেকটি ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থ কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থটির সমালোচনাপ্রসঙ্গে দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম রামমোহন প্রসঙ্গে আলোচনা করেন কিশোরীচাঁদ মিত্র। এগুলি সবই জীবনীমূলক, অপিচ সর্বদা নির্ভরযোগ্যও নয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মেরি কার্পেন্টার তাঁর 'দ্য লাস্ট ডেজ ইন ইংল্যান্ড অব দ্য রাজা রামমোহন রায়' প্রকাশ করেন যদিও এর দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁর পূর্বের সিদ্ধান্তগুলির তিনি বহু পরিবর্তন করেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলা ভাষায় রামমোহনের জীবনী রচনা করেন নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর জীবৎকালেই কয়েকটি সংস্করণের মাধ্যমে গ্রন্থটি পরিমার্জন এবং পরিবর্ধন করেন। তেমনি কুমারী শোফিয়া ডবসন কলেট-লিখিত সুবিখ্যাত জীবনী লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রামমোহন-বিষয়ক প্রথম রচনা লিখেছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজার ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে রামমোহন সম্পর্কে জীবনীমূলক প্রবন্ধ ব্রিস্টলের এক সভায় পাঠ করেছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত ম্যাকসমুলার। এইভাবে ১৮৩৩-১৯০০ —এই সময়ের মধ্যে বহু জীবনীমূলক রচনা প্রকাশিত হয়; তেমনি কিছু স্মৃতিকথাও। এই প্রসঙ্গে আমাদের জেমস সিল্ক বাকিংহাম, তিকতর জাকম, চন্দ্রশেখর দেব, জেমস সাদারল্যান্ড, উইলিয়ম স্যাডাম, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের কথা মনে পড়ে। বর্তমান শতাব্দীতে ১৯০০-১৯৮৩ সময়কালে রামমোহন রায়ের জীবনী রচনার ধারা যেমন অব্যাহত, তেমনি জীবনী রচনার নূতন আকর-উপাদান আবিষ্কার করেছেন বহু গবেষক। জীবনীকারদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ বল, অজিতকুমার চক্রবর্তী, শশিভূষণ বসু, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, মণিলাল পারেখ, আর. এন. সমাদ্দার, অমলচন্দ্র হোম, ইকবাল সিং প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য তার চাইতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রকুমার মজুমদার, রাধাপ্রসাদ চন্দ, অ্যাড্রিয়েন মুর, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ পরিশ্রমী গবেষকদের দ্বারা জীবনী রচনার নানা মালমশলা উদ্ধার।

রামমোহন রায় সম্পর্কে নূতন তথ্য আবিষ্কার যেমন রামমোহন-চর্চার উল্লেখযোগ্য দিক, তেমনি রামমোহন রায়ের মূল্যায়ন-প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য। রামমোহন রায়ের কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব এবং তাঁর কৃতিত্ব আলোচনা করেছেন অনেক লেখক। বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক মতামত। উনিশ শতকে অক্ষয়কুমার দত্ত, কিশোরীচাঁদ মিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল, ম্যাকডোনাল্ড, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ লেখকের নাম এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। এবং বর্তমান শতকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ক্ষিতিমোহন সেন, বিমানবিহারী মজুমদার, যোগানন্দ দাস, অমিয়কুমার সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ অনেক লেখক। তা ছাড়া, আধুনিক যে-সমস্ত গবেষক উনিশ শতক নিয়ে গবেষণা করেছেন তাঁদের অনেকের গ্রন্থেও রামমোহন রায় আলোচিত হয়েছেন। যেমন সুশোভন সরকার, নিমাইসাধন বসু। এ. এফ. সালাউদ্দিন আহমেদ, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, ডেভিড কফ, অরবিন্দ পোদ্দার, বিনয় ঘোষ প্রভৃতির গ্রন্থে এবং বহুবিধ লেখকের নানা প্রবন্ধে—যা পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েও বলা যায় যে আজ পর্যন্ত কোনো লেখকের গ্রন্থেই রামমোহনের চিন্তা তথা মানসলোকের পূর্ণ পরিচয় আমরা পাই নি। জাতীয় জীবনে রামমোহন রায় তাঁর গভীর মননের ছাপ রেখেছিলেন এবং রামমোহনের চিন্তা উত্তরকালে বহুমুখী এবং বিচিত্র প্রভাব বিস্তার করেছিল। অবশ্যই স্বীকার্য যে, তাঁর চিন্তার অনেক স্তর ছিল, অনেক সূত্র থেকে তিনি প্রেরণা লাভ করেছিলেন এবং তাঁর চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর কর্মে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য ভাবধারার সংমিশ্রণে, যুক্তি এবং ভক্তির মিলনে তাঁর চিন্তা গড়ে উঠেছে এবং বহুস্তরবিশিষ্ট এই চিন্তার গহনারণ্যে

বিচরণ কঠিন কাজ। সেই কঠিন কাজে সাফল্য লাভ করে দিলীপকুমার বিশ্বাস রামমোহন-চর্চার ধারায় অমূল্য সংযোজন করলেন।

এই কাজ অত্যন্ত কৃতিত্বের এই জন্য যে, রামমোহন কোনো একটি স্থানে বা গ্রন্থে সুশৃঙ্খলভাবে তাঁর চিন্তার সূত্রগুলি বিবৃত করে যান নি—জীবনে সে সময়ই তিনি পান নি। একাধিক ভাষায় তাঁর টীকা, ভাষ্য, অনুবাদ, বিচারগ্রন্থ ও পত্রাবলীতে এবং সমসাময়িক বিশ্বাসযোগ্য বিবরণে সেগুলি ছড়িয়ে আছে, কোথাও স্পষ্ট বা অস্পষ্ট আকারে। বর্তমান পৃথিবীর সর্বাগ্রগণ্য রামমোহন-বিশারদ অধ্যাপক বিশ্বাস সেগুলি নিজের চেষ্টায় খুঁজে বের করেছেন। তিনি প্রায় পঁচিশ বছর ধরে রামমোহন-বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করার ফলে তা সম্ভব হয়েছে এবং এই পরিশ্রম, অভিনিবেশ এবং গবেষণার ফসল 'রামমোহন-সমীক্ষা'। রাজা রামমোহনের চিন্তার সামগ্রিক বিশ্লেষণ করে লেখক তাঁর বৈশিষ্ট্য সঠিকভাবে নিরূপণ করেছেন।

'রামমোহন রায়ের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে লেখক রামমোহন-মানসের গঠন প্রসঙ্গে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য—উভয় উপাদানই সমান গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণ পরবর্তী অধ্যায়গুলির ভূমিকাস্বরূপ পাঠ করা যেতে পারে, এই অভিমত লেখকের, এবং তা সংগত। হিন্দু ধর্ম তথা সংস্কৃতি, ইসলাম-দর্শন এবং সংস্কৃতি এবং সংস্কৃত-আরবি-ফারসি-ভাষা গভীর অনুশীলনের ফলে রামমোহন দীক্ষিত হয়েছিলেন অসাম্প্রদায়িক, উদার এবং সার্বজনীন এক জীবনদর্শনে। পাশ্চাত্য চিন্তা এবং দর্শনের প্রভাবে, খ্রীষ্টান ধর্ম তথা সংস্কৃতি অধ্যয়নের ফলে রামমোহনের সেই জীবনদর্শন ব্যাপ্ত হল বিশ্বজনীনতার ভূমিতে। সুতরাং প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় উপাদান রামমোহন-মানসে সমান ক্রিয়াশীল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন-মানসের এই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন প্রথম এবং তাঁর অসামান্য ইতিহাসবোধ আমাদের বুঝতে সাহায্য করেছিল যে ভারতবর্ষের চিরন্তন সত্তাকে নূতন যুগে নূতন করে আবিষ্কারের সাধনায় রামমোহন ছিলেন ব্রতী। তিনি একাধারে ভারতপথিক এবং বিশ্বপথিক। দেশপ্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের মধ্যে যে বিরোধ নেই, একথা রামমোহনের উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথ জানতেন এবং তাই তিনি তাঁর 'ন্যাশনালিজম' গ্রন্থে বলেছেন—

"The whole world is becoming one country through scientific facility. . There is only one history—the history of man. All national histories are merely chapters in the larger one."

অথচ সংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীল ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার যখন বলেন, "Rammohan's cosmopolitanism or internationalism may be a greater and higher virtue, but it is different from nationalism", তখন তাঁর ইতিহাসবোধের অভাব প্রকট হয়ে ধরা পড়ে। দিলীপকুমার বিশ্বাসের স্বচ্ছ ইতিহাসবোধ আমাদের প্রামাণিক তথ্য-সহ বুঝতে সাহায্য করেছে যে কিভাবে রামমোহন প্রবহমান ভারতীয় ধারার মধ্যে একটি বিশেষ ধারার সঙ্গে আধুনিক যুগের বিশ্বমানবিক চিন্তা এবং সর্বাঙ্গীণ মুক্তি যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। রামমোহনের ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে লিখিত সেই বিখ্যাত চিঠির একটি পংক্তি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে—"Hence enlightened men in all countries must feel a wish to encourage and facilitate human intercourse, in every manner by removing as far as possible all impediments to it in order to promote the reciprocal advantages and enjoyment of the whole human race."

লেখক গ্রন্থের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ অধ্যায়ে রামমোহনের চিন্তা তথা মনীষার গঠনের তিনটি মৌলিক উপাদান স্বতন্ত্রভাবে সবিস্তারে বিশ্লেষণ করেছেন। এই তিনটি উপাদান যথাক্রমে শাস্ত্র, বেদান্ত এবং পুরাণতন্ত্র। সাধারণত রামমোহন-চর্চায় এগুলি নিয়ে বিশ্লেষণই উপেক্ষিত থাকে। রামমোহনের শাস্ত্রানুশীলন এবং ফলে তাঁর চিন্তার গঠন অধ্যাপক বিশ্বাস অভিনিবেশসহকারে দেখিয়েছেন এবং রামমোহন যে ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক কোনোদিকই অবহেলা করেন নি, তা প্রমাণ করেছেন। বস্তুত, শাস্ত্রবিচারপ্রসঙ্গে রামমোহন একবার বলেছিলেন :

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারেন ধর্মহানিঃ প্রজায়তে।

অর্থাৎ কেবলমাত্র শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে কোনো কিছু সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে আসা উচিত নয়। পূর্বোক্ত ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে লিখিত পত্রেও আছে 'নট রিলিজিয়ন ওনলি বাট আনবায়াসড কমন সেনস'-এর কথা। সুতরাং শাস্ত্র এবং যুক্তি, এই দুইয়ের সামঞ্জস্যবিধানই রামমোহনের ঈপ্সিত ছিল, নিছক ভক্তিতে তাঁর অনীহা সুবিদিত। অবশ্য রামমোহন তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'তুহ্‌ফাৎ-উল-মুওহাহিদিন'-এ যতখানি যুক্তিবাদী ছিলেন, পরবর্তী জীবনে তার থেকে অনেক সরে এসেছিলেন—এ-কথা বলবার চেষ্টা করেছেন কোনো কোনো লেখক। অধ্যাপক বিশ্বাস, অক্ষয়কুমার দত্ত কিংবা কাজী আবদুল ওদুদের মতো না হলেও, এই সিদ্ধান্ত মানতে চান নি। আসলে রামমোহন তাঁর পরিপূর্ণ যুক্তিবাদী মত কিছুটা সংশোধন করলেও কখনো তা পরিত্যাগ করেন নি। উত্তরকালে রক্ষণশীল হিন্দু এবং খ্রীষ্টীয় প্রতিপক্ষগণের সঙ্গে বিচারপ্রসঙ্গে রচিত গ্রন্থগুলিতে তর্ককৌশল হিসেবে রামমোহন শাস্ত্রপ্রামাণ্য স্বীকার করেছেন, কারণ ঐ উভয় সম্প্রদায়ই ছিল অন্ধ শাস্ত্রানুগত। হিন্দু, ইসলাম এবং খ্রীষ্ট—এই তিন ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নপর্ব অধ্যাপক বিশ্বাস আলোচনা করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন যে "বস্তুত প্রত্যাদেশ ও যুক্তির মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে আপন পাণ্ডিত্য ও মনীষা দ্বারা রামমোহন শাস্ত্রচর্চার যে ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন তার প্রসার ও গুরুত্ব অসাধারণ।" (পৃ ৮২) রাজা রামমোহনের চিন্তাধারার গঠন এবং পরিণতির উপর বেদান্তের প্রভাব যেমন খুব বেশি, তেমনি পুরাণ এবং তন্ত্রের প্রভাবও উপেক্ষণীয় নয়। ফলে, উপনিষদের ব্রহ্মসূত্রের সমর্থক রামমোহন মায়াবাদী সন্ন্যাসী নন, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ। অধ্যাপক বিশ্বাস বেদান্ত ও তন্ত্র—উভয় প্রসঙ্গেই প্রণিধানযোগ্য যে আলোচনা করেছেন তার আগে তেমন সবিস্তারে কেউ করেন নি। বৈদান্তিক এবং বেদান্তভাষ্যকাররূপে রামমোহনের মূল্যায়নপ্রসঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন যে রামমোহন "আধুনিক কালে এদেশে বৈদান্তিক চিন্তাধারার যুগোপযোগী নবরূপায়ণের অগ্রদূত।" (পৃ ১৩৬) এই নব বেদান্তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মানবপ্রেম এবং সেবাধর্মকে ধর্মের অঙ্গভুক্ত করা। ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় রামমোহন বলেন : "পরমেশ্বর এবং তাঁহার জনের সহিত অনুবন্ধ অর্থাৎ প্রীতি আর তাদ্ধ্যেয় অর্থাৎ প্রীত্যানুকূল ব্যাপার এই দুই মুখ্য উপাসনা হয়।" অর্থাৎ মানবসেবাই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা। পরবর্তী কালে যা বিবেকানন্দের ভাষায় 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'।

ভারততত্ত্ব (ইনডোলজি) এবং প্রাচ্যবিদ্যা (ওরিয়েনটালিজম) কথাগুলি এখন সমাজ-বিজ্ঞানীদের কাছে সুপরিচিত এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজ এই বিদ্যাচর্চা শুরু করেন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই প্রয়াস বিচিত্রমুখী এবং গভীরগামী হয়। সম্প্রতি ডেভিড কফ সাহেব একটি আদ্যন্ত ভুল মত প্রচার করেছিলেন (এবং তাঁর পরিকল্পনা সফল হয়েছে অনেকাংশে, কেননা বহু ভারতীয় তা বিশ্বাস করে ফেলেছেন) যে ব্রিটিশ পণ্ডিতগণের প্রাচ্যবিদ্যানুশীলন ভারত-সংস্কৃতির প্রাচীন সম্পদ শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুসমাজের সামনে উদ্‌ঘাটিত করে দেওয়ার ফলেই ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় চিত্তজাগৃতি সম্ভবপর হয়েছিল। এটি উভয় অর্থেই ভ্রান্ত, কেননা তথাকথিত নবজাগৃতির এইটি একমাত্র কারণ যেমন নয়, তেমনি প্রাচ্যবিদ্যানুশীলন ভারতীয়রাও করেছিলেন। কোনো ক্ষেত্রে এমন অনেক বিষয়ে যা ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদরা করেন নি। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক বিশ্বাস আনুপূর্বিক আলোচনা করেছেন রামমোহনের প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা এবং ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যানুশীলনকারী পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। কেন জানি না, সংগত এই আলোচনা ডেভিড কফ এড়িয়ে গিয়েছিলেন, বরং জেনে বা না জেনে মন্তব্য করেছিলেন যে ১৮৪২-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনীসভার পক্ষ থেকে রামমোহনের রচনাবলী প্রকাশ করবার পর এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় রামমোহন-বিষয়ক রচনা লেখার পর "ফ্রম দেন অন, রামমোহন ওয়াজ রেগুলারলি ক্রেডিটেড অ্যাজ দ্য সোরস ফর অল দ্যাট ওয়জ মডারন ইন ইনডিয়া।" অথচ এ-বিষয়ে তথ্যের অভাব নেই যে রামমোহন প্রাচ্যবিদ্যানুশীলনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন ; অন্ধভাবে নয় এবং নূতন যুগের আলোকে এবং পাশ্চাত্য গবেষকগণের সঙ্গে তাঁর অনেক পার্থক্য ছিল। তা ছাড়া, অধ্যাপক বিশ্বাস প্রমাণ করেছেন যে রামমোহন "তার ভাষাজ্ঞান, পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রচর্চা, শাস্ত্রের অনুবাদ ও প্রচার সমকালীন পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল এবং তাঁর জীবদ্দশাতেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিল।" (পৃ ২৬৩), তা ছাড়া বেদান্তচর্চায় রামমোহন অগ্রগামী, পুরাণ-তন্ত্রের পর্যালোচনায় পথিকৃৎ এবং ইহুদী, খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মশাস্ত্রের বিচারের ক্ষেত্রে একক। ফরাসী বিদ্বৎসভা 'সোসিয়েতে আসিয়াতিক' ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়কে সম্মানিত বিদেশী সভ্য মনোনীত করেন অথচ কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি প্রধানত রামমোহন-বিরোধী গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ হোরেস হেম্যান উইলসনের বিরোধিতায় একথা চিন্তা পর্যন্ত করেন নি, এই তথ্য একটি আনন্দের, অপরটি লজ্জার। রামমোহনের খ্রীষ্টধর্ম সংক্রান্ত গবেষণাকেও শ্রীবিশ্বাস গবেষণার আলোতে এনে তাঁর অনুশীলনক্ষেত্রের পরিধি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন (পৃ ২৩০-৩৫)। এই বিষয়ে এটাই প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। বিশেষত যে অনলস পরিশ্রম করে এবং গভীর মনোযোগসহকারে রামমোহনের হিব্রু-গ্রীক-ল্যাটিন-সিরিয়াক ভাষাচর্চা, ঐ-সব ভাষায় নানা পণ্ডিতদের রামমোহন-ব্যবহৃত গ্রন্থের বিস্তারিত পরিচয় এবং পাশ্চাত্য ইতিবৃত্তকারদের পরিচয় দিয়েছেন তা আমাদের মুগ্ধ করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে লেখকের প্রতিপাদ্য রামমোহন রায়ের ধর্ম, সমাজ তথা রাষ্ট্রচিন্তার মূল প্রেরণা। অভিপ্রেতভাবেই রামমোহনের চিন্তাসূত্রগুলির একত্র আলোচনা তাঁর জীবনদর্শনের একটি সমগ্র পরিচয় দেবার প্রয়াস। সেই সঙ্গে যুগের প্রেক্ষাপট। লেখকের সিদ্ধান্তগুলি এইরকম। (১) দেশকালগত বিশেষ অর্থে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় চিত্তজাগরণকে 'রেনেশাঁস' বলতে বাধা নেই ; (২) এই জাগরণের সামান্যলক্ষণ হল একালের পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে ভারতবর্ষীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত মূল্যবোধগুলিকে বিশ্লেষণ করে এই সমন্বিত ভিত্তির উপর যুগোপযোগী নতুন ভবিষ্যৎমুখী জীবনদর্শন গড়বার প্রয়াস, এবং এই কাজের সূচনাকারী রামমোহন। (৩) ধর্মবিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা রামমোহনের সংস্কারপ্রচেষ্টার মূলে ক্রিয়াশীল। "ধর্মের সামাজিক রূপটি যে সমাজবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে পরিবর্তনশীল এ বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন"—লেখকের মন্তব্য (পৃ ৩৯৭)। (৪) সমকালীন পাশ্চাত্য চিন্তার ত্রিধারা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল—বুদ্ধিবিভাস-আলোকিত দর্শন (এনলাইটনড র‍্যাশনালিজম), ব্রিটিশ উপযোগবাদ (ইউটিলিটেরিয়ানইজম) এবং নবজাত সমাজতন্ত্রবাদ (সোস্যালিজম)। কথাগুলি সঠিক, কেননা রামমোহন নিজস্ব নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সঙ্গে পাশ্চাত্য উদার এবং সমাজতান্ত্রিক দর্শন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং গণতান্ত্রিক চিন্তার সমন্বয় চেয়েছিলেন। এবং সেই সমন্বয় সার্বজনীন। তবে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্রচিন্তার সঙ্গে অর্থনৈতিক চিন্তা যুক্ত করলে

আরো ভালো হত। ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রতি রামমোহনের মনোভাব নিয়ে বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে লেখক বলেছেন ইংরেজ শাসনের অন্ধকার দিকটি সম্পর্কে সচেতন হয়েও পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র হিসাবে তিনি ব্রিটিশ শাসনকে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে এই শাসন শাশ্বত নয়, বরং নবশিক্ষার ফলেই ভারতবাসী একদিন স্বাধীনতা দাবি করবে। বস্তুত রামমোহনের মৃত্যুর পর ইতিহাসে তাই ঘটেছিল।

হিন্দু কলেজের প্রতিভাশালী তরুণ শিক্ষক হেনরি ডিরোজিও এবং তৎপ্রভাবিত ছাত্রদল 'ইয়ং বেঙ্গল' বাংলা দেশে যে স্বাধীন চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করেন তার সঙ্গে রামমোহনের যোগাযোগ সাধারণত উপেক্ষা করা হয়। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তো তথ্যভিত্তিহীনভাবে বলেই ফেলেন যে একমাত্র তারাচাঁদ চক্রবর্তী ছাড়া কারো উপর রামমোহনের কোনো প্রভাব পড়ে নি। অথচ দিলীপকুমার বিশ্বাস ডঃ মজুমদারের মত সম্পূর্ণ খণ্ডন করেছেন এবং নানা তথ্যের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে রসিককৃষ্ণ মল্লিক, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ সকলের উপরেই রামমোহনের প্রভাব ছিল এবং তাঁরা নানা সময়ে নানা রচনায় রামমোহনের ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। দুঃখের বিষয়, ড. মজুমদার তথ্য-প্রমাণগুলি এড়িয়ে গিয়েছিলেন। রামমোহন এবং তৎপ্রবর্তিত ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে ডিরোজিও এবং তৎপ্রভাবিত ইয়ং বেঙ্গল দলের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ ছিল এবং ছিল বহু প্রগতিশীল প্রশ্নে আশ্চর্য মিল। আরো মিল—এই উভয় গোষ্ঠীর বিপক্ষেই রক্ষণশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীল রাধাকান্ত দেব-রামকমল সেন-হোরেস হেম্যান উইলসন গোষ্ঠী একই রকম সক্রিয় ছিল। একই গোষ্ঠী রামমোহনকে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজে দূরে সরিয়ে দেয় এবং ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়ন করে। আরো দুঃখের বিষয়, ইতিহাসের এই রক্ষণশীল খলনায়কদের বুঝতে পারেন নি যোগেশচন্দ্র বাগলের মতো পরিশ্রমী গবেষক এবং তাঁরই সৃষ্ট রাধাকান্ত-মিথ অনেকটা অনুসরণ করেছেন ডেভিড কফ এবং ভবতোষ দত্ত। যাই হোক, স্বাধীন-বিচারবুদ্ধি প্রয়োগে সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা রামমোহন এবং ডিরোজিও—উভয়ের শিষ্যরাই স্বীকার করেছেন। 'রামমোহন, ডিরোজিও এবং ইয়ং বেঙ্গল' শীর্ষক আলোচনাটি খুবই সুন্দর।

এই গ্রন্থরচনায় অজস্র দলিলপত্র ব্যবহার করেছেন লেখক। আরো উল্লেখযোগ্য, এই আকর-উপাদানগুলির অনেক অংশই অধ্যাপক বিশ্বাসের প্রভূত-পরিশ্রম-প্রসূত আবিষ্কার। গ্রন্থে সে সাতটি পরিশিষ্ট যুক্ত তার সবকটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং কয়েকটি দলিলও এর মধ্যে মুদ্রিত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'রামমোহন রায় এবং ফরাসী বিদ্বন্মণ্ডলী' এবং 'জবাব্-ই-তুহফাৎ-উল-মুওহাহিদিন' শীর্ষক পরিশিষ্ট দুটি। এগুলি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হিসাবেই ধরা যায়। প্রথমটিতে তিনি দেখিয়েছেন, রামমোহনের জীবিতকালেই তাঁর নাম পণ্ডিত এবং শাস্ত্রব্যাখ্যাকার হিসেবে সুদূর ফ্রান্সে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং মাদাম মোব্যার পর তিনিই প্রথম ঐতিহাসিক যিনি এ দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। 'জবাব-ই-তুহ্ফাৎ'এ রামমোহনের রচনা নয় সে-কথা অধ্যাপক বিশ্বাস প্রথম দেখালেন। ব্রিটিশ সমাজতান্ত্রিক (ইউটোপিয়ান সোস্যালিস্ট) রবার্ট ওয়েন এবং তৎপুত্র ডেল ওয়েনকে লেখা যে কয়েকখানি পত্র অদ্যাবধি পাওয়া গেছে (সবই লেখকের চেষ্টায়) সেগুলি এই গ্রন্থের মূল্য বাড়িয়েছে। একই কথা বলা যায় উইলসনকে লিখিত পত্র দুটি, হটনকে লিখিত একখানি, মাউন্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন সংগ্রহভুক্ত পত্র দুটি সম্পর্কেও। 'বাঙলার ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে বেণ্টিককে প্রদত্ত রামমোহন রায়ের স্মারক-লিপি'খানি সম্পূর্ণ নূতন দলিল, যা লেখক নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পোর্টল্যান্ড সংগ্রহে আবিষ্কার করেন। ফলে জ্ঞানচাঁদ, সত্যেন্দ্রনাথ সেন, সুশোভনচন্দ্র সরকার, বি. এন. গাঙ্গুলি এবং ভবতোষ দত্ত (পূর্বে উল্লিখিত ভবতোষ দত্ত নন) লিখিত রামমোহনের অর্থনৈতিক চিন্তার বিষয়ে প্রবন্ধগুলিতে আমাদের জ্ঞাত তথ্যের সঙ্গে নূতন তথ্য যুক্ত হল। সকলেই ১৮৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে সিলেক্ট কমিটির সামনে রামমোহনের সাক্ষ্যকেই রামমোহনের অর্থনীতিবিষয়ক চিন্তার সূত্র হিসেবে ধরেছেন, অধ্যাপক বিশ্বাস-আবিষ্কৃত দলিলটি তার আগের সময়ের (১৮২৯)। 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে প্রসন্নকুমার ঠাকুর' শীর্ষক পরিশিষ্টে লেখক দেখিয়েছেন যে ১৮৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দেই রামমোহন-শিষ্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর 'রিফরমার' পত্রিকায় স্পষ্ট লিখেছেন যে ভারতবাসী ভবিষ্যতে স্বাধীনতা দাবি করবে এবং বাণিজ্যিক স্বার্থ অক্ষুণ্ন থাকার অঙ্গীকার পেলে ইংরেজ হয়তো সে দাবি মেনে নিতে আপত্তি করবে না। ভারতবর্ষ ইংরেজ-কবলমুক্ত হয়ে স্বাধীন হবে এ কল্পনা রামমোহনেরও ছিল (পৃ ১৬-১৯) অধ্যাপক বিশ্বাস তা দেখিয়েছেন। দুষ্প্রাপ্য 'রিফরমার' এবং 'ক্যালকাটা কুরিয়ার' পত্রিকার অংশ উদ্ধার বিশেষ কৃতিত্বের।

বস্তুত অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস আমাদের গবেষকদের মধ্যে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম হিসেবে শ্রদ্ধার আসনে আসীন। প্রথাসিদ্ধ ডকটরেট ডিগ্রীর গবেষণা তিনি কখনো করেন নি, যেমন প্রতি বৎসর প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বিষয়েই গতানুগতিকভাবে কিছু হয়ে থাকে। অথচ একটিমাত্র বিষয়ে তিনি গত পঁচিশ-তিরিশ বছর ধরে গবেষণা করেছেন এবং করছেন, অর্থাৎ তথ্যানুসন্ধানে তাঁর ঘাটতি নেই। তাঁর সেই গবেষণার বিষয় রামমোহন রায় এবং সে সম্পর্কে তাঁর বিচার এবং সমীক্ষা শেষ পর্যন্ত রামমোহন-চর্চায় শ্রেষ্ঠ সংযোজন হিসেবে প্রকাশিত হল। তাঁর কাছে আমাদের রামমোহনের রচনাবলীর সটীক সংস্করণ, রামমোহনের পত্রাবলীর সংকলন এবং রামমোহনের একখানি প্রামানিক জীবনী ভবিষ্যতে কি আশা করতে পারি না? এত সুন্দর গ্রন্থের একখানি কাগজের মলাটের সুলভ-সংস্করণ হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন, যাতে ছাত্রছাত্রী সমেত সকলেই এ-বই সংগ্রহ করতে পারে।

গৌতম নিয়োগী

দুর্দিনের দিনলিপি—আবুল ফজল।

মুক্তধারা, ঢাকা-১ বাংলাদেশ।

মূল্য চল্লিশ টাকা

কখনো কখনো যে নিজের সৃষ্টিকে অতিক্রম করেন স্রষ্টা, এবং লেখার চেয়েও বড় হয়ে দাঁড়ান লেখক—তার প্রমাণ আবুল ফজল। ১৯৮৩ সালের ৪ঠা মে, মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের বিশিষ্ট এক পথিকৃৎ, সাহিত্যিক তথা শিক্ষাবিদ আবল ফজলের মৃত্যুতে বাংলাদেশের স্বাধীন চিন্তা তথা মননশীলতার ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে এক মহাশূন্যতা। সেদেশের সাহিত্যসংসার হারিয়েছে তার বনস্পতিতুল্য অভিভাবককে, এবং দেশের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন হারিয়েছে তার অগ্রসেনানীকে।

কিন্তু আফসোস এই যে প্রয়াত আবুল ফজলের পরিচয় এই দেশের বিদগ্ধমহলের বাইরে সংস্কৃতি-মনস্ক মানুষের কাছে অজ্ঞাতই থেকে গেছে। নাহলে হয়তো এ-দেশের সমাজসচেতন সাহিত্যরসিক মানুষও অনুভব করতেন—আবুল ফজল ছিলেন তাঁর আত্মার দোসর। এই বাংলার মুক্তমনা বুদ্ধিজীবীও ওই বাংলার সৎ শিল্পী তথা লেখকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বলতেন: "আজ এই মূল্যবোধের অবক্ষয়ের যুগে যখন সাহিত্যিক তথা বুদ্ধিজীবীদের অনেকে বিলাস-ব্যসনে মগ্ন হয়ে দেশের মানুষের কথা ভুলতে বসেছেন কিংবা সংকটের কল্পনায় ম্রিয়মাণ হয়ে ভীরুতার বিবরে আত্মগোপন করেছেন, সে সময়ে আবুল ফজলের ইন্তেকাল একটি অপূরণীয় ক্ষতি।" [দৈনিক আজাদীর সম্পাদকীয় ৬ই মে, ১৯৮৩]

কিন্তু তা হবার নয়। কারণ, দেশভাগ হওয়ার সাথে সাথে দুই বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির সংসারের মাঝখানে গড়ে উঠেছে এক দুর্ভেদ্য লৌহযবনিকা।

ষাটটিরও বেশি গ্রন্থের রচয়িতা আবুল ফজলের পদচারণা সাহিত্যের সকল শাখায় স্বচ্ছন্দ, অবাধ। উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ আর আত্মজীবনীমূলক রচনার ফসলের ডালিই যে শুধু সাজিয়েছেন তিনি তা নয়—তার সঙ্গে মিটিয়েছেন যুগের দাবি এবং পালন করেছেন তাঁর সামাজিক দায়িত্ব। স্বাধীন চিন্তা এবং মুক্তবুদ্ধির আদর্শের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ লেখক আবুল ফজল কলম ধরেছেন ধর্মীয় কুসংস্কার, গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িকতা তথা যাবতীয় সংকীর্ণতাবাদী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে। সারা জীবন নিরলস সংগ্রাম করেছেন একনায়কতন্ত্র এবং মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে। "জাতির বিবেক' আবুল ফজলের সাহস এবং সততাকে স্মরণ করে তাই বলা হয়: 'আমাদের ভয়ার্ত শৃঙ্খলিত মুহূর্তেও তিনি ছিলেন সাহসের বার্তাবাহী। একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের মর্মবাণী তাঁর মতো কে এমন স্পষ্ট করে উচ্চারণ করেন যে "একুশ মানে মাথা নত না করা।" একথাটা তিনি এমন সময় বলেছেন যখন আমাদের ভীতিলাঞ্ছিত দিনগুলোতে সাহসের সমাচার কেউ শোনাতে এগিয়ে আসেননি।" [দৈনিক 'সংবাদে'র সম্পাদকীয় ৬ই মে, ১৯৮৩]

আবুল ফজলের মতে, দেশ দুনিয়া রাষ্ট্র সংস্কৃতি—অর্থাৎ যা-কিছু মানুষের জীবন এবং চেতনার অঙ্গীভূত—তার সব কিছু নিয়ে লিখতে হবে। না হলে এ-যুগের লেখকের বিবেকী দায়িত্ব পালন করা হয় না। কিন্তু পাকিস্তানের শ্বাসরোধকারী পরিবেশে শিল্প-সাহিত্য কেমন যেন আড়ষ্ট। কারণ, '...পাকিস্তান আন্দোলন ও তার সাফল্য কি জানি কেন আমাদের প্রতিভাবান শিল্পীদের মন-মানসে কেন নতুন জোয়ার আনতে পারে নি, অন্তরের অন্তস্থলকে গভীরভাবে নাড়া দেয়নি কারো। খুলে যায় নি তাদের চোখের সামনে সাহিত্য-শিল্পের কোন নতুন দিগন্ত।' পাকিস্তানের শাসককুলকে তিনি শিল্প-সাহিত্যের অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় বলে শনাক্ত করেন। তিনি বলেন, "স্বাধীনতার পর থেকেই কি লিখলে, কেমন করে লিখলে শাসক আর প্রতিক্রিয়াশীলদের বিষ নজরে পড়ব না, এ আমাদের এক দুশ্চিন্তা আর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।" (সাহিত্যের সমস্যা ও সমাধান)

শাসকশ্রেণীর ভ্রূকুটি সত্ত্বেও কিন্তু তিনি দেশ, কাল এবং জগতের প্রতি উদাসীন, সমকালীন শিক্ষা, ধর্ম এবং রাজনীতি বিষয়ে বক্তব্যহীন থাকতে রাজী ছিলেন না। বলা যেতে পারে, সব বিষয়েই তিনি মুখর, এবং ভাষার প্রসাদগুণে তরতাজা, স্বাধীন চিন্তার আলোয় ঝলমল। তাঁর প্রতিটি রচনায় পড়েছে এক বিবেকী তথা সমাজসচেতন মনের ছাপ। যা-কিছু অন্যায় আর অশুভ, তার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার। শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্মব্যবসায়ীদের অবাঞ্ছিত খবরদারিকে তিনি দ্বিধাহীন ভাষায় নিন্দা করেন। কারণ তিনি জানেন, "ধর্ম আর সংস্কৃতি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার...যাঁরা সংস্কৃতিচর্চাকে সব সময় ধর্মের আলখাল্লা পরাতে চান তাঁরা ধার্মিক যেমন নন তেমন নন সংস্কৃতিসেবীও।" [সংস্কৃতি ও মুক্তচিন্তা]

তেমনি তিনি বিশ্বাস করতেন ধর্মীয় আবিলতাকে প্রশ্রয় দিলে দেশের রাজনৈতিক চিন্তাও স্বচ্ছ হতে পারে না। এ বিষয়ে তাঁর উক্তিগুলি ঋজু এবং অকপট। যেমন, "ঐক্যের নামে যে-ধর্মের উল্লেখ করা হয়, তা অতীতে সব দেশেই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে।" [পাকিস্তানী জাতীয়তার বুনিয়াদ]

অতএব, "ধর্মভিত্তিক রাজনীতি স্রেফ ভাঁওতা ছাড়া কিছু না। ......এ রাজনীতি মানুষকে মেলায় না, বরং বন্ধুকে শত্রু বানায়। পাকিস্তানে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি প্রশ্রয় পেলে তা বহুদেশের মুসলমানের জন্যও এক অকারণ বিপদ ডেকে আনবে।" [ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিপদ] বিপদ]

তিনি যে শুধু দেশজ এবং ধর্মীয় সব গোঁড়ামি আর সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বেই নন, তাঁর মননের আকাশে সমগ্র বিশ্ব বিধৃত। তিনি স্বদেশী-বিদেশী সব পথ আর মতকে খোলামনে যাচাই করে নিতে চান। তিনি বলেন: "আমরা শুধু পাকিস্তানের নয়,

সারা বিশ্বেরও বাসিন্দা। যে-বিশ্বের সঙ্গে লেন-দেন ছাড়া কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই আজ উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই বিদেশী 'ইজমে'র কথাটা আজ মূল্যহীন। ...ইসলামতন্ত্র যদি সমাজতন্ত্র থেকে শ্রেষ্ঠ হয় তা হলে আপন শ্রেষ্ঠত্বের জোরেই তা সমাজতন্ত্রকে পরাভূত করে ছাড়বে। বলা বাহুল্য ডান্ডার জোরে কোন কিছুরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। সূর্য জানে যে সে চেরাগের চেয়ে অনেক বড়, তাই চেরাগটাকে থাবা মেরে নিবিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন সে বোধ করে না।" [বিদেশী 'ইজম' কথাটার অর্থ কী]

আবুল ফজল কোনো দল বা গোষ্ঠীর মুখপাত্র হয়ে এসব কথা বলেন নি। তাঁর ভাষায়, "আমি যে-মঞ্চ থেকেই কথা বলি না কেন—কারো মুখপাত্র হয়ে কথা বলি নি আজ পর্যন্ত। সব সময় আমার নিজের বক্তব্যই আমি বলেছি। আমার বক্তব্যে আমার ভাষায় আমার বিশ্বাস আমার মতামতই প্রকাশিত হয়েছে।" [ছাত্ররাজনীতির ভয়াবহ পরিণতি]

আবুল ফজল তাঁর দেশ আর কালের প্রায় প্রত্যেকটি ঘটনা ধরে রেখেছেন একাধিক স্মৃতিচারণে। এসব স্মৃতিকথার মধ্যে রয়েছে, 'রেখাচিত্র' (১৯৫৬), 'লেখকের রোজনামচা' (১৯৬৯) এবং 'দুর্দিনের দিনলিপি ও অন্যান্য চিন্তা' (১৯৭২)।

১৯৭১ সালের ১লা জুলাই থেকে ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ছ মাসের দুঃসহ অভিজ্ঞতার ঝাঁপি এই রোজনামচাটি। আবুল ফজলের পলাতক জীবনের দিনরাত্রি, তাঁর অস্থায়ী ঠিকানা, আশ্রয়দাতা, বন্ধু-পরিজন, দেখা-অদেখা আর চেনা-অচেনা মিলিয়ে মনে হয় গোটা দেশ ঠাঁই পেয়েছে এই দিনলিপিতে। তখন তাঁর দেশ এবং দেশের মানুষ এক যুগ-সন্ধিতে দাঁড়িয়ে। ১৯৭০-এর ডিসেম্বরে সারা পাকিস্তানে নির্বাচনে ঘটল আওয়ামী লীগের বিপুল জয়। ১৯৭১-এর ৩রা মার্চ আহূত হল জাতীয় পরিষদের অধিবেশন। কিন্তু ঘটনাস্রোত বাঁক নিল অন্যদিকে—গেল না প্রত্যাশিত পরিণতির দিকে। আবুল ফজলের ভাষায়, "২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় এহিয়া খাঁ তাঁর কুখ্যাত ভাষণ দিলেন। ঐ ভাষণে ঘোষণা করলেন দেশের 'ভাবী প্রধানমন্ত্রী' শেখ মুজিব 'দেশের শত্রু', 'রাষ্ট্রদ্রোহী' আর দেশের সর্বপ্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠান। সব রকম রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অবৈধ আর আরোপিত হল পত্রপত্রিকার উপর কড়া সেন্সার। সামরিক কর্তৃত্ব নিল কঠোরতম রূপ। সঙ্গে সঙ্গে টিক্কা খাঁ লেলিয়ে দিলেন সৈন্যবাহিনীকে পূর্ববাংলার নিরস্ত্র জনতার উপর। রাত্রি এগারোটায় শুরু হল ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম অভিযান।" [পৃ ২৪]

এভাবে সৃষ্টি হল দেশ আর জাতির জীবনে এক সর্বাত্মক দুর্দিনের পটভূমি। এবং অগণিত গৃহহারা ভীতসন্ত্রস্ত মানুষের মিছিলে স্বয়ং লেখককেও শামিল হতে হল। ২৫শে জুলাই তিনি লিখছেন, "আজ চার মাসেরও বেশি আমি আর আমার পরিবারবর্গ গৃহছাড়া।" তাঁর ঘর ছাড়ার প্রকৃত কারণ উল্লেখ করে বলছেন, "পশ্চিম পাকিস্তানী জল্লাদদের ভয়ের চেয়ে দেশের মানুষের বিরুদ্ধে দেশের মানুষের 'লাগানোর' ভয়ও কম যায় না। ...সবাই শঙ্কিত : কে কখন কার বিরুদ্ধে লাগিয়ে বসে। আমার নিজের বাড়ি ছাড়ারও বড় কারণ এ আতঙ্ক। ......আমি ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিরোধী। ...আমার ভয়টা তাই ধর্মভিত্তিক রাজনীতিওয়ালাদের কাছ থেকেই বেশি।"

এর আগে ১লা জুলাই তারিখটি কেটেছে এক নীরব যন্ত্রণা আর স্মৃতি মন্থন করে। দিনটি তাঁর জন্মদিন। কিন্তু বড়ই নিরুৎসব, দুঃসহ এই জন্মদিন। অনুভব করছেন তিনি—বাংলাদেশে বন্দুক বেয়নেটই যেন আজ একমাত্র সত্য। প্রতিদিনই কত বন্ধু আর স্নেহভাজন যে "এ সার্বিক বর্বরতা আর মনুষ্যত্বহীনতার বিভীষিকার অন্ধকারে হারিয়ে গেছে চিরকালের মতো। আর তারা ফিরবে না আপন জনের কাছে।"

"দেশের জীবনে আজ মৃত্যুই একমাত্র ঘটনা। আজ পূর্ববাংলার সবচেয়ে শ্রুত সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত শব্দ মৃত্যু।"

"চারদিকে আজ মৃত্যুর সংবাদ, খালি কান্না আর হাহাকার। এমন দিন নেই এমন কেউ আসে না যে কারো না কারো মৃত্যুসংবাদ দিয়ে না যায়। দিনের পর দিন কত লাশ যে এখানে ওখানে পড়ে থাকে দীর্ঘকাল ধরে, এ জঘন্যতম পাইকারী নরহত্যার বিরুদ্ধে নীরব অভিশাপ ফেলে শেষকালে কিনা শৃগাল-কুকুর আর কাকশকুনের ভক্ষ্য হয়ে হারিয়ে গেছে চিরতরে। ...জীবিতের প্রতি যেমন তেমনি মৃতের প্রতিও এত চরম অবহেলা—মুসলমান লাশের প্রতি মুসলমান ঘাতক এমন ব্যবহার করতে পারে এ ভাবাই যায় না।" [পৃ ১০৭]

"আজ পূর্ববাংলায় মৃত্যু আছে অজস্র কিন্তু জানাজা নেই, দাফন নেই। হয়তো কোথাও আছে গণ-কবর। গণ-কবর কথাটা বাংলাভাষায় নূতন, হানাদারদেরই অবদান।" [পৃ ১০৮]

রোজনামচার পাতায় পাতায় শুধু হত্যা আর হত্যা। গণ-হত্যার নিরলংকার বিবরণ পড়তে পড়তে কখনো গা ঘিন ঘিন করে ; আবার কখনো শিউরে উঠতে হয়। মনে হয় যেন কোনো এক অলৌকিক কারণে সভ্যতা এক লাফে পাঁচশ বছর পিছু হটে গেছে—আর আমরা ফের পৌঁছে গেছি মধ্যযুগে—যখন এসব ঘটত বলে শোনা যায়। দিনলিপির পাতায় নিহতদের নাম-ধাম পেশা পড়ে মনে হয় এই হত্যালীলারও একটা প্যাটার্ন রয়েছে। হত্যাকান্ড চলেছে পরিকল্পনা-মাফিক। বাছাই-করা বুদ্ধিজীবীদের আর প্রভাবশালী হিন্দুদের খতম করা হচ্ছে। মুনীর চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, শহীদুল্লাহ কায়সার, সিরাজউদ্দিন, ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেব, গোলাম মোস্তাফা প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের খুন করা হয়েছে। পূর্ববাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির ভান্ডার যাঁদের দানে পুষ্ট, আজ তাঁরা পশ্চিম-পাকিস্তানী জল্লাদদের আক্রোশের শিকার। আবুল ফজল বলছেন, "বুদ্ধিজীবীদের শুধু সন্দেহ নয়, মনে হয় মনে মনে ভয়ও করে থাকে। তাই চায় ওদের নিষ্ক্রিয় আর নিশ্চিহ্ন করে দিতে। কারণ রাজনীতিক উচ্চাভিলাষীদের ফাঁকি দেওয়া সহজ কিন্তু সৎ বুদ্ধিজীবীদের ফাঁকি দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। ক্ষমতার উচ্ছিষ্টের প্রতি সৎ বুদ্ধিজীবীদের রয়েছে চিরন্তন ঘৃণা।" [পৃ ৬২]

কাফের হিন্দুদের প্রতি পাকিস্তানী সৈনাদের আক্রোশ যেন কোনো বাধা মানতে চায় না। পশ্চিম পাকিস্তানের মতো তারা যেন পূর্ববাংলাকেও হিন্দুহীন করতে চায়। "পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তর জনতা অর্থাৎ সাধারণ মানুষ আর বুদ্ধিজীবীরা কখনো হিন্দুবিরোধী ছিল না। বহু প্রচার আর প্রচারণায়ও তা করে তোলা সম্ভব হয় নি।" কারণ তারা জানে, "এদেশে বেসরকারী শিক্ষার ক্ষেত্র আর পরিবেশ হিন্দুদের সৃষ্টি...এই সমাজই জুগিয়েছে অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাবিদ আর শিক্ষানুরাগী—এঁদের সহায়তা না হলে পূর্ববাংলায় এত স্কুল কলেজ কিছুতেই গড়ে উঠতে পারত না।" [পৃ ১২২-২৩]

অথচ নিছক হিন্দু বলেই ঢাকার সুবিখ্যাত সাধনা ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ নব্বই বৎসরের বৃদ্ধ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা আর মিরজাপুর হাসপাতালের পরিচালক রণদাপ্রসাদ সাহাকেও নাকি পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর জল্লাদেরা হত্যা করেছে। নিহত হয়েছেন প্রবর্তক সংঘের সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বীরেন্দ্রলাল চৌধুরী এবং সুবিখ্যাত আইনজীবী, প্রাক্তন মন্ত্রী অশীতিপর বৃদ্ধ ধীরেন দত্ত।

আবুল ফজলের আর্ত জিজ্ঞাসা : "স্ব স্ব ব্যবসাকর্মে রত এসব বয়োবৃদ্ধদের মেরে ফেলার কি অর্থ? তাতে করে কি ফায়দা? তবে কি স্রেফ হিন্দু বলেই? এ যদি সত্য হয় তাহলে ইসলাম আর পাকিস্তানের জন্য এর চেয়ে কলঙ্কের কথা আর হতে পারে না।" [পৃ ১৩৬]

শুধু কি খুনখারাপি! তার সঙ্গে চলেছে অবাধ লুটপাট। প্রতিবেশী হিন্দুদের ধনসম্পত্তি লুট করছে প্রতিবেশী মুসলমান। তাঁর চোখের সামনে এ কী ঘটছে! ২৯শে জুলাই রোজনামচায় তিনি লিখছেন : "এ দুর্দিনে এও আমার মানসিক শান্তিভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিম-পাকিস্তানী সৈন্যদের বর্বরতা কালক্রমে একদিন হয়তো ভুলে যাব কিন্তু নিজের দেশের মানুষের বিকৃত ক্ষুধার এ যে এক অবিশ্বাস্য ক্রুর রূপ দেখলাম তা কি কখনো স্মৃতি থেকে মুছে যাবে? এ লোভের ফাঁদে কে ধরা দেয় নি? ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, কুলি-মজুর-চাষী আলেম ফাজেল—কেউ কি বাদ গেছে, এমনকি কোনো কোনো আলেম (মসজিদের ইমামও নাকি) জনসভায় দাঁড়িয়ে ফতোয়া দিয়েছেন : হিন্দুদের ধন-সম্পত্তি 'মালে গনিমৎ'। ওসব লুট করায় কোন গুনাহ্ নেই, এ সম্পূর্ণ 'জায়েজ' কাম অর্থাৎ শাস্ত্রসম্মত। যদি কোনো ধর্মে বা শাস্ত্রে এমন নির্দেশ থাকে তাহলে সে ধর্ম আর শাস্ত্রকে আমি ধর্ম আর শাস্ত্র নামে অভিহিত করতে রাজি নই। ...প্রয়োজন হলে আমি ধর্মহীন কিংবা নাস্তিক হয়ে নরকে যেতেও রাজি কিন্তু অমন নির্দেশ আমার জন্য নৈব-নৈব চ।" [পৃ ৪৬]

এই অধঃপতন আর বিকৃতির উৎসভূমি যে মুসলমান সমাজ, তার আসল চেহারা এতদিন পর যেন তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠল। উপলব্ধি করছেন তিনি, "আমাদের সমাজের চেহারা আজ হতশ্রী, জীর্ণশীর্ণ আর লাবণ্যহীন। যে শাস্ত্রে নতুন আলো প্রবেশের সব পথ রুদ্ধ, সে শাস্ত্রনির্ভর আর শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত বলেই আমাদের সমাজের এ দশা। কে উড়াবে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা? শাস্ত্রের এ দুর্ভেদ্য প্রাচীরে ফুটো করে দিয়ে কে বইয়ে দেবে তাতে নতুন প্রাণবায়ু?

"অথচ বিদ্রোহী কবি নজরুল ছাড়া আমাদের সমাজে তেমন কোনো বিদ্রোহীর জন্ম হয় নি। অথচ ডগমা বা অন্ধবিশ্বাস-নির্ভর সমাজে সবচেয়ে-প্রয়োজন সত্যিকারের বিদ্রোহীর। শুধু কর্মে নয়, চিন্তায়ও যিনি হবেন দুঃসাহসী।" [পৃ ৬৫-৬৬]

দিনের পর দিন যায়। মাসের পর মাস। দুর্গাপূজা এল এবং গেল। শোনা গেল না একটাও ঢাকের বাজনা। ঈদ এল এবং গেল। দেখা গেল না কারো মুখে হাসি। সারা দেশ জুড়ে নেমেছে মধ্যাহ্নে অন্ধকার! নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। বেদনাতুর আবুল ফজলের মনে হচ্ছে, "সব আশ্রয় হারানোই যেন আমাদের নিয়তি। ঈশ্বরকে হারিয়েছি। হারিয়েছি মানুষকে। দেশে আজ কোনো লেখা নেই, সাহিত্য নেই, শিল্প নেই। আমাদের মন আজ অবলম্বনহীন। অবিশ্বাসের তরীতে এক অবিশ্বাসের সোওয়ার যেন আমরা বাংলাদেশের এযুগের লেখকরা।" [পৃ ৯৯]

কিন্তু তাঁর এই বিহ্বলতা ক্ষণিকের। কারণ, তিনি জানেন, এই কঠিন রক্ত- আর অশ্রুভরা অভিজ্ঞতা থেকেই তো জন্ম নেয় মহৎ কাব্য আর বিয়োগান্ত নাটক। একদিকে নির্মম অত্যাচারের বীভৎসতাও যেমন সত্য, তেমনি সত্য একটা জাতির নবজন্ম। পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পী-সাহিত্যিকদের ডাক দিয়ে তিনি বললেন : "আমাদের ঐ রক্তাক্ত ইতিহাস তরুণদের মুখের দিকে চেয়ে আছে। একে ভাষা দিতে হবে, কাগজে কলমে রাখতে হবে তার স্বাক্ষর, রঙে তুলিতে দিতে হবে অমরতা।" [পৃ ১৭৫-৭৬]

বাংলার বিবেক আবুল ফজলের দিনলিপি এক যন্ত্রণাবিদ্ধ সময়ের প্রতিবিম্ব। তিনি যা দেখেছেন, যা শুনেছেন, যা অনুভব করেছেন তা বিশ্বস্তভাবে লিখেছেন। ভাষা তাঁর মেদহীন ঝরঝরে। লেখার ছত্রেছত্রে অকৃপণভাবে ঢেলে দিয়েছেন দুঃখ ক্ষোভ জ্বালা। তাঁর দিনলিপিতে প্রতিরোধের কাহিনী নেই—নেই মুক্তিবাহিনীর ক্রিয়াকলাপের খবর, নেই আত্মগোপনকারী রাজনৈতিক দলগুলির গতিবিধি। মনে হয়, এসবের সঙ্গে তাঁর বিশেষ কোনো যোগাযোগ ছিল না। তার ফলে ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের ঘটনাটিকে আকস্মিক বলে মনে হতে পারে। কারণ, ২০শে নভেম্বরের দিনলিপির সুরও বিষাদের চড়া পরদায় বাঁধা। পাকিস্তানী বাহিনীর পরাজয় যে আসন্ন এবং স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন যে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে, তার প্রেক্ষাপট দিনলিপিতে অনুপস্থিত।

চারপাশের ঘটনা দেখে তাঁর মূল্যবোধ এবং মানুষের উপর বিশ্বাস বার বার আহত হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিহ্বলতা ঝেড়ে ফেলে যে প্রত্যয় ফিরে পেয়েছিলেন —এটাও তো কম কথা নয়। শেষ পর্যন্ত তিনি বলতে পেরেছেন : "বিশ্বাস আর প্রত্যয়ের নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে মনের যে অবগাহন তার বিমল আনন্দের কোনো তুলনা নেই। আমি আজ সে অনির্বচনীয় আনন্দের শরিক। হারানো বিশ্বাস আর প্রত্যয়কে ফিরে পাওয়া আমার জন্য যেন মায়ের কোলে ফিরে আসা।" [পৃ ২২১]

অমলেন্দু সেনগুপ্ত

রবীন্দ্র-কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার :— ড. ক্ষুদিরাম দাস। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯। ১৫ টাকা।

'কবি কবিই, পুরোপুরি বৈজ্ঞানিকও নন, দার্শনিকও নন'—এই মূল বিশ্বাসকেন্দ্র থেকে স্খলিত না হয়ে রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ ড. ক্ষুদিরাম দাস বাঙালী পাঠকদের হাতে একখানি ১৩৯ পৃষ্ঠার অনবদ্য গ্রন্থ তুলে দিয়েছেন, যার শিরোনাম 'রবীন্দ্র-কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার'। কৌতূহলোদ্দীপক এই গ্রন্থনামে যে স্বীকৃতি স্পষ্টোচ্চারিত, বিচিত্রমুখী রবীন্দ্র-প্রতিভার জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা বিভাগে বিচরণশীলতায় যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁদের অবশ্যই আগ্রহী করে তোলে। গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় তাঁরা ব্যাকুল প্রতীক্ষা করবেন সত্যান্বেষী গবেষকের কাছ থেকে চাঞ্চল্যকর তথ্য ও তত্ত্বের মাধ্যমে কবি-ভাবনার সত্য আবিষ্কারের জন্য—যেখানে দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস-রাজনীতি-সমাজনীতি সব কিছুর নির্দ্বন্দ্ব সহাবস্থান। যে প্রতিভার জারক-রসে জীর্ণ হয় দুরূহ তত্ত্ব অথবা দুরবগাহ রহস্যের পুঞ্জ এবং অতঃপর সেই জীর্ণ তত্ত্ব এবং তথ্য আপন স্বাতন্ত্র্য নিঃশেষে বিসর্জন দিয়ে গড়ে তোলে কাব্য-প্রতিমা, সেই প্রতিভার স্বরূপ সন্ধানে পাঠকের ব্যাকুলতা খুবই সংগত। প্রকৃষ্ট সমালোচকের কাজ সেই গভীর সত্যের রহস্যের সঙ্গে পাঠককে পরিচিত করে দিয়ে নিত্য নব ব্যাকুলতা সঞ্চার করা। কৃতবিদ্য অধ্যাপক ড. দাস সেই বাঞ্ছিত কর্মে সিদ্ধকাম হয়েছেন।

রবীন্দ্র-প্রতিভার উন্মেষমুহূর্তের 'কবি কাহিনী' থেকে পরিণত অন্তিম মুহূর্তের 'জন্মদিনে' পর্যন্ত ড. দাসের সন্ধানী দৃষ্টি প্রসারিত। প্রথম পর্বের পূর্বে 'ভূমিকা-১' এবং 'ভূমিকা-২'। 'ভূমিকা-১'-এ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির বিভিন্ন পর্ব সম্পর্কে সমালোচক-মহলে প্রচলিত ধারণা এবং গীতিকবি হয়েও 'আত্মনিমগ্ন মানসিক জীবন যাপন' না করে কিভাবে 'বিজ্ঞান-পরীক্ষিত সত্যের দ্বারা উদ্বোধিত' হয়েছে তাঁর কবিকল্পনা, সে বিষয়ে তথ্যসহ আলোচনার পর 'ভূমিকা-২'-এ বিজ্ঞান-চর্চায় য়ুরোপ-আমেরিকার অগ্রগতি এবং সেই অগ্রগতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সদা-জাগ্রত আগ্রহ যে তালবদ্ধ ছিল, সেই সংবাদ জানানো হয়েছে। জানা গেল, ১৯২৬-'২৭-এ প্রকাশিত স্যর আরথার এডিংটনের 'The internal constitution of stars' এবং 'Stars and atoms' রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে স্যর জেম্‌স্ জীন্‌স-এর হৃদয়গ্রাহী বই দুখানি—'The Universe around us' এবং 'The mysterious universe'. এ ছাড়া আমেরিকা আর ইংলন্ড থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্র-পত্রিকার সঙ্গেও কবির পরিচিতি ঘটেছিল পূর্বে এবং ঘটছিল তখনও। 'এরই ফলে শেষ পর্যায়ের কাব্যে কবির মূল কল্পনায় ও সন্নিবেশিত চিত্রগুলিতে মহাকাশ প্রসঙ্গে আরও পরিবর্তন দেখা যায় এবং কবি অনেকটা বৈরাগীও হয়ে ওঠেন।' প্রথম পর্বের আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার পূর্বে ড. দাস 'আলোচনার যথাযথতার জন্য' রবীন্দ্র-কাব্য-কবিতাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে নিয়েছেন। প্রথম পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে 'পূর্ব-প্রচলিত সাধারণ জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে কবিচিত্তের সৌহার্দ্য', দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে 'যথার্থ নভোবস্তু-বিজ্ঞানের সঙ্গে কবির আন্তরিক মিলন বিষয়ে সদৃষ্টান্ত বিচার' এবং তৃতীয় পর্যায়ে 'আইনস্টাইন-নির্ধারিত দেশকাল-তত্ত্বের সংযোগে কবির অন্য-নিরপেক্ষ পৃথিবী-প্রীতি সম্পর্কের শৈথিল্য প্রদর্শন।'

মনীষী আলডুস হাক্সলে তাঁর 'সাহিত্য ও বিজ্ঞান' গ্রন্থে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সম্পর্ক আলোচনাকালে লিখেছিলেন, বিজ্ঞান হল সূত্রাশ্রয়ী বা nomothetic এবং সাহিত্য ভাবচিত্র-আশ্রয়ী বা ideographic. নিয়মবদ্ধতা আর ব্যাখ্যাত্মক সূত্র আবিষ্কার সাহিত্যের লক্ষ্য নয়। বিজ্ঞানের লক্ষ্য ব্যাখ্যাত্মক সূত্রে উপনীত হওয়া। 'সাহিত্যের বিষয় আন্তরচিত্র' ও 'আন্তরসার' এবং সর্বোপরি বস্তুর 'অস্তিরূপ' (Istigkeit) চিন্তার মধ্যে যা অচিন্ত্য এবং নিরবধিকালব্যাপ্ত বিরাম-হীন বিলয় ও সৃষ্টির কালাতীত 'তথতা' (suchness)' (অনুবাদ : দেবব্রত রেজ)। নৈর্ব্যক্তিকতা বিজ্ঞানের সাধারণ ধর্ম, অপরপক্ষে সাহিত্য ব্যক্তি-অনুরাগ-রঞ্জিত। সুতরাং পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিতুলনার মাধ্যমে বস্তুজগতের স্বরূপোদ্ঘাটনের জন্যে বিজ্ঞানীর নিরন্তর প্রযত্ন। আর সাহিত্যিক বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত তথ্যের মধ্যে কল্পনাকে বিস্তীর্ণ করে দিয়ে এমন কিছু গড়ে তোলেন যা তথ্যাবিষ্কারকের কাছে দায়বদ্ধ না থেকে হয়ে ওঠে কালাতিক্রমী, সার্বভৌম। হর্মোন আবিষ্কারের আগেই মানবদেহে ঐ জাতীয় রসক্ষরণের সম্ভাবনা ভাবতে পেরেছিলেন বালজাক। সে ভাবনা সাহিত্যিকের, বিজ্ঞানীর নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত নিত্যনূতন সত্য কেন বিচলিত করে কবিকে, বিশেষত যিনি মূলত রোমান্টিক? কবির ভাবগ্রাহী চিত্ত যদি অবাধে 'From Heaven to earth and earth to Heaven'-এ বিচরণক্ষম হয় শুধুই কবিত্ব নামক শক্তির সহায়তায়, তাহলে তাঁর কাছে কী প্রয়োজন বিজ্ঞানের?

১৭৮১-এর হার্সেল-এর নতুন 'প্ল্যানেট' আবিষ্কারের পর এ বিষয়ে আগ্রহী হয়েছিলেন জন কীট্‌স্ এবং নিজের সংগ্রহে রেখেছিলেন জন বোনিক্যাসেল-এর 'Introduction to Astronomy' বইখানা। তারপর এক সময় তাঁর একটি কবিতায় এসে গেল এরকম দুটি পঙক্তি : 'Then felt I like some watcher of the skies/When a new planet swims into his Ken.' হাম্‌ফ্রি ডেভি-র বিজ্ঞান-বিষয়ক বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলেন কোলরিজ 'to increase his stock of metaphor.' এঁদের আগেই লুক্রেসিয়াস তৎকালীন পারমাণবিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব সামনে রেখে লিখেছিলেন : 'Globed from the atoms falling slow or swift/I see the Suns, I see the systems lift/Their forms ; and even the systems and the Suns/Shall go back slowly to the eternal drift.' মনে হয়, 'লিরিকাল ব্যালাড্‌স্'-এর মুখবন্ধে ওয়ার্ডস্বার্থের কথায় অনেকটাই সত্য ছিল, 'Poetry is the breath and spirit of all knowledge ; it is the impassioned expression which is in the countenance of all science.' হয়ত তাই মহাবিশ্বের পটে ইহলোকের ক্ষণস্থায়িত্বে ভাবিত শেলী বিজ্ঞানকে চমৎকার এনে দিতে সক্ষম কবিতার পঙক্তিতে, কবিতার জাতি-ধর্ম নষ্ট না করেই : Worlds on worlds are rolling ever/From creation to decay,/ Like the bubbles on a river/ Sparkling, bursting, borne away.' রোমান্টিক কবিদের কল্পনার কেন্দ্রানুগ বিস্তার ও গভীরতা এবং কেন্দ্রাতিগ ঊর্ধ্বচারিতাই একদা স্ফূর্তিবিজ্ঞান এবং নভোবস্তু-বিজ্ঞানকে যেন তাঁদের 'Structure of feeling'-কে 'Structure of expression'-এ মিশে যেতে সহায়তা করেছিল। রোমান্টিক বলেই কি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'বনবাণী' অথবা ঝুঁকেছিলেন নভোবস্তুবিজ্ঞানের দিকে? অতি অল্পবয়সে পিতা দেবেন্দ্রনাথ রিচার্ড. এ. প্রোকটরের 'সরল পাঠ্য ইংরাজী' জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই পড়ে বুঝিয়ে দিতেন তাঁকে। এই সরল পাঠ্য ইংরাজী বইখানার নাম কি 'Easy Star Lessons'? এই প্রশ্ন তুলেছিলেন ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (দ্রঃ 'রবীন্দ্র-অন্বেষা')। সুতরাং যদি যদি প্রোকটরের বই এবং ড. দাস-উল্লিখিত স্যর আর্থার এডিংটন ও জেম্‌স্ জীন্‌স-এর বই এবং তৎসহ নভোবিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন রচনা রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করে, তাহলে বুঝতে হবে নভোবিজ্ঞানে ছিল রবীন্দ্রনাথের আবাল্য কৌতূহল। সে কি তিনি রোমান্টিক বলে? না কি এই কৌতূহলই করেছিল তাঁকে রোমান্টিক? অথবা, এসব কিছুই নয়! শুধুমাত্র জ্ঞানান্বেষণে ঝুঁকেছিলেন তিনি নভোবিজ্ঞান তথা বিজ্ঞানের দিকে? আকর্ষণটা যদি শুধুই হত নভোবস্তু-বিজ্ঞানের দিকে তাহলে এক কথা। কিন্তু তৃণ-তরুলতায় গড়া বহির্জগতের যে-বিজ্ঞান এবং বংশানুক্রম বিষয়ক যে-বিজ্ঞান তাতেও যিনি আকৃষ্ট এবং 'বিশ্বপরিচয়' নামে একখানি মনোরম গ্রন্থ লিখে ফেলে সে বই তুলে দেন অনুজ-বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোসের হাতে, তখন মনে হয় রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-প্রীতি শুধুই 'Metaphor'-এর ভান্ডার সমৃদ্ধ করার জন্যে নয়, অথবা নয় কবিতার 'raw material' সংগ্রহের জন্য।

রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ ড. ক্ষুদিরাম দাস যেভাবে অতি পরিচিত এক-একটি কবিতার অভ্যন্তর থেকে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানভাবনা ও কাব্যভাবনার মেলবন্ধনের নিগূঢ় রস-রহস্যটি অনাবৃত করেন তাতে প্রতিনিয়ত চমকিত হওয়ার সম্ভাবনা। অনুমান বা বলপ্রয়োগের দ্বারা সিদ্ধান্তে উপস্থিত না হয়ে ড. দাস তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ে অধিকারকে চমৎকার ব্যবহার করেছেন। একবার, মাত্র একবারই 'বিশ্বপরিচয়'-এর উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। তা ভিন্ন পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাসের দিকে ড. দাসের দৃষ্টি সদাজাগ্রত। রবীন্দ্র-প্রতিভার উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতির পর্বে চাঞ্চল্যকর এক-একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ব্রহ্মাণ্ডের এক-একটি অজ্ঞাতপূর্ব সত্যকে যখন বিশ্ব-মানবের সমক্ষে উন্মোচিত করে দিচ্ছিল তখন সেই বিজ্ঞান-আধিপত্যের কালে নিভৃত ভাবলোকের গোপনে স্বেচ্ছা-নির্বাসন বরণ করার চেয়ে নবাবিষ্কৃত সত্যে কৌতূহলী হওয়া সচেতন ব্যক্তিত্বের পক্ষে ছিল খুবই স্বাভাবিক। 'বর্ণালী-সিদ্ধান্ত', 'তাপবিজ্ঞান', 'পরমাণুস্বরূপ', 'আপেক্ষিকতা-তত্ত্ব' যখন নাড়া দিচ্ছিল প্রাচীন বিশ্বাসের মর্মমূলে, ভেঙে দিচ্ছিল অতীতের বিশ্ববোধ, তখন কোনও বিজ্ঞান-প্রেমিক কবির এইসব পঙক্তি শুধুই কল্পনার লীলাবিলাস বলে গ্রহণ করা সম্ভব নয় :

(ক) 'গ্রহে তারায় বেঁকে বেঁকে/পথের চিহ্ন এলেম এঁকে/কত যে লোক লোকান্তরে/অরণ্যে পর্বতে'।

(খ) 'তারপরে প্রজ্বলন্ত যৌবনের শিখা ;/তার পরে স্নিগ্ধশ্যাম অন্নপূর্ণালয়ে/জীবধাত্রী জননীর কাজ'।

(গ) 'ঐ যে সকল জ্যোতির মালা/গ্রহতারা রবির ডালা/জুড়ে আছে নিত্যকালের পসরা'।

(ঘ) 'অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে।/আকাশ কাঁপে তারার আলোর/গানের ঘোরে'।

প্রাক্-বৈজ্ঞানিক যুগের বিজ্ঞান (মিথ) যখন আধুনিক বিজ্ঞানের হাত ধরে ইয়ুঙ-কথিত 'যৌথ-নির্জ্ঞাত'-এর পথ বেয়ে উপমা-রূপকের ছবিতে ধরা পড়ে তখন সাহিত্য আর বিজ্ঞান দুই-এর মধ্যেই যেন এসে যায় নতুন এক মাত্রা। তখন ড. দাসের এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য হয়ে ওঠে ; 'লক্ষণীয় এই যে, ৯০১ খৃীঃ-এর পর, রশ্মির পরমাণুতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই তিনি বিশ্বের সংহার-রূপের পক্ষপাতী হয়ে উঠেছেন। পৃথিবীদ্রষ্টা বড় কবি হিসেবে যে-অপ্রভাবিত মৌলিক অনুভবের স্বাক্ষর নিয়ে তিনি এসেছিলেন, শুদ্ধ বিজ্ঞান তাঁর সেই মৌলিক দৃষ্টিকে আরও প্রসারিত ও প্রগতিচিহ্নিত করেছে'। 'গীতালি'র 'ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়' কবিতাটি সম্পর্কে 'মহাকাশ-জ্যোতিঃস্বরূপ সত্তা পার্থিব মানুষকে যাবতীয় সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আবির্ভূত হয়েছে' যুক্তিসহ প্রতিষ্ঠিত এই সিদ্ধান্ত কবিতাটি সম্পর্কেই আমাদের নতুনতর ভাবনায় উন্নীত করে। 'বলাকা'র

'চঞ্চলা' কবিতায় বেগসঁ-র গতিতত্ত্বের সঙ্গে নভোবিজ্ঞানীদের বক্তব্যের মিলন সন্ধান, 'পূরবী'র 'সাবিত্রী'র বহ্নিবীণা বক্ষে লয়ে,/দীপ্ত কেশে,/উদ্‌বোধনী বাণী/সে পদ্মের কেন্দ্রমাঝে নিত্য বাজে, জানি, তারে জানি' পঙক্তিদ্বয়ে 'বিজ্ঞান-অভিভূত কবির চোখে' 'বাগ্‌-দেবতার প্রচলিত কমনীয় মূর্তি' কিভাবে বাধিত হয়েছে সেই রহস্যের বিশ্লেষণ পাঠকের প্রচলিত ধারণাকে নাড়িয়ে দেয়। ড. দাস আলোকের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত তিনটি শব্দ—'আকাশভ্রষ্ট', 'প্রবাসী' ও 'কল্যাণী' —এইভাবে ব্যাখ্যা করেন 'সূর্যের অভ্যন্তরীণ তাপ-পারমাণবিক সংশ্লেষে তার বহির্দেহ থেকে কেন্দ্রাতিগ শক্তির ফলে বিক্ষিপ্ত রশ্মিকণা পৃথিবীকে রক্ষা করে চলেছে। তাই 'আলোক' মূলে প্রবাসী এবং উচ্ছ্বাসের জন্য অনায়াসে বিকিরিত। আর পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখছে বলে কল্যাণীও বটে' (পৃঃ ৬৯)। আর কিছু পরেই পাওয়া যাচ্ছে, 'কবিচিত্তের রস-সৌন্দর্যবিষয়ক চৈতন্যর মূলেও স্পন্দিত রশ্মিকণার কার্যকারিতা নিহিত রয়েছে'... ইত্যাদি। 'বাস্তবসূর্য' ও কবিকল্প পুরাতন লালিত্যছেদী সূর্য বা রুদ্র' কিভাবে এক হয়েছে, এবং 'আকাশের বিপুল ক্রন্দন', 'আলোকবেণু' প্রভৃতি উক্তিগুলির বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য কী তা জানাতে জানাতে 'বনবাণী'তে 'সূর্যরশ্মির সঙ্গে তরুলতার প্রাণসম্পর্কের বৈজ্ঞানিক' রহস্য ব্যাখ্যায় অগ্রসর হন, তখন রবীন্দ্রনাথের পরিচিত কবিতাগুলিই আমাদের রসগ্রাহী চিত্তে ব্যাপ্তি, বিরাটত্ব ও নতুনত্ব লাভ করে।' 'মুক্তি', 'উদ্বোধন', 'নটরাজ' ও 'ঋতুরঙ্গ'-এ নভোবস্তুবিজ্ঞানের উদ্দীপনা সন্ধান করে ড. দাস যখন বলেন, 'বৈজ্ঞানিক সত্যে আস্থাবান হয়ে কবি জীবন-মৃত্যুকে একই সূত্রে সমীকৃত করলেন দৃঢ়ভাবে' তখন মহাকবির ভাবজগতে অভিনীত বিচিত্রের মিলননাট্য পাঠকদের বিস্ময়াভিভূত করে।

কবিতার জন্মভূমি নিশ্চয়ই নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানজগৎ নয়। যে ভাবভূমি থেকে কবিতার জন্ম সেখানে জীববিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান এবং আরও বহু কিছু হয়ত থাকে, কিন্তু তা থাকে এক বিস্ময়াপ্লুত হৃদয়ের আবেগের সঙ্গে লীন হয়ে এবং সেখানে মহাবিশ্ব-ব্যাপারের সঙ্গে নিসর্গ এবং মানুষের আকাঙ্ক্ষা থাকে লক্ষণীয় ভারসাম্যতায়। মহাকবির কবিতা যেমন শুধুই নিরপেক্ষ বিবৃতি নয়, তেমনি যথেচ্ছ কল্পনার লীলাও নয়। তাঁর ব্যবহৃত 'চিত্রকল্প' বৈজ্ঞানিক কনসেপ্ট-সৃষ্টির সহায়ক মাত্র নয়। তা যদি হত, তাহলে 'শেষ সপ্তক'-এর সাত সংখ্যক কবিতার 'অন্ধকারের নাড়ী ছিঁড়ে', 'নক্ষত্রের ফেনপুঞ্জে' প্রভৃতি উক্তিগুলি ঠাঁই পেত বিজ্ঞান বই-এর পাতায়, কবিতায় নয়। বাইশ সংখ্যক কবিতায় ড. দাস লক্ষ্য করেছেন 'বংশানুক্রম বিষয়ক বৈজ্ঞানিক চিন্তা'। 'শ্যামলী'র 'আমি' কবিতার 'বুড়ো চন্দ্রটা' সামান্য কবি-কথা বলে না ধরে বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসু ছাত্রের মত ড. দাস তাকে ব্যাখ্যা করলেন (একশো ছয় পৃষ্ঠা) নতুন করে, অসামান্য দক্ষতায়। 'পত্রপুটে'র 'পৃথিবী-প্রণাম'-এর দীর্ঘ ব্যাখ্যা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। তারপর 'শেষ সপ্তক', 'বীথিকা', 'সেঁজুতি' এবং 'নবজাতক', 'রোগশয্যা', 'আরোগ্য' ও 'জন্মদিনে'র বেশ কয়েকটি কবিতার অভ্যন্তরস্থ নভোবস্তু-বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্ব ক্রমশ ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়'-এর লেখক ড. ক্ষুদিরাম দাস এই সত্যে পৌঁছে দিলেন 'কবি কবিই, পুরোপুরি বৈজ্ঞানিকও নন, দার্শনিকও নন', কিন্তু দর্শনের তত্ত্ব, বিজ্ঞান-লব্ধ জ্ঞান সবই তাঁর মধ্যে মিশেছে রক্তের সঙ্গে প্রাণকণিকার অবিশ্লেষ্য সম্পর্কে'। মুখবন্ধে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার ঠিকই বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ যে "বিশ্বপরিচয়" নামে আধুনিক বিজ্ঞানের একটি বই লিখেছিলেন, এ আমাদের সকলেরই জানা। কিন্তু মহাকাশ-বিজ্ঞান কবির অন্তরে প্রবেশ করে, তাঁর কল্পনাকে এভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে এ ধরনের বক্তব্য ড. দাসই আমাদের কাছে প্রথম রাখলেন'।

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

পূর্ণতার প্রতীক।
মিলিত প্রচেষ্টার এক উজ্জ্বল অস্তিত্ব।

বহুকাল আগেকার তৈরী দিল্লীর কুতুবমিনারের কাছে লৌহস্তম্ভটি আজও উজ্জ্বল। কালের স্পর্শ আজও তাকে ম্লান করতে পারেনি। প্রাচীন ইস্পাত-প্রস্তুতকারকদের এ এক অপূর্ব শিল্পকীর্তি। কিন্তু দুর্গাপুর স্টীল শুধু ইস্পাত তৈরীর গর্বে গর্বিত নয়। মিলিত প্রচেষ্টায় লক্ষ্যে পৌঁছানোই আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।
এই বিরাট কর্মযজ্ঞের শক্তির আসল উৎস—হাজার হাজার ইস্পাত-কর্মী। সার্বিক প্রচেষ্টায় পূর্ণতায় পৌঁছানোর লক্ষ্যকে রোজকার অভ্যাসে পরিণত করার এক প্রাণবন্ত উদ্যম এখানে প্রবহমান। আমরা সব সময়েই আমাদের সিদ্ধান্তে অবিচল এবং স্থির—আমাদের লক্ষ্য পরিপূর্ণতার এক নতুন দিগন্তরেখার দ্বার উদ্ঘাটন।

স্টীল অথরিটি অফ্ ইন্ডিয়া লিমিটেড
দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট